মূল্য : পঞ্চাশ টাকা মাত্র

রজনীকান্ত গুহ রচনা সংগ্রহ

রজনীকান্ত গুহ

রচনা সংগ্রহ

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

রজনীকান্ত গুহ
রচনা সংগ্রহ

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ
২১১, বিধান সরণী
কলিকাতা-৭০০০০৬

Rajani Kanta Guha Rachana Sangraha

Collection of Sermons, Lectures & Essays

by Rajani Kanta Guha.

১১ মাঘ, ১৪০৬

২৬ জানুয়ারী, ২০০০

প্রকাশক : সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে
শ্রীঅরুণ কুমার দাস, সম্পাদক
২১১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৭০০০০৬

মুদ্রক : শ্রীঅসীম আমেদ
ব্রাহ্ম মিশন প্রেস
২১১/১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৭০০০০৬

সূচীপত্র

ভূমিকা

স্বর্গত শিক্ষাবিদ্ ও মনীষী রজনীকান্ত গুহ মহাশয়ের কতগুলি রচনা একত্র করে বর্তমান গ্রন্থটি সঙ্কলিত হ'ল। এই সংগ্রহভুক্ত অনেকগুলি নিবন্ধ ইতোপূর্বে পুস্তিকাকারে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। এগুলির অধিকাংশই ব্রাহ্মসমাজের আচার্য-রূপে লেখক কর্তৃক উপদেশরূপে বিভিন্ন সময়ে নিবেদিত। তাছাড়া স্বদেশী আন্দোলন উপলক্ষে বাংলার নানা স্থানে অনুষ্ঠিত জনসভায় রজনীকান্ত যে সমস্ত ভাষণ দিয়েছিলেন তারও কিছু কিছু পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হয়েছিল। সেগুলিও যথাসাধ্য সংগ্রহ করে বর্তমান প্রকাশনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বর্তমান প্রজন্মের কাছে অধ্যাপক রজনীকান্ত গুহ প্রায় একটি অর্ধবিস্মৃত নাম। অথচ তাঁর জীবৎকালে এই মনীষী তাঁর পাণ্ডিত্য পূতচরিত্র, ধর্মনিষ্ঠা এবং স্বদেশপ্রীতির জন্য কেবলমাত্র ব্রাহ্মসমাজের নয় সমগ্র শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজে পরম শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। ময়মনসিংহের টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত জামুরিয়া গ্রামে ১২৭৪ বঙ্গাব্দে ৩রা কার্তিক ইংরাজী ১৮৬৭ সালের ২০ অক্টোবর তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম উমাকান্ত গুহ। তিনি পিতার তৃতীয় পুত্র ছিলেন। ৫ বৎসর বয়সে গ্রামস্থ এক ব্রাহ্মণ যুবকের নিকট তাঁর হাতেখড়ি হয়। কিন্তু তাঁর জন্মস্থান জামুরিয়া গ্রামে কোন বিদ্যালয় ছিল না বলে ৬ বৎসর বয়সে পিতামাতার কোল ছেড়ে পার্শ্বস্থ সুতি গ্রামে এক ভগিনীর আশ্রয়ে থেকে সেখানকার বিদ্যালয়ে

তাঁকে ভর্ত্তি হতে হয়। এর অল্প দিন পরেই তাঁর পিতা পরলোক গমন করেন। ৯ বৎসর বয়সে নিকটস্থ ঘাটাইল গ্রামের মুসলমান প্রধান শিক্ষক তাঁর সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন "এই ছেলে একদিন মানুষের মত মানুষ হবে।" তিনি রজনীকান্তকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তাঁর আশীর্বাদ রজনীকান্তের জীবনে ফলবান হয়েছিল। ১৪ বৎসর বয়সে রজনীকান্ত গ্রেহাম স্কুল থেকে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার করে বৃত্তি লাভ করেন। অকালে পিতৃবিয়োগের ফলে তাঁর ছাত্রজীবন নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে অতিবাহিত হয়। ১৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি খালি পায়ে চলাফেরা করতেন। পাদুকা কিনবার সঙ্গতি ছিল না অর্থাভাবে নানাদিক দিয়ে নানা কৃচ্ছ্রতার মধ্যে জীবনের এই পর্ব তাঁকে অতিবাহিত করতে হয়েছিল। কোন রকমে ১ পয়সার মুড়ি কিনে তিনি জলযোগ করতেন। বিদ্যালয়ে মাসিক চার আনা বেতন দেবারও তাঁর ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু ছাত্র হিসাবে তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন এবং এই কারণে সর্বদা শিক্ষকদের স্নেহভাজন হতে পেরেছিলেন। উত্তরজীবনে গ্রীক ও লাটিন ভাষায় তিনি যে গভীর পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন সেই চর্চার আরম্ভ তাঁর কৈশোরকালের ছাত্রজীবনে। মাত্র ১৬ বৎসর বয়সেই তিনি ল্যাটিন শিখতে আরম্ভ করেন।

তরুণ বয়সেই রজনীকান্ত ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তিনি সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের শ্রদ্ধেয় প্রচারক স্বর্গত গুরুদাস চক্রবর্তীর সংস্পর্শে আসেন। সেই সময়ে ময়মনসিংহ নিবাসী স্বর্গত পণ্ডিত শ্রীনাথ চন্দ মহাশয় প্রায়ই যুবকদিগকে আহ্বান করে একত্র ব্রহ্মোপাসনা করতেন। রজনীকান্ত এই মণ্ডলীভুক্ত হন এবং ক্রমে ব্রাহ্মসমাজের আদর্শের প্রতি তাঁর মনে গভীর অনুরাগ জন্মায়।

১৯ বৎসর বয়সে তিনি শ্রদ্ধেয় শ্রীনাথ চন্দের নিকট ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষিত হন। দেশের সাধারণ সমস্যা সম্পর্কে ও তরুণ বয়স থেকেই রজনীকান্ত চিন্তা করতেন। একবার সরস্বতী পূজা উপলক্ষে অনুষ্ঠিত প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় তিনি "হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক" বিষয়ে একটি রচনা লিখে ১০ টাকা পুরস্কার পেয়েছিলেন। অন্তরে ক্রমশ জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হওয়ায় রজনীকান্ত ময়মনসিংহ সরকারী জেলা স্কুল পরিত্যাগ করে স্থানীয় ব্রাহ্ম প্রভাবিত সিটি স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন এবং এখান থেকেই কৃতিত্বের সঙ্গে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি ইংরাজী সাহিত্যে অনার্স সহ বি, এ এবং ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজী সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে এম, এ পাশ করেন। দারিদ্র্যের সঙ্গে ঘোরতর সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হলেও তাঁর ছাত্রজীবন আগাগোড়া সমুজ্জ্বল ছিল।

তাঁর কর্মজীবন আরম্ভ হয় পাটনায়। এম, এ পাশ করবার পর তত্রস্থ বাঁকিপুর রামমোহন রায় সেমিনারীতে মাসিক ১০ টাকা বেতনে তিনি প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। তখন ঐ প্রতিষ্ঠানে পরিদর্শক বা সুপারিণ্টেডেণ্ট ছিলেন শ্রদ্ধেয় গুরুদাস চক্রবর্তী। শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে সেখানে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার ও জনসেবামূলক কাজের ভারও রজনীকান্তকে নিতে হয়েছিল। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর এই বহুমুখী দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

১৯০৪ সালে তিনি বরিশালের ব্রজমোহন কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। বরিশাল বাংলা দেশের সেই যুগে স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম পীঠস্থান ছিল এবং সেখানে এই আন্দোলনের প্রাণপুরুষ ছিলেন মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত। ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে অশ্বিনীকুমারের সম্পর্ক ছিল অতি ঘনিষ্ঠ। বরিশালে সে সময় ব্রাহ্ম আন্দোলনও ছিল

অত্যন্ত শক্তিশালী। নানা সেবামূলক কাজে সেখানকার ব্রাহ্মরা ছিলেন অগ্রণী। সুতরাং স্বদেশপ্রাণ রজনীকান্ত বরিশালে আপনার উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র খুঁজে পেয়েছিলেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন উপলক্ষে তিনি বঙ্গবিভাগের বিরুদ্ধে বাংলা এবং বাংলার বাহিরে বহুস্থানে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করেছিলেন এবং সাময়িকপত্রে বহু সুচিন্তিত রচনা প্রকাশ করেছিলেন। এই স্বদেশী মনোবৃত্তির জন্য তিনি তদানীন্তন বিদেশী শাসককুলের বিরাগভাজন হন এবং ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজের অধ্যাপকের পদ তাঁকে পরিত্যাগ করতে হয়েছিল।

শিক্ষাবিদ্ হিসাবে রজনীকান্ত সম্পর্কে উল্লেখ্য সুদীর্ঘ ২৪ বৎসর কাল তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট বিভাগে কৃতিত্বের সঙ্গে ইংরাজী সাহিত্যে অধ্যাপনা করেছিলেন। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে কৈশোরকাল হতেই তিনি ইংরাজীর সঙ্গে লাটিন গ্রীক ভাষার চর্চা আরম্ভ করেছিলেন। উত্তরকালে এক্ষেত্রে তিনি বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। এ বিষয়ে তিনি বিশেষ উৎসাহ পেয়েছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন কর্ণধার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং ভাষাচার্য অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। তাঁর এই ইউরোপীয় ক্লাসিক্যাল বিদ্যাচর্চার ফল মূল গ্রীক থেকে বাংলায় অনূদিত "সোক্রোতিস" "মার্কাস আরলিউসের আত্ম-চিন্তা", "মেগাস্থিনিসের ভারতবিবরণ" প্রভৃতি গ্রন্থাকারে বাংলা সাহিত্যের গৌরববৃদ্ধি করেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বর্তমান প্রজন্ম এই অমূল্য গ্রন্থগুলির সংবাদ খুব কমই রাখেন। দীর্ঘকাল এইগুলি বাজারে পাওয়া যায় না এবং সে বিষয়ে কারও কোন মাথা ব্যথাও নেই। উত্তরকালে রজনীকান্ত কলিকাতা সিটি কলেজের অধ্যক্ষ

নিযুক্ত হন এবং অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। এই প্রতিষ্ঠানটিকে তিনি এত ভালবাসতেন যে এর সঙ্কটকালে স্বেচ্ছায় নিজের প্রাপ্য বেতন কম নিয়ে এর সেবা করেছিলেন। রজনীকান্তের আত্মজীবনী আধুনিক বাংলার একাধারে গৌরবময় ও রাজনৈতিক সঙ্কটপূর্ণ এক পর্বের এক অতি হৃদয়গ্রাহী চিত্র। এ গ্রন্থখানির একটি পুনর্মুদ্রণ কিছুকাল পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে।

তাঁর জীবনের বহুমুখী কর্মকাণ্ডের মধ্যেও ব্রাহ্মসমাজের বিশেষত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অকুণ্ঠ সেবার পথ থেকে তিনি কখনও বিচ্যুত হন নি। তিনি বহুবার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক মনোনীত হয়েছিলেন। আসাম ও পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্ম সম্মিলনীর বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির পদও অলঙ্কৃত করেছিলেন। এক সময়ে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের মাঘোৎসবের কর্মসূচিতে নিয়মিত ইংরাজী ও হিন্দী ভাষায় উপাসনার ব্যবস্থা থাকত। রজনীকান্ত একাধিকবার ইংরাজীতে উপাসনার ভার গ্রহণ করেছেন। নিয়মিত আচার্যের কাজ করা ব্যতীত তিনি বাংলা ও ইংরাজীতে সমাজে বহু ভাষণও দিয়েছিলেন। পাটনায় থাকাকালীন পাটনা কলেজ হলে তাঁর প্রদত্ত The New Gospal শীর্ষক বক্তৃতা স্থানীয় শিক্ষিত সমাজে যথেষ্ট আলোড়ন জাগিয়েছিল।

জীবনচর্যায় তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম। ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যহ দুইবেলা নিয়মিত ব্যক্তিগত উপাসনা আজীবন তাঁর কখনও বাদ যায় নি। সমাজের সাপ্তাহিক উপাসনাতেও তিনি নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন। তাঁর মধ্যে কোনদিন ধর্মাচরণ সম্পর্কে কোন আস্ফালনের ভাব ছিল না। সরল, বিনম্র, অনাড়ম্বর ব্রহ্মার্পিত জীবন যাপন তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল। বৃহৎ পরিবারভুক্ত সকলের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের

দিকে পূর্ণদৃষ্টি রাখতেও তিনি কখনও ভোলেননি। অধুনা দুর্ভাগ্যক্রমে অর্ধবিস্মৃত এই সাধু ও মনস্বী পুরুষের বর্তমান নিবন্ধ সংগ্রহটি প্রকাশ যদি তাঁর পুণ্যস্মৃতি পুনর্জাগরিত করতে সাহায্য করে তাহলেই এই প্রকাশন সার্থক হবে।

—দিলীপ কুমার বিশ্বাস

সত্য ও সংস্কার

সত্যের সংজ্ঞা।

সংস্কৃত অস্ ধাতু হইতে 'সত্য' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'অস্তীতি সত্যম্'—যাহা আছে, তাহাই সত্য; অর্থাৎ যাহা খাঁটি, যাহা নিত্য, অপরিবর্ত্তনীয়, ধ্রুব, শাশ্বত—সত্য বলিতে আমরা তাহাই বুঝিয়া থাকি। ইহার ইংরেজী fact, law, truth, the eternal verity—যাহা আজ আছে, কাল থাকিবে না, যাহা এদেশে একরূপ, অন্য দেশে অন্যরূপ, যাহা একযুগে বরণীয়, অন্য যুগে বর্জ্জনীয়, তাহা সত্য বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না। গণিত ও জ্যামিতির সত্যের মত সকল সত্যই অপরিবর্ত্তনীয়। 'দুইয়ে দুইয়ে চার হয়' ইহা হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বে যেমন সত্য ছিল, আজও তেমনি সত্য রহিয়াছে, লক্ষ বৎসর পরেও তেমনি সত্য থাকিবে। ধর্ম্ম, সমাজ, রাষ্ট্র প্রভৃতি সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা। ধর্ম্মে বা সমাজে বা রাজনীতিতে যাহা সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে স্বীকৃত হইতে পারে না, তাহা সত্য নহে।

এদেশে 'সত্য, শিব ও সুন্দর', ঈশ্বরের এই তিনটী স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। 'সত্য' সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, 'শিব' ও 'সুন্দর' সম্বন্ধেও তাহাই প্রযোজ্য। অর্থাৎ বর্ত্তমান আলোচনাতে শিব সুন্দরকে সত্যের অন্তর্ভূত বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। ঈশ্বর 'সত্যং শিবং সুন্দরম্'—তিনি পরম সৎ (absolute truth), পরম শিব (absolute good) ও পরম সুন্দর (absolute beauty); সুতরাং পাশ্চাত্য ঋষি এমার্সনের ভাষায় বলা যাইতে পারে, এই তিনটী সেই একেরই বিভিন্ন মুখ।

অতএব, একটীর কথা বলিতে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে অপর দুইটীর কথাও বলা হইবে।

সত্য নির্ণয়ের অন্তরায়।

কিন্তু আমরা প্রতিদিনই আপন আপন জীবনে অনুভব করিতেছি যে, আমরা সকল সময়ে সত্যকে ধরিতে ও বুঝিতে পারি না। মানুষ যদি সর্ব্বদা সত্যকে উজ্জ্বলরূপে দেখিতে পাইত ও আলিঙ্গন করিতে পারিত, তবে এই সংসার স্বর্গধাম হইয়া যাইত। সকলেই স্বীকার করিবেন যে, সংসারে এমন লোক নাই বলিলেই হয়, যিনি ষোলআনা সত্য বুঝিয়াছেন ও তাহার অনুসরণ করিতেছেন। মানুষ মাত্রেরই ভ্রমপ্রমাদের অধীন। ইহার কারণ কি? কারণ এই যে, সত্য নির্ণয়ের অনেকগুলি অন্তরায় আছে। সেই অন্তরায়গুলি দুই ভাগে বিভক্ত হইতে পারে। (ক) অন্তর্নিহিত অন্তরায়; (খ) সংস্কার-জাত অন্তরায়।

(ক) অন্তর্নিহিত অন্তরায়।

মানবপ্রকৃতির এমন কতকগুলি বিশেষত্ব আছে, যাহা স্বতঃই সত্য-নির্ণয়ের কার্য্যটীকে কঠিন করিয়া রাখিয়াছে। মানুষ অপূর্ণ জীব, এই বিশেষত্বগুলি তাহার অপূর্ণতার লক্ষণ। মানুষ সাধনদ্বারা এগুলির প্রভাব খর্ব্ব করিতে পারে, কিন্তু এগুলিকে সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করিতে পারে না; কেন না, মানুষ যতদিন মানুষ থাকিবে, ততদিন এই বিশেষত্বসমূহও তাহাতে বিদ্যমান থাকিবে; এক পূর্ণস্বরূপ ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহই এগুলি হইতে মুক্ত নহে। এজন্য আমরা এই বিশেষত্ব গুলিকে অন্তর্নিহিত অন্তরায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। এই অন্তরায়-সমূহও আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; প্রথম শ্রেণীর অন্তরায়গুলি মানসিক (intellectual); দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তরায়গুলি প্রবৃত্তিজাত বা ভাবোৎপন্ন (emotional)।

(১) মানসিক অন্তরায়।

এই শ্রেণীর তিনটী শাখা বর্ত্তমান। আমরা একে একে এই তিনটী শাখার ব্যাখ্যা ও আলোচনা করিতেছি।

মানসিক অন্তরায়ের প্রথম শাখা।

এদেশে একটী প্রবাদ সর্ব্বজনবিদিত; তাহা এই—"আত্মবৎ মন্যতে জগৎ"—অর্থাৎ লোকে জগৎটাকে আপনার মত মনে করে। প্রবাদ-টীর মধ্যে গভীর অর্থ নিহিত রহিয়াছে। মানুষ এমনভাবে গঠিত হইয়াছে যে, সে যে বস্তু সম্বন্ধেই ভাবিতে যাক্ না কেন, তাহাই সে আপনার মত করিয়া ভাবে। সে যতটুকু জানে, যতটুকু দেখিয়াছে, শুনিয়াছে, যতটুকু অনুভব করিয়াছে বা ভোগ করিয়াছে, তাহার সমুদায় ভাবনা, সমুদায় কল্পনা সেইটুকু দ্বারা অনুরঞ্জিত হয়, সে তাহার বাহিরে কিছু বুঝিতে পারে না, ধরিতে পারে না, এমন কি কল্পনাও করিতে পারে না। এজন্য সে এই জগদ্ব্যাপারের যাহা কিছু দেখে, তাহাই সে আপনার ভাবে ব্যাখ্যা করে। সে এই বিশ্বপ্রপঞ্চকে আপনার মনের মত গঠন করে, বিশ্বের যাবতীয় শক্তিকে আপনার আকার প্রদান করে, আপনাকে যেমন বুঝিয়াছে, বিশ্বকেও ঠিক্ সেইরূপে বা সেই আকারে বুঝিতে প্রয়াস পায়। এই যে আপনার মত করিয়া অপর সমুদায় বুঝিবার প্রয়াস, ইহাই "আত্মবৎ মন্যতে জগৎ" এই প্রবাদ-বাক্যটীর অর্থ। সুবিখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সার ইহার নাম দিয়াছেন, automorphic interpretation অর্থাৎ আত্মানুরূপ ব্যাখ্যা। ইহা মানবের একটী অপরিহার্য্য বিশেষত্ব বা লক্ষণ। "যাহা নাই ভাণ্ডে, তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে।" আমার মধ্যে যে যে গুণ বা শক্তি আছে,

আমি কেবল তাহাই ধারণা করিতে পারি, ও কেবল তাহারই সাহায্যে অন্য যাবতীয় পদার্থ বুঝিতে চেষ্টা করি। আমার মধ্যে যাহা নাই, তাহা আমি কিরূপে ধারণা করিব? অন্ধজনকে শতবার বুঝাইয়া বলিলেও নীল, লোহিত প্রভৃতি বর্ণ কি প্রকার তাহা সে বুঝিবে না। যে ব্যক্তি একান্ত স্বার্থপর, সে কখনও বিশ্বাস করিবে না যে, জগতে নিঃস্বার্থ পরোপকার বলিয়া একটা জিনিস আছে। আমার পাঁচটী ইন্দ্রিয় আছে, আমি এই ধরণীর পঞ্চেন্দ্রিয়বিশিষ্ট জীব-সমূহকে বুঝিতে পারি; যদি অন্য কোনও গ্রহে এমত জীব থাকে, যাহাদিগের ছয়টী বা তাহার অপেক্ষা অধিক ইন্দ্রিয় আছে, তবে সে প্রকার জীব আমার ধারণার অতীত। কল্পনাকে উধাও হইয়া উড়িতে দিয়াও আমরা পঞ্চেন্দ্রিয়ের অতীত একটী ইন্দ্রিয় ধারণা করিতে পারি না। আমাদিগের অপূর্ণতা বা সসীমতার একটী ফল এই হইয়াছে, যে আমরা শুধু যে ইন্দ্রিয়গোচর বস্তুগুলিকে নিজের মনের মত করিয়া বুঝিয়া থাকি, তাহা নহে, অধিকন্তু আমরা ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়কেও আমাদিগের মত কায়া প্রদান করি। প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রগুলি পাঠ করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, মানব আদিম যুগে যে সকল দেবতার পূজা করিত, তাঁহারা চেহারায় ও চরিত্রে কতখানি মানুষের মত ছিলেন। এই জ্ঞানালোকিত বিংশ শতাব্দীতে সুসভ্যতম দেশেও হাজার হাজার লোক ঈশ্বরকে অনেকটা মানুষেয় মত করিয়া গড়িয়া পূজা করে ও তাঁহাতে মানবীয় ভাব ও প্রবৃত্তি, এমন কি হিংসা বিদ্বেষ পর্য্যন্ত আরোপ করিয়া থাকে। ঈশ্বর সম্বন্ধে এই মানবীয় ধারণা (anthropomorphic conception) লক্ষ্য করিয়া মার্কিণ পণ্ডিত থিওডোর পার্কার পরিহাসচ্ছলে বলিয়াছিলেন যে, একটা মহিষ যদি ঈশ্বর সম্বন্ধে কোনও ধারণা করিতে পারিত, তবে সে ভাবিত যে, ঈশ্বর এক অতিকায় বিশালশৃঙ্গ মহিষ, এবং তিনি

সীমাহীন নিরুপদ্রব প্রান্তরে সুস্বাদু, সুকোমল, অফুরন্ত তৃণরাজি ভক্ষণ করিয়া যথেচ্ছ বিচরণ করিতেছেন। কথাটা শুনিয়া হাসি পাইলেও সকলের মধ্যেই অল্পাধিক পরিমাণে এই অপূর্ণতা বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহারই ফলে মানুষ সকল বিষয়েই আপনাকে মধ্যবিন্দু করিয়া বিচার করে। সত্য, অসত্য; ক্ষুদ্র মহৎ; ভাল, মন্দ; গ্রহণীয়, বর্জ্জনীয়;— যাহাই বিচারের বিষয় হউক না কেন, তাহার মধ্যেই মানুষ সর্ব্বাগ্রে আপনার কথা ভাবে, আপনার দিক্ হইতে তাহা পরীক্ষা করে, আপনার মাপ কাঠির দ্বারা তাহা মাপিয়া লয়, আপনার নিকষ পাথরে পরখ করিয়া তবে সে সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। বহু শতাব্দী ধরিয়া খৃষ্টীয় মণ্ডলী বিশ্বাস করিত যে, এই পৃথিবী ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র। এই বিশ্বাসের মূল অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, মানব আপনাকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব ও ঈশ্বরের বিশেষ কৃপাপাত্র বলিয়া বিবেচনা করিত, সুতরাং মানবের অধিষ্ঠান-ভূমি এই বসুন্ধরা বিশ্বের কেন্দ্র না হইয়া পারে নাই। মানুষের কত কার্য্যে যে এই আত্মকেন্দ্রিক (anthropocentric) ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার সংখ্যা হয় না। আমিষ ভোজনের সপক্ষে একটা মস্ত যুক্তি এই যে, ইতর প্রাণীগুলি মানুষের সুখ সুবিধার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে। যুক্তিটী সবল না দুর্ব্বল, তাহার বিচার এখানে উপস্থিত করিতে চাই না; আত্মকেন্দ্রিক ভাবের দৃষ্টান্তরূপে কথাটী বলা হইল। মানব-মনের যে বিশেষত্বটী এতক্ষণ আলোচিত হইল, তাহা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নরূপে ক্রিয়া করে। এই বিভিন্ন ক্রিয়া কি কি, তাহা বুঝাইবার জন্যই আমরা এত কথা বলিলাম। এই বিশেষত্ব বা অপূর্ণতার জন্য মানুষ নিজে দায়ী নহে; না হইলেও ইহা যে তাহাকে বস্তুর স্বরূপ নিরূপণের পক্ষে বাধা দিতেছে, তাহাতে অণুমাত্রও সংশয় নাই।

মানসিক অন্তরায়ের দ্বিতীয় শাখা।

সত্যনির্দ্ধারণের দ্বিতীয় মানসিক অন্তরায় এই যে, অধিকাংশ মানুষেরই মনোবৃত্তি সমুচিত বিস্তৃত, গভীর ও বহুমুখী নয় (want of intellectual faculty complex enough to grasp extremely complex phenomena)। তাহার ফল এই যে, লোকে একটী অতি সরল তত্ত্ব যেমন অক্লেশে বুঝিতে পারে, জটিল তত্ত্বগুলি যেমন পারে না। আলোচ্য বিষয়ের জটিলতা যতই বাড়িতে থাকে, তাহাদিগের নিকটে সেগুলি ততই দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠে। গণিতের আলোচনায় আমরা অনেকেই ইহা দেখিয়াছি। বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া যোগ, বিয়োগ, পূরণ, ভাগ একরকম বুঝা গেল, কিন্তু ত্রৈরাশিকে যাইয়াই গতিরোধ হইল। অনেক কষ্টে সে সঙ্কট উত্তীর্ণ হইয়া পরে আবার পরিমিতির নিবিড় অরণ্যে পথ হারাইলাম। ক্রমশঃ যতই উচ্চতর গণিতের সহিত সাক্ষাৎকার হইতে লাগিল, ততই এই সংস্কার দৃঢ় হইল, যে মস্তিস্কটী উচ্চতম গণিতালোচনার উপযোগী হইয়া গঠিত হয় নাই। এই একটা দৃষ্টান্ত হইতেই বুঝা যাইবে, আমাদিগের মনোবৃত্তি কেমন সঙ্কীর্ণ ও স্বল্প-প্রসার। এমন লোক দেখিয়াছি যে, দশ রাশি বার রাশি বিশিষ্ট সংখ্যা দুইটীর পূরণ মুখে মুখে সমাধান করিয়া দিতে পারে। সকলে তাহা পারে না কেন? পারে না এই জন্য, যে এক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তির মনশ্চক্ষু যেমন একসঙ্গে অনেকগুলি রাশি যথাস্থানে ন্যস্ত দেখিতে পায়, সকলের পক্ষে তাহা সম্ভবপর নয়। জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোচনায় মানুষে মানুষে কি আকাশ-পাতাল প্রভেদ! বহু বিষয় একত্র ভাবিতে পারে, বহুকার্য্য যুগপৎ করিতে পারে, বহুজনকে একসঙ্গে হৃদয়ে স্থান দিতে পারে, এমন লোক সংসারে কয়জন দেখা যায়?

কথিত আছে, নেপোলিয়ন বোনাপার্ট এক সময়ে চারজন কেরাণীকে চারখানি ভিন্ন ভিন্ন চিঠির কথা বলিয়া যাইতেন ও নিজে একখানি লিখিতেন। একজন ইংরেজ জীবন-চরিতকার লিখিয়াছেন যে, নেপোলিয়নের মত মনস্বী লোক আজ পর্য্যন্ত ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করেন নাই। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে, বিশ্বতোমুখী প্রতিভা যথা-তথা মিলে না। সাধারণভাবে বলা যাইতে পারে, যে অধিকাংশ মানুষের মনোবৃত্তি একান্ত জটিল তত্ত্ব ধারণায় অক্ষম। এজন্য উহার উৎকর্ষ সাধিত হইলে উহা অপেক্ষাকৃত জটিল তত্ত্ব ধারণার উপযোগী হইবে, কিন্তু উহার অপূর্ণতা একেবারে দূর হইবে না। প্রত্যেকেরই মনোবৃত্তির বিকাশ ও উন্নতি একটী নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ। অন্যে পরে কা কথা, নেপোলিয়ন সমরে, রাজনীতিতে ও রাষ্ট্রপরিচালনায় অদ্বিতীয় ছিলেন, কিন্তু অসাধারণ মেধাবী হইয়াও তিনি কবি, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক হইতে পারেন নাই। অর্থাৎ মানুষ কখনও সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারে না। ইহা হইতে প্রমাণিত হইল যে, প্রাকৃত জনের পক্ষে সূক্ষ্মতর জটিলতর, গভীরতর, বিস্তৃততর বিষয়ের ধারণা অতি দুঃসাধ্য, সুতরাং মনোবৃত্তির এই অপূর্ণতা সত্য-নির্ণয়ের একটী অন্তরায়।

মানসিক অন্তরায়ের তৃতীয় শাখা।

তৎপরে আমাদের মনোবৃত্তি যথোচিত নমনীয়, সর্ব্বতত্ত্বোপযোগী, ইচ্ছানুরূপ ব্যবহারযোগ্য নয়। স্পেন্সার ইহাকে বলিয়াছেন, মনোবৃত্তির কোমলতার অভাব (want of plasticity of the intellect)। আমরা অনেকেই একটা বিষয় ধরিতে পারি, তো আর একটা বিষয় ধরিতে পারি না; একটা কথা বেশ বুঝি, অন্যরূপ একটা কথা মোটেই বুঝি না; কবিতা পড়িয়া আরাম পাই, দর্শনে বা গণিতে

একেবারেই রুচি হয় না। অধিকাংশ লোকের মন একটা নির্দ্দিষ্ট খাতে চলে, উহাকে অন্যদিকে লইয়া যাওয়া অতি দুরূহ ব্যাপার। তাহারা বাল্যাবধি যাহা দেখিয়াছে শুনিয়াছে, তাহাই বুঝে, তাহাই সত্য বা শ্রেয়ঃ বিবেচনা করে; নূতন একটা কিছু সম্মুখে উপস্থিত হইলে তাহা বুঝেও না, তাহাতে যে ভাল কিছু থাকিতে পারে, তাহাও স্বীকার করে না। মনোবৃত্তির নমনীয়তার অভাব যে শুধু অশিক্ষিত লোকের মধ্যে দেখা যায়, তাহা নহে, অনেক বড় বড় বিদ্বান্ ব্যক্তিও ইহা হইতে মুক্ত নহেন। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে হেনরী মার্টিন নামক একজন ইংরেজ প্রচারক হইয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র র‍্যাংলার ও গ্রীক লাটিন প্রভৃতি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। এদেশে আসিয়া তিনি সংস্কৃত শিখিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু কয়েক মাস পরেই তাহার উৎসাহ ভগ্ন হইয়া যায়। তিনি এই বলিয়া সংস্কৃত শিক্ষা ছাড়িয়া দেন, "আমি সন্ধির গহনবনে একেবারে দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছি – আমার দ্বারা এ ভাষা কখনও আয়ত্ত হইবে না।" অথচ ইনিই পার্সী শিক্ষা করিয়া নূতন বাইবেলখানি ঐ ভাষায় অনুবাদ করেন। এক্ষেত্রেও মানুষে মানুষে গুরুতর পার্থক্য আছে। ভারতে কালিদাস মানসিক নমনীয়তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তিনি সংস্কৃত ভাষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহাকাব্য, সর্ব্বোৎকৃষ্ট খণ্ডকাব্য ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটক লিখিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগে মহামতি গ্লাডষ্টোন এই গুণে শ্রেষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। রাজনৈতিক সংগ্রামের মহা উত্তেজনার মধ্যেও তাঁহার নিদ্রার ব্যাঘাত হইল না, পার্লিমেন্টের দ্বন্দ্ব-কোলাহল তিনি কখনও গৃহে লইয়া যাইতেন না; ধর্ম্মবিজ্ঞান, রাজনীতি, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিবার জন্য তাঁহার স্বতন্ত্র ডেস্ক ছিল; তিনি

যখন যে বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতে বসিতেন, তখন সেই বিষয়ের চিন্তাই তাঁহার চিত্তকে পূর্ণরূপে অধিকার করিত, অন্য বিষয়ের চিন্তা তাঁহার মনে স্থান পাইত না। মনোবৃত্তির এ প্রকার নমনীয়তা সংসারে বিরল; কিন্তু ইহারও একটা সীমা আছে। ইহারাই কি বিশ্বের সমগ্র তত্ত্ব হৃদয়ে গ্রহণ করিতে পারিতেন? বৃটিশ সাম্রাজ্যের কর্ণধার হইয়াও তো এই গ্লাডষ্টোন কালিদাসের নাম পর্য্যন্ত কখনও শুনিয়াছেন কি না, সন্দেহের বিষয়, তাঁহার কবিতা পড়া তো দূরের কথা। সুতরাং আমাদিগকে মানিয়া লইতে হইবে, যে অধিকাংশ মানুষের মনোবৃত্তি যথেষ্ট নমনীয় নহে; এবং এই অপূর্ণতাও সত্য-নির্ণয়ের একটী প্রতিবন্ধক।

(২) প্রবৃত্তিজাত অন্তরায়।

মানসিক অন্তরায়ের কথা বলা হইল; এক্ষণে দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তরায়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। মানুষের কাম, ক্রোধ, লোভ, ঈর্ষা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি প্রবৃত্তি তাহাকে সত্য-নির্ণয়ে অক্ষম করে। কামের বশীভূত হইয়া মানুষ দিবাকে রাত্রি ও রাত্রিকে দিবা মনে করে; সে সারকে অসার বিবেচনা করিয়া পরিহার করে এবং অসারকে সার বোধ করিয়া তাহার পশ্চাতে ছুটিয়া যায়; কি সত্য, কি অসত্য, তাহা সে মোটেই বুঝিতে পারে না। বুদ্ধদেব এইজন্যই বাসনা-নির্ব্বাণের পন্থা দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,

> অসারে সারমতিনো সারে চ অসারদস্সিনো,
> তে সারং নাধিগচ্ছন্তি মিচ্ছাসঙ্কপ্পগোচরা। ধম্মপদ। ১১

যাহারা অসারকে সার জ্ঞান করে, সারকে অসাররূপে দর্শন করে, তাহারা সারকে প্রাপ্ত হয় না, (প্রত্যুত) মিথ্যা কামনায় নিমগ্ন থাকে।

ক্রোধ ও লোভের তাড়নায় মানুষ বাস্তবতার সম্পর্ক কেমন হারাইয়া ফেলে, তাহা আর বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। সভ্যজাতি-সমূহের কাব্য, নাটক প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ। এই শিক্ষাটী গীতার একটী প্রসিদ্ধ শ্লোকে চমৎকার ব্যক্ত হইয়াছে। শ্লোকটী এই—

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥ ২।৬২।৬৩

বিষয় চিন্তা করিতে করিতে বিষয়-সমূহে আসক্তি জন্মে; আসক্তি হইতে কামনা উৎপন্ন হয়; কামনা প্রতিহত হইলে উহা হইতে ক্রোধ হয়; ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে স্মৃতিভ্রংশ, স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ এবং পরিশেষে বুদ্ধিনাশ হইতে বিনাশ উপস্থিত হয়।

মানুষের বিনাশ হয় কখন? যখন সে বাস্তবতার সহিত সম্পর্ক হারাইয়া ফেলে। প্রবৃত্তির উত্তেজনায় অসত্যকে সত্য বলিয়া আলিঙ্গন করিয়াই মানুষ মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইতে থাকে। কবিগুরু শেক্ষপীর অনেকগুলি নাটকে এই তত্ত্বটী হাতেকলমে দেখাইয়া দিয়াছেন।

এস্থলে প্রেমের কথাও কিছু বলা আবশ্যক। প্রেম সত্য-নির্ণয়ের সহায়ও বটে, প্রতিবন্ধকও বটে। প্রেম ভিন্ন আমরা অপরকে বুঝিতে পারি না; প্রেম অল্পায়াসে আমাদিগকে অপরের প্রকৃত অবস্থাটা বুঝিতে সমর্থ করে। জননী যেমন সন্তানের সকল কথা বুঝেন, এমন আর কে বুঝে? পনর বৎসর পূর্ব্বের একটী ঘটনা বিবৃত করিতেছি। একদিন পাঁচ বৎসরের একটী বালক জ্বরে পীড়িত হইয়া পড়িল। তাহার পিতা যখন কর্ম্মস্থলে যাইবার জন্য আহার করিতে যাইতেছেন, তখন সে জননীর কোলে শুইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল; পিতা ভাবিলেন, যতখানি জ্বর হইয়াছে, বালকটী তাহার তুলনায় বড় বেশী চীৎকার করিতেছে; তিনি তাহাকে ধমক দিয়া চুপ করিয়া থাকিতে বলিলেন। জননী বলিলেন, "তুমি ওকে বকিও না; একবার থার্ম্মোমিটারটা দাও দেখি, ওর বড় বেশী জ্বর হইয়াছে।" যে থার্ম্মোমিটার পাঁচ মিনিট রাখিতে হয়, তাহা তিন মিনিট রাখিয়াই দেখা গেল, দেহের উত্তাপ ১০৭ এর কাছে উঠিয়াছে। পিতা তখন ঊর্দ্ধশ্বাসে ডাক্তারের বাড়ী পানে ছুটিলেন। এখানে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, জননী তাঁহার সচেতন প্রেমের দ্বারা সন্তানের অবস্থা যতটা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, পিতা তেমন পারেন নাই। এমন দৃষ্টান্ত ঘরে ঘরে কতই রহিয়াছে। দেখিয়াছি, অতি বুদ্ধিমান্ বলিয়া পরিচিত প্রাচীন ব্যক্তি যে কার্য্যটীর কদর্থ করিয়াছেন, একটী নারী বয়স, অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধি সকল বিষয়েই তাঁহার অনেক পশ্চাতে থাকিয়াও প্রেমের বলে চক্ষুর পলকে তাহার গূঢ় মর্ম্ম বুঝিয়া ফেলিয়াছেন। প্রেম যে সত্যনির্দ্ধারণের সহায়, ব্যতিরেকী প্রমাণের দ্বারা অর্থাৎ অপ্রেমের উদাহরণ দিয়াও তাহা প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। যে যাহাকে ভাল বাসে না, সে তাহার কোনই গুণ দেখিতে পায় না। এবিষয়ে একটা কৌতুকজনক গল্প আছে।

দুই ব্যক্তির মধ্যে তৃতীয় একটী ভদ্রলোক সম্বন্ধে কথা হইতেছে। প্রথম ব্যক্তি বলিল, "লোকটী বড় বিদ্বান্।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি। হুঁ, ভারী তো বিদ্বান্, দুই কলম ইংরেজী লিখিতে দশটা ভুল করে।

প্র। তা' যাই বল, ও রকম সুপুরুষ কিন্তু আজকাল খুব কম দেখা যায়—ওর মুখের কি শ্রী!

দ্বি। বলিহারি যাই শ্রী! তুমি কি দেখ নাই, ওর নাকটা কেমন বেজায় লম্বা?

প্র। কিন্তু সদ্বংশজাত তো বটে ?

দ্বি। সদ্বংশ আবার কি ? ওরা যে ভঙ্গ কুলীন !

প্র। সে যাই হোক, লোকটা মুন্সেফী করে।

দ্বি। আরে মুন্সেফ হইলে কি হয়, মাইনা পায় না।

ইহার পরে আর কোনও কথা চলে না। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, এই দ্বিতীয় ব্যক্তি অপ্রেমবশতঃ এমনই মতিচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, যে এই সোজা কথাটাও তাহার মনে ছিল না, যে বাঙ্গলা দেশে অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট আছে বটে, কিন্তু অবৈতনিক মুন্সেফ বলিয়া কোনও জীব নাই। অপ্রেম যে মানুষকে ভ্রান্তিতে লইয়া যায়, তাহার দৃষ্টান্ত আমরা প্রতিনিয়তই দেখিতে পাই। আমাদের কর্ম্মক্ষেত্রে, আমাদের সামাজিক জীবনে, এমন কি জাতিতে জাতিতে অপ্রেম অসত্য ধারণা উৎপাদন করিয়া কি অনর্থই না ঘটাইতেছে! একজন কবি লিখিয়াছেন, "কোয়াসার মধ্যে দূরে প্রকাণ্ড একটা জীব দেখিয়া ভীত হইলাম, ভাবিলাম, একটা দৈত্য আসিতেছে; সে যখন আরও নিকটবর্ত্তী হইল, তখন বুঝিলাম, না, সে দৈত্য নয়, মানুষ; সে যখন কাছে আসিল ও কোয়াসার ব্যবধান একেবারে চলিয়া গেল, তখন দেখিলাম, সে আমারই ভাই।" অপ্রেম এই কোয়াসা, সত্য-নির্ণয়ের মহা অন্তরায়।

কিন্তু প্রেম যেমন সত্য জানিতে সাহায্য করে, তেমনি উহা ভ্রান্তিতেও লইয়া যায়। ইংরেজীতে একটী কথা আছে, "প্রেমিক প্রেমাস্পদে যে সৌন্দর্য্য দেখে, তাহা সে নিজেই রচনা করে।" প্রত্যেক জননী, প্রত্যেক প্রণয়ী প্রণয়িনী ইহার সাক্ষ্য দিবেন। কোন্ জননী সন্তানকে কুৎসিত বলিয়া বিবেচনা করেন? অতুলনীয়া সুন্দরী ডেসডিমোনা কৃষ্ণকায় ওথেলোকে দেখিয়া কেন এমনতর আত্মহারা হইয়া গিয়াছিলেন ? প্রেমের অপরূপ লীলা শুধু বাহ্য আকারেই আবদ্ধ নয়। গুণাগুণ, কার্য্যাকার্য্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্বন্ধেও ইহার প্রভাব বিচিত্র। প্রেমিক প্রেমাস্পদের দোষ দেখিতে পায় না; জনকজননীর প্রেমান্ধতা অনেক স্থলেই সন্তানের দুর্গতির কারণ হয়। মহাভারতকার দেখাইয়াছেন, পুত্রস্নেহ ধৃতরাষ্ট্রকে এমনই বিকল করিয়াছিল, যে দুর্য্যোধন নিজের হাতে কুরুকুল বিনাশের আয়োজন করিতেছেন, ইহা স্পষ্ট বুঝিয়াও তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারেন নাই। ইহার পরে দেখা যাইবে, স্বদেশ-প্রীতি অনেক সময়ে লোককে সত্যের প্রতি কেমন বিমুখ করে।

আমাদিগের দৈনন্দিন জীবন আলোচনা করিলে দেখিতে পাইব, যে আমরা পরস্পরের সহিত আলাপে প্রলাপে মেলা মেশার আচারে ব্যবহারে যে সকল মত প্রকাশ করি বা যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হই, তাহার মধ্যে অধিকাংশ স্থলে যুক্তি অপেক্ষা আধিপত্য প্রবল। অনেকের পক্ষেই বিশুদ্ধ জ্ঞানানুগত মত গঠন করা অসাধ্য। স্নেহ, দয়া, মমতা, হিংসা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি বর্জ্জন করিয়া পরিচ্ছন্ন জ্ঞানের সাহায্যে প্রত্যেক বিষয়ের বিচার করা কত কঠিন। প্রেম ভিন্ন মানুষ বাঁচিতে পারে না, অথচ বাস্তবতার সহিত তাহাকে যুক্ত রাখা কি এক বিষম পরীক্ষা!

অন্তর্নিহিত অন্তরায়গুলির কথা একপ্রকার বলা হইল। ঈশ্বর আমাদিগকে যে সকল ও যে প্রকার মনোবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, আমাদিগকে তাহা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। শিক্ষা ও সাধন-সাহায্যে সেগুলির যত উৎকর্ষ সাধিত হইবে, ততই তাহারা সত্যাবধারণের উপযোগী হইবে। তৎপরে আমাদিগের ভাব বা প্রবৃত্তিগুলি যত মার্জ্জিত ও শৃঙ্খলিত হইবে, ততই সেগুলির প্রতিকূলতা মন্দীভূত হইয়া আসিবে। শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক, এই ত্রিবিধ শিক্ষার অভিপ্রায়ই এই যে, তাহা আত্মার সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধন করিবে এবং

বিরোধী চিত্তবৃত্তি সমূহকে সত্যানুসন্ধানের অনুকূল করিয়া দিয়া জীব ও ব্রহ্মের সাক্ষাৎ পরিচয় সুগম করিয়া তুলিবে।

(খ) সংস্কারজাত অন্তরায়

এই অন্তরায়গুলি ছাড়া আর এক শ্রেণীর অন্তরায় আছে ; আমরা তাহাকে সংস্কারজনিত অন্তরায় বলিব। 'সংস্কার' শব্দটি এখানে বৌদ্ধ-শাস্ত্রোক্ত "সংখার" শব্দের অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। উহার অর্থ মনের ঝোঁক, গতি, প্রবণতা, ইংরেজী predisposition, bias হার্ব্বার্ট স্পেন্সার "সমাজতত্ত্বের অনুশীলন" (The Study of Sociology) নামক পুস্তকে সাত প্রকার সংস্কার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। একে একে সেগুলি বিবৃত হইতেছে।

(১) শিক্ষাজনিত সংস্কার (Educational Bias)

শিক্ষা বলিতে শুধু বিদ্যালয়ে জ্ঞানোপার্জ্জন বুঝাইতেছে না। মানুষ গৃহে; বিদ্যালয়ে, সমাজে যাহা দেখে শুনে শিক্ষা করে, সে সমুদায়ই ইহার অন্তর্গত। এক কথায় বলা যাইতে পারে, শিক্ষার অর্থ আবেষ্টনের প্রভাব। এক জন যে প্রকার পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে লালিত পালিত ও বর্দ্ধিত হয়, তাহার মতামত অলক্ষিতভাবে সেইরূপে গঠিত হয়। ইহাকেই আমরা বলি শিক্ষাজনিত সংস্কার। ইহা সত্য নির্ণয়ের যে কি দুরতিক্রমণীয় প্রতিবন্ধক, তাহা পরবর্ত্তী দৃষ্টান্তগুলি হইতে পরিস্ফুট হইবে। একটা কথা সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। নূতন একটা কিছু দেখিলেই লোকে বলিয়া উঠে, "ওঃ, ওটা অস্বাভাবিক।" জিনিসটা বাস্তবিকই অস্বাভাবিক অর্থাৎ স্বভাব বা নৈসর্গিক নিয়মের বিরোধী কি না, তাহা কেহই ভাবিয়া দেখে না ; তাহারা পূর্ব্বে যাহা কখনও দেখে নাই, তাহাই অস্বাভাবিক বলিয়া বিবেচনা

করে। পাড়াগাঁয়ে যদি লোকে দেখে, একজন রমণী সাইকেল চড়িয়া বেড়াইতেছেন, তবে তাহারা নিশ্চয়ই কাজটা খুব অস্বাভাবিক মনে করিবে ; কিন্তু যাহারা সহরে থাকে, তাহাদিগের উহা, অন্ততঃ শ্বেতাঙ্গিনীগণের পক্ষে, সহিয়া গিয়াছে। এখনও বৃটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় পুরী কলিকাতাতেই এমত কত শুভ প্রস্তাবের প্রতিবাদ হইয়া থাকে, যাহার একমাত্র অপরাধ, সেগুলি নূতন। শিক্ষাজনিত সংস্কারের প্রতি কটাক্ষ করিয়াই সুধীজনাগ্রগণ্য জন ষ্টুয়ার্ট মিল বলিয়াছেন, "Unnatural generally means uncustomary"—অর্থাৎ অধিকাংশস্থলেই অস্বাভাবিক শব্দটির অর্থ অনভ্যস্ত বা বিরল। লোকে যতদিন কোন একটা বস্তু বা ব্যাপারে অভ্যস্ত না হয়, ততদিন সেটাকে অস্বাভাবিক বলিয়া দূরে ঠেলিয়া রাখিতে চায় ; কিন্তু দেখিয়া দেখিয়া যখন তাহার নূতনত্ব চলিয়া যায়, তখন তাহার মধ্যে যেটুকু ভাল আছে, তাহা বুঝিতে পারে ; ক্রমে তাহাদিগের এমন অবস্থা হয়, যে ঐ বস্তুটী না হইলে তাহাদিগের দিনপাত করা অসম্ভব হইয়া উঠে। ইহার গুটি দুই দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষযাম পর্যন্ত লণ্ডনের রাস্তায় রাত্রিকালে আলো দিবার ব্যবস্থা ছিল না। এজন্য সন্ধ্যার পরেই রাস্তাগুলি পথিকের পক্ষে একান্ত বিপদসঙ্কুল হইয়া পড়িত ; চুরি ডাকাতি, রাহাজানী, নরহত্যা, ব্যভিচার প্রভৃতি রাজপথের নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা ছিল ; রজনীর অন্ধকার আশ্রয় করিয়া রাজার সহচরগণ পর্য্যন্ত মদোন্মত্ত হইয়া বিবিধ দুষ্কার্য্যে লিপ্ত হইত। নিরীহ পথিকগণের ধনপ্রাণ যাহাতে কিঞ্চিৎ নিরাপদ হয়, সেই অভিপ্রায়ে ১৬৮৫ খৃষ্টাব্দে এডোয়ার্ড হেমিঙ্গ (Heming) নামক একব্যক্তিকে কয়েক বৎসরের জন্য সামান্য লাভে রাস্তায় আলো দিবার একচেটিয়া অধিকার প্রদত্ত হইল। স্থির হইল, যে তিনি ২৯এ সেপ্টেম্বর হইতে ২৫এ

মার্চ্চ এই ছয়মাস কৃষ্ণপক্ষে সন্ধ্যা ছয়টা হইতে রাত্রি বারটা পর্য্যন্ত দশ দশ বাড়ী অন্তর একএকটী বাতি জ্বালিয়া রাখিবেন। যাহারা উন্নতির পক্ষপাতী, তাহারা এই প্রস্তাবে আনন্দিত হইল বটে, কিন্তু একান্ত রক্ষণশীল বহুসংখ্যক নগরবাসী যেই শুনিতে পাইল, যে রাত্রিতে রাস্তায় আলো দিবার কথা উঠিয়াছে, অমনি তাহারা সেই সৃষ্টিছাড়া প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিল। "আমরা নব আলোক চাই না, আমরা নব আলোক চাই না," এই বলিয়া চীৎকার করিয়া করিয়া তাহারা ব্যোমমেদিনী কাঁপাইয়া তুলিল। সে কি ভীষণ কোলাহল! "শত শত বৎসর ধরিয়া আমাদিগের পূর্ব্বগামিগণ এই নগরে নিশার প্রগাঢ় তিমিরে বিনা আলোকে রাজপথে যাতায়াত করিতে পারিলেন, আর তোমরা কোন্ স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইলে, যে তোমাদিগের আলোক না হইলে চলিবে না? না, তাহা হইবে না, কিছুতেই রাস্তায় আলো দিতে দিব না।" নগরপালগণ বুঝিয়াছিলেন, প্রস্তাবটী কার্য্যে পরিণত হইলে পুরীর অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে; তাঁহারা প্রতিবাদকারীদিগের যুক্তি শুনিয়া টলিলেন না, তাহাদিগের চীৎকারে ভয় পাইলেন না। প্রধান প্রধান রাজপথে আলোকস্তম্ভ স্থাপিত হইল, দূরসন্নিবিষ্ট স্তিমিত প্রদীপমালায় তমসাচ্ছন্ন রজনী কয়েক ঘণ্টার জন্য কিয়ৎপরিমাণে আলোকময় হইয়া উঠিল। প্রতিবাদকারীরা দেখিল, ইহাতে সহরটী টেমসনদীর গর্ভে তো প্রবেশ করিলই না, বরং তাহাদিগের চলাফেরার পক্ষে বিলক্ষণ সুবিধাই হইল। তাহারাও ক্রমে এই 'নবলোকের' পক্ষপাতী হইয়া পড়িল। এখন তো লণ্ডনে অনেক সময়ে দিনের বেলাতেও আলো না হইলেও চলে না।

স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদের ব্যাপার ইহা অপেক্ষাও কৌতুকাবহ। আবহমানকাল হইতে সেখানকার অধিবাসীরা রাজপথে যত আবর্জ্জনা

ও অনুচ্চার্য্য ন্যক্কারজনক পদার্থ নিঃক্ষেপ করিত। এই সনাতনপ্রথার ফলে রাস্তার দুই ধারে ঐ পদার্থগুলি স্তূপীকৃত হইয়া উঠিয়াছিল এবং সেজন্য বৈদেশিকেরা ঐ নগরে তিষ্ঠিতে পারিত না। ১৭৬০ সনে কতিপয় রাজপুরুষ প্রস্তাব করিলেন, যে আবর্জ্জনাগুলি নগরের বাহিরে নিঃক্ষেপ করিয়া পথঘাট পরিষ্কার করা হউক। আর যাও কোথায়! যেই প্রস্তাবটী নগরবাসীদিগের কর্ণগোচর হইল, অমনি তাহারা একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিল। ইতরজনের কথায় কাজ কি, শিক্ষিত লোকেরা পর্য্যন্ত উচ্চকণ্ঠে এই অভিনব প্রস্তাবের নিন্দা করিতে লাগিল। কর্ত্তৃপক্ষ বৈদ্যসমাজের মত জিজ্ঞাসা করিলেন; জীবনমরণের বিধাতা চিকিৎসকগণ সবিশেষ বিজ্ঞতাসহকারে বিষয়টীর আলোচনা সমাধা করিয়া এই অভিমত প্রদান করিলেন—"আবর্জ্জনাগুলি যেখানে আছে, সেইখানেই থাক্। ওগুলি দূরে নিঃক্ষেপ করিতে গেলেই একটা নূতন সংস্কার প্রবর্ত্তন করা হইবে; তাহার কি ফল হইবে, কে জানে? আমাদিগের পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ, সকলে ঐ আবর্জ্জনারাশির মধ্যে জীবনপাত করিয়া গিয়াছেন; তাঁহারা জ্ঞানী পুরুষ ছিলেন, সমুচিত কারণ না থাকিলে তাঁহারা কখনই এরূপ করিতেন না। দুর্গন্ধের বিষয়ে যে অভিযোগ শুনা যাইতেছে, তাহাও কোনও কাজের কথা নহে; কেননা, খুব সম্ভব দুর্গন্ধ স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী; বায়ুতে নানাপ্রকার বিষাক্ত পদার্থ আছে; মলমূত্রাদির পুতিগন্ধ সেগুলিকে শোধন করে। অতএব পূর্ব্বপুরুষগণ যে প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা লঙ্ঘন করিবার প্রয়োজন নাই; রাজপথগুলি যেমন অপরিষ্কৃত আছে, তেমনি থাক্।"

রাশিয়ার ইতিহাস হইতে দুই একটী ঘটনা উল্লেখ করিতেছি, পাঠকগণ উহা হইতে বেশ আমোদ পাইবেন। রাশিয়া-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা

পিটার (Peter the Great) রাষ্ট্রমধ্যে নানাপ্রকার হিতকর সংস্কার প্রবর্ত্তন করেন; প্রাচীনত্বের উপাসক গোঁড়া খৃষ্টানেরা তাহার প্রত্যেকটীতেই ঘোরতর অসন্তুষ্ট হয়। সে দেশে সেপ্টেম্বর মাসে বৎসর আরম্ভ হইত; পিটার আইন করিলেন, জানুয়ারী মাস হইতে নববৎসর আরম্ভ হইবে। গোঁড়ার দল বলিতে লাগিল, "ঈশ্বরের বৎসরকে বিদায় দিয়া শয়তানের বৎসর প্রবর্ত্তন করা হইল। জানুয়ারী মাসই যদি বৎসরের প্রথম মাস হয়, তবে তো এই জগৎ ঐ মাসে সৃষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু তাহা হইতেই পারে না, কেন না, জানুয়ারী মাসে আতাফল পাকে না; এবং আতাফলই যদি না পাকিল, তবে যে বাইবেলে লেখা আছে শয়তানের প্রলোভনে পড়িয়া আদিজননী ঈভ (Eve) আতাফল খাইয়াছিলেন, তাহাই বা কিরূপে সম্ভব হয়?' সেকালে রাশিয়ার অধিবাসীরা বড় অপরিচ্ছন্ন ছিল; সম্রাট্ আদেশ করিলেন, তাহারা দাড়ি রাখিতে পারিবে না। ধর্ম্মান্ধ লোকেরা "ধর্ম্ম গেল ধর্ম্ম গেল" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। "কি দুরভিসন্ধি! ঈশ্বর মানবকে আত্মপ্রতিকৃতিতে সৃষ্টি করিয়াছেন। দাড়ি ফেলিয়া দিয়া সেই প্রতিকৃতিতে বিকৃত করা! মুখে দাড়ি না থাকিলে বিচারের দিনে পরিত্রাতা তাঁহার ভক্তগণকে চিনিবেন কি করিয়া?" এই প্রকার বিবিধ সংস্কারে ত্যক্তবিরক্ত হইয়া রক্ষণশীলদল সিদ্ধান্ত করিল, পিটার শয়তানের অবতার।

শিক্ষাজনিত সংস্কার মানুষকে এমনি সত্যের প্রতি, কল্যাণের প্রতি বিমুখ করে। কিন্তু কেবল বিদেশের কথাই বা বলি কেন? এই বাংলা দেশে উনবিংশ শতাব্দীতে যে সকল সংস্কারের সূত্রপাত হইয়াছে, তাহারই দুই একটীর উল্লেখ করা যাক্। আজকাল ডাক্তারী শিক্ষার প্রতি লোকের অনুরাগ কত বাড়িয়াছে। কলিকাতার মেডিকেল কলেজে

প্রবেশ করিতে যাইয়া প্রতি বৎসর শত শত যুবক বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আইসে; বেলগাছিয়ায় আর একটী কলেজ হইয়াছে; তাহাতে অল্প সংখ্যক ছাত্র লইবার ব্যবস্থা আছে, তথাপি দেশের লোক ঐ কলেজের প্রতিষ্ঠায় কত আনন্দিত হইয়াছে। বঙ্গদেশের পল্লীসমূহে চিকিৎসায় যেরূপ অব্যবস্থা রহিয়াছে, তাহাতে নগরে নগরে মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হইলেও ছাত্রের অভাব হইবে না। কিন্তু ১৮৩৫ সনে যখন কলিকাতায় মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন কত অল্প বাঙ্গালী যুবক তাহাতে প্রবেশ করিয়াছিল! তাহাদিগের মধ্যেও প্রায় সকলেই শবব্যবচ্ছেদ করিতে অস্বীকৃত হইল। একা মধুসূদন গুপ্ত সাহসে বুক বাঁধিয়া জাতিনাশ ও ধর্ম্মনাশের বিভীষিকা অগ্রাহ্য করিয়া এই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন। যে মুহূর্ত্তে তাঁহার ছুরিকা শব স্পর্শ করিল, সেই মুহূর্ত্তে ফোর্ট উইলিয়াম হইতে তোপধ্বনি হইল; গগন বিদীর্ণ করিয়া সেই ধ্বনি বাঙ্গালী জাতিকে জানাইয়া দিল যে, বঙ্গদেশে এক মহা বিপ্লবের সূচনা হইয়াছে। সেই দিন, আর এই দিন!

এই ঘটনার কয়েক বৎসর পরে নারীশিক্ষার জন্য মহানুভব বীটন (Bethune) সাহেবের উদ্যোগে যখন বেথুন স্কুল স্থাপিত হইল, তখন কলিকাতার মানীগুণী ব্যক্তিরা তৎপ্রতি কি উপেক্ষাই প্রদর্শন করিয়াছিলেন! বালিকা বিদ্যালয় খুলিয়া শিক্ষকেরা বসিয়া আছেন, কিন্তু তাহাতে বালিকা নাই, কেহই তাহাতে কন্যা পাঠায় না। সকলেই ধুয়া ধরিয়াছে যে, বিদ্যাশিক্ষা করিলে নারীরা অকালে বিধবা হইবে। অন্ধ সংস্কারের এই একাধিপত্যের যুগে প্রাতঃস্মরণীয় মদনমোহন তর্কালঙ্কার সর্ব্বপ্রথমে আপনার দুইটী কন্যাকে বেথুন স্কুলে প্রেরণ করেন। তদবধি ভারতবর্ষে নারীশিক্ষার কত প্রসার হইয়াছে। এখনও এদেশের লোক রমণীগণের উচ্চশিক্ষার প্রতি বীতরাগ; এখন পর্য্যন্ত নারীজাতির মধ্যে

নিম্নশিক্ষাও খুব অল্পই বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু তথাপি সেকাল আর একালের তুলনা করুন। এখন যদি ভদ্রবংশের কোনও বালিকা অন্ততঃ চিঠীপত্র লিখিবার মত বিদ্যা উপার্জ্জন না করে, তবে তাহার বিবাহ হওয়া অতি সুকঠিন।

তারপর ধরুন বাল্যবিবাহ। ধনী ও অশিক্ষিত পরিবার ভিন্ন অন্যত্র বালকদিগের বিবাহ বড় প্রচলিত নাই। সুতরাং আমরা এখানে বালিকা-গণের কথাই বলিব। "অষ্ট বর্ষে ভবেদ্ গৌরী", আট বৎসর বয়সে কন্যার বিবাহ দেওয়াই প্রশস্ত, শতশত বৎসর ধরিয়া প্রাচীন সমাজ ইহাই বলিয়া আসিয়াছে। সুতরাং প্রথমে যখন বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে একটু আধটু আন্দোলন উপস্থিত হইল, তখন সমাজ আন্দোলনকারীদিগের উপরে একেবারে খড়্গহস্ত হইল। "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি-যত্নতঃ," কন্যাদিগকেও পুত্রগণের ন্যায় অতি যত্নে পালন করিবে ও শিক্ষা দিবে; এবং বয়ঃপ্রাপ্তা হইবার পূর্ব্বে তাহাদিগকে বিবাহ দিবে না, একথা বলিলে গোঁড়া লোকেরা কাণে আঙ্গুল দিত। এখন পাশ্চাত্যশিক্ষা, ব্রাহ্মসমাজের আন্দোলন, আর্থিক অবস্থার গুরুতর পরিবর্ত্তন প্রভৃতির ফলে সে ভাব অনেকটা দূর হইয়াছে। এখন অনেকে ১৮।১৯।২০ বৎসরের পূর্ব্বে কন্যাদিগের বিবাহ দিতে পারেন না। কেহ কেহ বি-এ পর্য্যন্ত পড়াইয়া বা তাহারও পরে কন্যার বিবাহ দিতেছেন। বাল্যবিবাহরূপ ব্যাধি অদ্যাপি সমাজকে বিকলাঙ্গ করিয়া রাখিয়াছে; কিন্তু প্রাচীন সমাজের অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি ইহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিয়া-ছেন। শিক্ষাজনিত সংস্কারবশতঃ লোকে যাহা সনাতনপ্রথা বলিয়া ধরিয়া রহিয়াছে, সংস্কারমুক্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা তাহা নিশ্চয় ত্যাগ করিবে।

বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধেও এই কথা। পুণ্যশ্লোক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

এই সংস্কারটী প্রবর্ত্তনের উদ্দেশ্য যখন তাঁহার বিধবা বিবাহ বিষয়ক পুস্তক প্রকাশ করেন, তখন তাঁহাকে কি গঞ্জনা লাঞ্ছনাই না সহ্য করিতে হইয়াছিল! ঈশ্বরচন্দ্রের আশা সম্যক্ পূর্ণ হয় নাই, বিধবাবিবাহ এখন পর্য্যন্ত বাঙ্গলাদেশে যথোচিত প্রচলিত হয় নাই, কিন্তু উহার বিরুদ্ধে যে তীব্র আন্দোলন উত্থিত হইয়াছিল, তাহা থামিয়া গিয়াছে, ধীরে ধীরে উহা সমাজে চলিয়া যাইতেছে। অনভ্যস্ত বলিয়া যাহা একান্ত বিভৎস বোধ হইয়াছিল, ক্রমে লোকে তাহার প্রয়োজন উপলব্ধি করিতে পারিতেছে। এখনও যতটা বিরুদ্ধভাব আছে, তাহা ঐ শিক্ষাজনিত সংস্কারের ফল।

বিধবাবিবাহের প্রসঙ্গে সতীদাহের কথাটাও একটু বলি। বঙ্গদেশে ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতেই রাজপুরুষগণ এই নির্ম্মম প্রথা উঠাইয়া দিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন; কিন্তু একটা ভয়ে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত তাঁহারা কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁহারা মনে করিতেন, এই প্রথাটী হিন্দুশাস্ত্রের অনুমোদিত, সুতরাং উহা রহিত করিলে হিন্দুধর্ম্মে আঘাত করা হইবে, এবং ধর্ম্মে আঘাত করিলেই সিপাহীরা বিদ্রোহী হইয়া একটা অনর্থ ঘটাইবে। এই জন্য লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময় হইতে পরোক্ষভাবে সতীদাহ নিবারণের চেষ্টা করিলেও কোম্পানী বাহাদুর উহা নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিতে সাহসী হন নাই। বঙ্গবাসীগণের মধ্যে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় সর্ব্বপ্রথম এই প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত করেন। এজন্য তাঁহাকে কতই নির্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল। তিনি শাস্ত্রীয়বিচারপূর্ণ বিবিধ পুস্তক প্রচার করিয়া রাজপুরুষগণকে বুঝাইয়া দেন যে, হিন্দুশাস্ত্রের কোথাও এমন আদেশ নাই যে, বিধবাদিগকে চিতাতে দগ্ধ করিয়া হত্যা করিতে হইবে। ১৮২৮ সনে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক বড়লাট হইয়া

এদেশে আগমন করেন। তিনি দেখিলেন, যে সতীদাহ প্রথা উঠাইয়া দিবার বিরুদ্ধে একটা প্রধান আপত্তি কাটিয়া গিয়াছে; তখন তিনি ৫৯ জন সৈনিক কর্ম্মচারীর নিকটে গোপনে এক পত্র লিখিয়া জানিতে চাহিলেন, যে সতীদাহ আইন করিয়া উঠাইয়া দিলে সিপাহীদিগের বিদ্রোহী হইবার সম্ভাবনা আছে কি না। তাঁহারা সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া এই মত প্রকাশ করিলেন, যে সিপাহীরা যে সকল প্রদেশ হইতে সংগৃহীত হয়, তথায় এই প্রথাটী তত প্রচলিত নাই; উহা বঙ্গদেশেই একান্ত প্রবল। বাঙ্গালীরা কস্মিন্‌কালেও রাজদ্রোহী হয় নাই; সুতরাং উহা রহিত করিলে অন্তর্বিপ্লব ঘটিবার কিছুমাত্র আশঙ্কা নাই। এই আশ্বাস পাইয়া লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক ১৮২৯ সনের ৪ঠা ডিসেম্বর সতীদাহ প্রথা নির্ম্মূল করিবার অভিপ্রায়ে এক আইন (Regulation No XVII) প্রণয়ন করেন। ইহাতে বাঙ্গালী জাতি বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল না বটে, কিন্তু তাহাদিগের বাগ্‌যুদ্ধ অনেক দিন চলিল। এই প্রথাটি সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্য বিশিষ্ট বিশিষ্ট বাঙ্গালীরা ইংলণ্ডের অধিপতির নিকটে এক আবেদনপত্র প্রেরণ করিয়াই নিরস্ত হইলেন না; বড়লাটের ঘোষণাটী যে বে-আইনী হইয়াছে, তাহা প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে প্রিভিকাউন্সিলে তাঁহারা এক মোকদ্দমাও উপস্থিত করিলেন। তাঁহাদিগের সকল শ্রম ব্যর্থ হইল, দেশের একটা মহা কলঙ্ক দূর হইল। এখন অতি বড় গণ্ডমূর্খ' ও সতীদাহ প্রথার সমর্থন করিতে লজ্জাবোধ করে।

আর একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। বঙ্গদেশের প্রায় সর্ব্বত্র এখনও নারীজাতির অবরোধপ্রথা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। রমণীরা নদীতীরে কিংবা উদ্যানে বায়ুসেবনের জন্য গমন করিলে তাঁহাদিগের নিন্দার অবধি থাকে না। অথচ দার্জ্জিলিং, বৈদ্যনাথ, গিরিধি প্রভৃতি স্থানে কুলবধূরা স্বচ্ছন্দে প্রকাশ্য দিবালোকে পুরুষগণের সমক্ষে বিচরণ করেন, তাহাতে

কেহই তাঁহাদের শীলতার হানি হইল বলিয়া খেদ করে না। দার্জ্জিলিঙ্গে জাতীয় বিজাতীয় শত শত পুরুষের চক্ষুর সম্মুখে যাঁহারা নিঃসঙ্কোচে প্রাতঃসন্ধ্যা পরিভ্রমণ করেন, তাঁহারাই আবার কলিকাতায় এক গৃহ হইতে অন্য গৃহে যাইবার কালে অতি সন্তর্পণে গাড়ীর সমুদায় দরজা জানালা বন্ধ করিয়া দেন। ইহারই বা কারণ কি? পাঞ্জাব, বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশ, কাশী, পুরী প্রভৃতি তীর্থস্থানের কথা না হয় নাই বলিলাম। লোকে গ্রীষ্মাবাসে যাহা সহিতে পারে, সমতল-ভূমিতে তাহা দেখিলেই বিরক্ত ও উত্তেজিত হয় কেন? অবরোধ-প্রথার সপক্ষে যদি কোনও যুক্তি থাকে, তবে তাহা পল্লীগ্রামে যেমন খাটিবে, শৈলনিবাসেও ঠিক্ তেমনি খাটিবে। প্রকৃত কথা এই যে, এস্থলে লোকে যুক্তির কথা মোটেই ভাবে না; শিক্ষাজনিত সংস্কার তাহাদিগকে যে পথে চালায়, তাহারা সেই পথেই চলে।

জাতিভেদ সম্বন্ধে আলোচনা করিলেও আমরা ইহাই দেখিতে পাই। বিগত শতাব্দীর দ্বিতীয় যামে হিন্দু স্কুলের ছাত্রেরা যখন নিষিদ্ধ খাদ্য ভক্ষণ করিয়া জাতিভেদের দুর্গে আঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন দেশে "জাতি গেল" "ধর্ম্ম গেল" বলিয়া তুমুল কোলাহল উঠিয়াছিল। এখন স্পর্শ-সংক্রামক ও খাদ্যাখাদ্য-ভেদরচিত জাতিবিচার এক রকম উঠিয়াই গিয়াছে। আজকাল জাতিভেদ একমাত্র বিবাহে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে; মনে হইতেছে, জাতিভেদের এই শেষ আশ্রয়ও বুঝি যায়। শীঘ্র হউক, বিলম্বে হউক, লোকের চিত্ত যত উন্নত ও উদার হইবে, এই পাপও ততই সমাজ হইতে বিদায় গ্রহণ করিবে।

দুইটী ব্যাধি প্রাচীন সমাজকে অবশ ও বিকলাঙ্গ করিয়া ফেলিয়াছে; একটী স্ত্রীশিক্ষার অভাব ও বাল্যবিবাহ; দ্বিতীয়টী জাতিভেদ। শিক্ষা-জনিত সংস্কার এই দুই ব্যাধির প্রতিকারে ব্যাঘাত জন্মাইতেছে। রোগ

দুইটী দেশের কি সর্ব্বনাশ করিতেছে, তাহা বুঝিতে কাহারও বড় বাকি নাই; যুক্তিতর্কের যাহা করিবার ছিল, তাহা করিয়াছে; তথাপি যে রোগের প্রশমন হইতেছে না, তাহার কারণ, দেশবাসী আপনাদিগকে সংস্কারের বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে পারিতেছে না।

(২) স্বদেশপ্রীতিজাত সংস্কার।

(The Bias of Patriotism.)

সত্য গ্রহণের এক মহা প্রতিবন্ধক এই স্বদেশ-প্রীতিজাত সংস্কার। স্পেন্সার বলিয়াছেন, ব্যক্তিগত জীবনে আত্মপ্রীতি যা', জাতীয় জীবনে স্বদেশ প্রীতিও ঠিক তাই। (Patriotism is nationally that which egoism is individually)। আপনাকে কে না ভালবাসে? আত্মপ্রীতি জীবন রক্ষার সহায়; যে আপনার সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন, সে দুই দিনও বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু আত্মপ্রীতি যদি নিরবচ্ছিন্ন স্বার্থপরতাতে পরিণত হয়, তবে তাহা একটা ব্যাধি হইয়া দাঁড়ায়। যে ব্যক্তি আপনাকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসে ও শয়নে স্বপনে আহারে বিহারে আপনার কথাই সকলের আগে ভাবে, সে কখনও শান্তিতে সমাজে বাস করিতে পারে না—সে বাস্তবিক মনুষ্য নামেরই যোগ্য নয়। তেমনি স্বদেশপ্রীতিও এক অমূল্য গুণ; যে আপনার জন্মভূমিকে ভালবাসে না, জন্মভূমির ক্রোড়ে তাহার স্থান নাই, সে মনুষ্য হইয়া পশুর অপেক্ষাও অধম। কিন্তু এই গুণেরও ব্যভিচার আছে। এই ব্যভিচারের ফল কি ভীষণ, বর্ত্তমান যুদ্ধ তাহা চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিতেছে। সকল দেশেই এক শ্রেণীর লোক আছে, তাহারা অবিরত এই বলিয়া চীৎকার করিতেছে, "ন্যায় করুক, অন্যায় করুক, আমার দেশের জয় হউক।" ইহারা স্বদেশপ্রেমের

চরণে ধর্ম্মাধর্ম্ম বোধকে বলি দিয়াছে। স্বজাতির প্রতি আন্তরিক অনুরাগ ও অন্য জাতির প্রতি বিজাতীয় বিদ্বেষ ইহাদিগকে এমনই অন্ধ করিয়া ফেলিয়াছে, যে ইহারা পৃথিবীর আর কোথাও প্রশংসা বা গ্রহণ করিবার কিছুই দেখিতে পায় না; ইহাদিগের কথা শুনিলে মনে হয়, অপরাপর দেশের অধিবাসীরা মানুষ কি না, তাহাই সন্দেহের বিষয়। আমরা আজিও স্বদেশপ্রীতি জিনিসটী উপার্জ্জন করিতে পারি নাই, কিন্তু তাহার বিকারটা আমাদিগের মধ্যে বিলক্ষণ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। "ভারতের আর্য্যজাতি যেমন ধর্ম্মপরায়ণ, জগতে এমন আর কোন্ জাতি আছে?" "হিন্দু নারীর পাতিব্রত্য ভূতলে অতুলনীয়"; "আমাদের একান্নবর্ত্তী পরিবার, আমাদের আতিথেয়তা, আমাদের পিতৃমাতৃভক্তি আমাদিগকে মহীয়ান্ করিয়া রাখিয়াছে"—ইত্যাদি কথা সভাসমিতিতে নিরন্তরই শুনা যাইতেছে; কিন্তু কথাগুলির কোনও ভিত্তি আছে কি না, কয়জনে তাহার অনুসন্ধান করে? স্বদেশের যাহা কিছু ভাল, তাহা সযত্নে রক্ষা কর; কিন্তু তোমার যাহা আছে, তাহাই ভাল; অথবা এদেশের যেটী যেমন ভাল, তেমনটী আর কোথাও মিলে না, পরীক্ষা না করিয়াই এমন কথা বল কেন? পুত্র যাহাতে পিতার সদ্‌গুণরাশির অধিকারী হইতে পারে তজ্জন্য তাহার দিবারাত্রি শ্রম করা উচিত; কিন্তু তাঁহার যদি কোনও দুরারোগ্য ব্যাধি থাকে, তবে সে কি তাহাকেও আদর করিয়া দেহে পোষণ করিবে? আহরণ ও নিষ্কাশন জীবদেহের একটী লক্ষণ; উহা বাহির হইতে আপনার উপযোগী উপাদান আহরণ করে ও অভ্যন্তরে যে সকল দূষিত পদার্থ প্রবেশ করে বা সঞ্চিত হয়, তাহা নিষ্কাশিত করিয়া দেয়। যতদিন দেহের এই দ্বিবিধ ক্রিয়া অবাধে চলিতে থাকে, ততদিনই তাহার জীবন রক্ষা পায়; এই কার্য্যে ব্যাঘাত উপস্থিত হইলেই প্রথমে রোগ ও পরে মৃত্যু আসিয়া তাহাকে গ্রাস করে।

জাতীয় জীবনের পক্ষেও ঠিক্ এই নিয়ম। জীবিত জাতি দেশকাল নির্ব্বিশেষে নানাদিক্ হইতে বিবিধ উপাদান আহরণ করে, এবং যে সকল ব্যবস্থা কালবশে বিকৃত হইয়া তাহার পক্ষে বিষস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়, ভ্রান্ত অতীত গৌরবের মোহে সেগুলিকে কিছুতেই সমাজ-দেহে পুষিয়া রাখে না। জাপানের সহিত ভারতবর্ষের তুলনা করিলেই সুস্থ ও জীবিত এবং ব্যাধিক্লিষ্ট ও মৃতকল্প জাতির পার্থক্য উজ্জ্বলরূপে প্রতীয়মান হইবে।

ইংরেজীতে একটি প্রবচন আছে—"There is a soul of good in things evil", অমঙ্গলের মধ্যে মঙ্গলের বীজ নিহিত আছে। একজন সুবিখ্যাত ইংরেজ রাজপুরুষের অন্ধ স্বজাতিপ্রীতি ভারতের সমূহ কল্যাণ-সাধন করিয়াছে। কথাটা একটু খুলিয়া বলি। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বুঝিতে পারিলেন, যে এদেশে লোক-শিক্ষার ব্যবস্থা করা তাঁহাদিগের একটী অবশ্য পালনীয় কর্ত্তব্য। তখন প্রশ্ন উঠিল যে, শিক্ষা প্রদানের জন্য কোন্ ভাষা নির্ব্বাচিত হইবে? একদল বলিলেন, সংস্কৃত, আরবী ও পারসী ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হউক; প্রতিদ্বন্দ্বী দল বলিলেন, ইংরেজী ভাষা শিখাইবার উদ্দেশ্যে বিদ্যালয় স্থাপিত হউক। শেষোক্ত মতাবলম্বী মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, ডেভিড হেয়ার প্রভৃতির উদ্যোগে ১৮১৭ সনে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহার পরে ১৮২৩ সনে রামমোহন বড়লাট লর্ড আমহার্ষ্ট'কে শিক্ষা সম্বন্ধে একখানি যুক্তিপূর্ণ পত্র লিখেন; তাহাতে তিনি এই মত প্রকাশ করেন যে, এতদ্দেশীয় জনগণকে পাশ্চাত্য ভাষা ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষা না দিয়া বিদ্যালয়ে কেবল প্রাচ্য ভাষার চর্চ্চা বহাল রাখিলে এদেশের কোনই উন্নতি হইবে না। কিন্তু ইহার পরেও দীর্ঘকাল প্রশ্নটীর সমাধান হইল না। লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কের আমলে ১৮৩৩ সনে মেকলে ভারত গবর্ণমেণ্টের আইন সচিব হইয়া এদেশে আগমন করেন ও শিক্ষাসমিতির সভাপতির পদে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি ১৮২৫ সনের ২রা ফেব্রুয়ারী শিক্ষাবিষয়ক যে মন্তব্য (Minute) প্রকাশ করেন তাহার ফলেই ভারতবর্ষে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তিত করা স্থির হয়। ঐ মন্তব্যটীতে বিবিধ যুক্তি দ্বারা মেকলে প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন যে, কোম্পানী বাহাদুর যদি কেবল প্রাচ্য-ভাষার শিক্ষাতেই অর্থ প্রদান করেন, তবে ঐ অর্থের সদ্ব্যবহার হইবে না, কেন না, সংস্কৃত, আরবী বা পারসীতে এমন কোন গ্রন্থই নাই যাহা পড়িয়া কেহ বাস্তবিক সুশিক্ষিত বলিয়া গণ্য হইতে পারে। "A single shelf of a good European library is worth the whole native literature of India and Arabia" "ইয়ুরোপের একটা ভাল লাইব্রেরীতে একটা শেল্‌ফে যে বইগুলি আছে, ভারতের ও আরবের সমগ্র গ্রন্থগুলি অপেক্ষা তাহার মূল্য অধিক।" অতএব, সংস্কৃত, আরবী ও পারসী সাহিত্যের অধ্যাপনায় রাজস্বের অপব্যয় না করিয়া ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তিত করাই একান্ত কর্ত্তব্য। মেকলে এই মন্তব্যমধ্যে নিজের মুখেই বলিয়াছেন যে, তিনি এদেশের কোনও ভাষা জানিতেন না, কেবল সংস্কৃতাদি ভাষার কোন কোন পুস্তকের অনুবাদ মাত্র পড়িয়াছিলেন; তথাপি তিনি যে ইংরেজীর সহিত তুলনায় প্রাচ্য-ভাষাগুলিকে এত হীন মনে করিয়াছিলেন, তাহার মূলে তাঁহার স্বদেশপ্রীতিজাত সংস্কার গূঢ়ভাবে লুক্কায়িত ছিল। কিন্তু আমাদিগের তাহাতে ভালই হইয়াছে। মেকলে যদি এত জোরে ইংরেজী শিক্ষার সমর্থন না করিতেন, তবে আমরা জাতীয় জীবনের এই নব জাগরণ দেখিতে পাইতাম না।

(৩) ব্যবসায়গত সংস্কার (The Class Bias)

এখন তৃতীয় প্রকার সংস্কারের আলোচনা করা যাক্। পাঠকগণ নিজ নিজ অভিজ্ঞতা পর্য্যালোচনা করিলেই দেখিতে পাইবেন যে, কোনও

একটা ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকিলেই কালক্রমে তাহার একটা সংস্কার দাঁড়াইয়া যায়। শিক্ষক, চিকিৎসক, উকীল, ধর্ম্মপ্রচারক, ইঁহাদের প্রত্যেকের চক্ষু স্বতন্ত্র, মন স্বতন্ত্র, বিচারপ্রণালী স্বতন্ত্র, বিচারের ফল স্বতন্ত্র। পথে ঘাটে, ট্রামে বা রেলগাড়ীতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের আলাপ শুনিলেই এ কথার প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে। যাঁহারা দিবারাত্রি কেবল গ্রন্থে ডুবিয়া থাকেন, সংসারের কর্ম্মপ্রবাহের সহিত পরিচয় রাখেন না, বাস্তবতার সহিত তাঁহাদিগের সম্বন্ধ অনেকটা ছিন্ন হইয়া যায়; এই জন্যই একটা চলিত কথা আছে, যে বহুকাল শিক্ষকতা করিলে বুদ্ধি লোপ হয়। ব্যবহারজীবেরা নিরন্তর আইনের ইন্দ্রজাল লইয়া খেলা করেন; এজন্য তাঁহাদিগের ধর্ম্মনীতিতেও বিশেষত্ব দেখা যায়। একই কার্য্য ধর্ম্মপ্রচারকের দৃষ্টিতে গুরুতর পাপ, ব্যবসায়ীর বিবেচনায় নির্দ্দোষ। স্বদেশী আন্দোলনের সময় দেখা গিয়াছে, এক শ্রেণীর লোক মনে করিতেন, বৈদেশিক পণ্যজাত সর্ব্বথা বর্জ্জন না করিলে দেশের দারিদ্র্য ঘুচিবে না; আর একশ্রেণীর লোক সরলচিত্তে বিশ্বাস করিতেন যে, আমরা যদি কেবল দেশীয় শিল্পেরই আদর করি, তবে আবার প্রাচীন বর্ব্বরতার যুগ ফিরিয়া আসিবে! এমনই আরও কত দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। বস্তুতঃ ব্যবসায়গত সংস্কার সত্য-নির্ণয়ের প্রবল পরিপন্থী।

(৪) রাষ্ট্রীয় দলোদ্ভুত সংস্কার (The Political Bias)

বহুশতাব্দী এদেশে রাষ্ট্রীয় দলাদলি বলিয়া একটা জিনিসই ছিল না; আমরা রাষ্ট্রনীতিতে সবেমাত্র দীক্ষিত হইয়াছি। সুতরাং এই চতুর্থ শ্রেণীর সংস্কার সত্যাবধারণের শক্তিকে কেমন বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলে, তাহার দৃষ্টান্ত আহরণের জন্য আমাদিগকে বিদেশে যাইতে হইবে। আথেন্সের জনতন্ত্র (democracy) ভূতলে অক্ষয় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। রক্ষণশীল মিটফোর্ড (Mitford) ও অত্যুদার-নৈতিক গ্রোট (Grote) এই দুই প্রসিদ্ধ ইংরেজ ঐতিহাসিক গ্রীসের ইতিহাস লিখিয়াছেন। তাঁহারা আথীনীয় জনতন্ত্রের যে দুইখানি চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা পরস্পরের একেবারে বিপরীত। ঘটনা-পরম্পরা ও তাহার নায়ক এক; কিন্তু রাষ্ট্রীয় মত উভয়ের চক্ষুকে এমন স্বতন্ত্র করিয়া দিয়াছিল, যে একজন যাহা শতমুখে প্রশংসা করিয়াছেন, অন্য ব্যক্তি তাহাই নিন্দা করিবার ভাষা খুঁজিয়া পান নাই। ১৬৮৮ সনে ইংলণ্ডে যে বিপ্লব সংসাধিত হয়, রক্ষণশীল হিউম (Hume) ও উন্নতিশীল মেকলে আপন আপন ইতিহাসে তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। আলোক ও অন্ধকারে যে প্রভেদ, উভয়ের বর্ণনায় প্রভেদও প্রায় সেই-রূপ। ক্রম্‌ওয়েল (Cromwell) ইংলণ্ডের একজন শ্রেষ্ঠ বীর, রাজ-নীতিজ্ঞ ও অধিনায়ক; ক্লেরেণ্ডন (Clarendon) ও কার্লাইলের গ্রন্থ পাঠ করিয়া দেখুন; একজনের মতে ক্রম্‌ওয়েল ভণ্ড, মহাপাপিষ্ঠ, নর-রাক্ষস; অনন্তকাল নরকাগ্নিতে দগ্ধ হইলেও তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না; অন্যজন বলিতেছেন, ক্রম্‌ওয়েলের মত সরলচিত্ত, ধর্ম্মপ্রাণ, আদর্শ মহাপুরুষ ভূমণ্ডলে অল্পই আবির্ভূত হইয়াছেন। মহাত্মা গ্লাড-ষ্টোনের জীবদ্দশায় দেখিয়াছি, তাঁহার অনুবর্ত্তী উন্নতিশীলদল তাঁহাকে দেবতার ন্যায় পূজা করিতেন, আর রক্ষণশীল দলের মুখপাত্র টাইমস্ (Times) পত্রিকা তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলিতেও ছাড়িতেন না। এদেশে রাজনৈতিক জীবনের উন্মেষ দেখা দিয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রীয় দলোদ্ভুত সংস্কারের বিচিত্র ফলও একটু একটু করিয়া প্রকাশ পাইতেছে। ভারত-বর্ষীয়েরা লর্ড মর্লীর কৃপায় যেটুকু রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে বিভিন্ন দলের লোকেরা একমত হইতে পারেন নাই। ভারত-

সচিব মণ্টেগু মহোদয় এই অধিকার আরও প্রসারিত করিয়া দিবেন, এই আশার বাণী বলিয়া এদেশে আগমন করিয়াছেন। তাঁহার নিকটে আমরা কি চাহিব, না চাহিব, সে বিষয়েও বিস্তর মতভেদ দেখা যাইতেছে।

(৫) শাস্ত্রগত সংস্কার (The Theological Bias)

পরিশেষে আমরা শাস্ত্রগত সংস্কারের প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হইতেছি। সত্যানুসন্ধান ও সত্যালিঙ্গনের এমন নিদারুণ শত্রু আর দ্বিতীয় নাই। ইহা বিজ্ঞানের আবিষ্কারে প্রাণপণে বাধা দিয়াছে, প্রেমধর্ম্ম পদদলিত করিয়াছে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিষম কলহের সৃষ্টি করিয়া মেদিনীকে নররক্তে প্লাবিত করিয়া ফেলিয়াছে। হিন্দু ও মুসলমান, মুসলমান ও খৃষ্টান, খৃষ্টান ও ইহুদী, শাক্ত ও বৈষ্ণব, সিয়া ও সুন্নি, প্রটেষ্টাণ্ট ও রোমান ক্যাথলিক স্বীয় স্বীয় ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াও পরস্পরকে প্রেমে আলিঙ্গন করিতে পারে, কিন্তু শাস্ত্রগত সংস্কার বিভিন্ন ধর্ম্মমণ্ডলীর মধ্যে এক একটী মহা প্রাচীর গাঁথিয়া রাখিয়াছে। ধর্ম্মের নামে মানুষ কি কুকর্ম্মই না করিয়াছে ? দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে রোমক কবি লুক্রেশিয়াস (Lucretius) "পদার্থতত্ত্ব" (De Rerum Nature) নামক কাব্যে ক্ষোভ করিয়া বলিয়াছিলেন,

Tantum religio potuit suadere malorum.

"ধর্ম্ম মানুষকে এতই পাপকার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিতে পারে।" সে কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছে। সভ্যজাতি সমূহের ইতিহাস পাঠ করিয়া দেখুন, শাস্ত্রের দোহাই দিয়া এক একটি জাতি ধরণীতে কি বিভৎস পৈশাচিক লীলার অভিনয় করিয়াছে। স্পেনে বৎসরের পর বৎসর অনুসন্ধান সমিতির (Inquisition) বিপুল হত্যাকাণ্ড ; ফ্রান্সে আলবিজেনসিস (Albigensis) নামে অভিহিত সংস্কারকদলের উচ্ছেদের জন্য নির্ম্মম যুদ্ধ এবং ১৫৭২ সনে সেণ্ট বার্থলমিয়ুর উৎসব দিনে (২৪এ আগষ্ট) পারিসে ও অন্যান্য নগরে সহস্র সহস্র প্রটেষ্টাণ্ট নিপাত ; ইংলণ্ডে রাণী মেরীর আদেশে স্মিথফিল্ড নামক স্থানে দলে-দলে প্রটেষ্টাণ্টদিগকে নরমেধ যজ্ঞে আহুতি দিয়া রোমক ক্যাথলিকদিগের দ্বারা খাণ্ডবদাহের পুনরাভিনয়, ও ইহার পরেই এলিজাবেথের রাজত্বকাল হইতে দুই শতাব্দী ধরিয়া প্রটেষ্টাণ্ট রাজশক্তি দ্বারা রোমক ক্যাথলিকদিগের নির্দ্দয় নিপীড়ন ; হলাণ্ডে ওলন্দাজগণের প্রতি স্পানিয়ার্ডদিগের লোমহর্ষণ অত্যাচার ; আমেরিকার ধর্ম্মোন্মত্ত ইয়ুরোপীয়গণের সভ্য ও অসভ্য আদিম অধিবাসীদিগের প্রতি রাক্ষসোচিত আচরণ, এবং আত্মকলহে লিপ্ত হইয়া পরস্পরের সংহারের জন্য বিরাম-বিহীন সংগ্রাম ; আর্ম্মেনিয়ায় তুর্কীদিগের দ্বারা অযুত খ্রীষ্টীয় নরনারী বালকবালিকা বধ ; পরিশেষে এই ভারতবর্ষেই পরাজিত বৌদ্ধগণের প্রতি মরণান্ত দণ্ড-প্রয়োগ—আর কত উল্লেখ করিব ? মহাভারতে বর্ণিত আছে, প্রচণ্ড ক্রোধপরবশ ভীম দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা ও অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য দুঃশাসনের রক্ত পান করিয়াছিলেন। মার্কিন ঐতিহাসিক (Motley) মট্‌লী "ওলন্দাজ জনতন্ত্রের অভ্যুত্থান" (The Rise of the Dutch Republic) নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, ষোড়শ শতাব্দীতে হলাণ্ডের প্রায় শতবর্ষব্যাপী স্বাধীনতা সময়ের মধ্যে দেশের প্রভু রোমান কাথলিক স্পানিয়ার্ড ও বিজিত প্রটেষ্টাণ্ট ওলন্দাজদিগের মধ্যে এমন ভীষণ বিদ্বেষ সঞ্জাত হইয়াছিল যে, একদা কোনও যুদ্ধে এক ওলন্দাজ একজন স্পানিয়ার্ডকে রণক্ষেত্রে আহত ও ভূপতিত দেখিয়াই উন্মত্তপ্রায় হইয়া তাহার হৃৎপিণ্ড ছিঁড়িয়া বাহির করিয়া চিবাইয়া খাইয়াছিল। রোমানেরা যখন দেবোপাসক ছিল, তখন তাহারা ক্রীড়াভূমিতে

বিশালবপু বলিষ্ঠ বর্ব্বরগণকে পরস্পরের হত্যাতে ও সিংহ ব্যাঘ্রাদি হিংস্র শ্বাপদের সহিত যুদ্ধে নিয়োজিত করিত; এই অমানুষিক রক্তারক্তির ব্যাপার দেখিয়া তাহাদিগের উল্লাসের সীমা থাকিত না। কিন্তু রোম খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া যখন খ্রীষ্টীয় জগতের পীঠস্থান হইয়া উঠিল, তখনই কি তাহার রক্তপিপাসা শান্ত হইল? শ্রুতকীর্ত্তি টেনীসন কি বলিতেছেন, শুনুন—

From the golden alms of Blessing man had coin'd himself a curse;
Rome of Caesar, Rome of Peter, which was cruller? which was worse?

"ঈশ্বর বরস্বরূপ যে সর্ব্বোত্তম ধন মানবকে দান করিয়াছিলেন, সে তাহাই অভিশাপে পরিণত করিয়াছে; দেবোপাসক সীজারের রোম ও খ্রীষ্টশিষ্য পিটারের রোম, এই দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টী নিষ্ঠুরতর, কোন্‌টী অধমতর?"

কেহ কেহ বলিবেন, এগুলি ধর্ম্মান্ধতার (bigotry) ফল—ধর্ম্মের ব্যভিচারের উদাহরণ। শাস্ত্রগত সংস্কার ও ধর্ম্মান্ধতা এক জিনিস নহে। এ কথার উত্তর এই যে, উভয়ে পার্থক্য বড়ই অল্প, এত অল্প যে একটী সহজেই অন্যটীতে পরিণত হইয়া থাকে। যদি মানিয়া লওয়া যায় যে, প্রথমটী দ্বিতীয়টীর মত অত উগ্র ও নিষ্ঠুর নহে, তাহা হইলে এমন দৃষ্টান্ত দেওয়া আবশ্যক, যাহা শাস্ত্রগত সংস্কারের কুফল স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিবে। আমরা এইরূপ কয়েকটী দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিতেছি।

স্যার উইলিয়াম হাণ্টার 'ভারতীয় মুসলমান' নামক পুস্তকের একস্থলে লিখিয়াছেন, একজন ওয়াহাবী এক স্থূলদেহ মাড়োয়ারীকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিয়াছিল, "বাঃ! নরকাগ্নিতে পুড়িবার কি প্রকাণ্ড কাঠ-খানা রে!" সকলে লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন, একজন মানুষকে দেখিয়া এই

ব্যক্তির আর কোন কথাই মনে হইল না; লোকটী কাফের, নিশ্চয়ই নরকের আগুনে পুড়িয়া যন্ত্রণা পাইবে, ইহা ছাড়া সে আর কিছুই ভাবিতে পারিল না। এ যে ঈশ্বরের সন্তান, ইহারও যে অনেক সদ্‌গুণ থাকিতে পারে, এসকল চিন্তা তাহার মনে স্থান পাইল না। শাস্ত্রগত সংস্কার হৃদয়ের কোমল ভাবগুলিকে এমনই পিষিয়া ফেলে। ইহা সত্যের এমন বিষম শত্রু, যে যাহারা ইহার বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, তাহারা বিশ্বাসই করিতে পারে না, যে তাহাদিগের দলের বাহিরেও আবার সত্য, প্রেম, পবিত্রতা প্রভৃতি ধর্ম্মের লক্ষণগুলি কাহারও জীবনে ফুটিয়া উঠিতে পারে। ইংরেজ ধর্ম্মযাজক ও উপন্যাস লেখক কিংস্লী (Kingsley) হাইপেশিয়া (Hypatia) নামে একখানি উপন্যাসে ইহার একটী চমৎকার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। খৃষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে মিসরের আলেকজাণ্ড্রিয়া নগরে এক পরমাসুন্দরী গুণবতী বিদুষী গ্রীক রমণী বাস করিতেন, তাঁহার নাম হাইপেশিয়া; তিনি একটি বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিতেন; দেশদেশান্তরে ঐ বিদ্যালয়ের খ্যাতি ব্যাপ্ত হইয়াছিল. শত শত যুবক ও প্রৌঢ় তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য উপস্থিত হইত। সে সময়ে ঐ নগরে গোঁড়া খৃষ্টীয় সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের বড় প্রভাব ছিল, তাহারা এই দেবীপ্রতিমা নারীকে চক্ষুর বিষ জ্ঞান করিত। এক দিন এক সন্ন্যাসী ও অপর এক ব্যক্তির মধ্যে ইহারই বিষয়ে কথোপকথন হইতেছিল। সন্ন্যাসী ইঙ্গিত করিল, যে হাইপেশিয়া কুচরিত্রা; ইহাতে লোকটি বিস্ময়প্রকাশ করিল দেখিয়া সন্ন্যাসী বলিতে লাগিল—"যে খৃষ্টান্ নয়, তাহার চরিত্র কখনই নির্ম্মল হইতে পারে না। দেবো-পাসকেরাও যদি খৃষ্টানদিগের অপেক্ষা পবিত্র-চরিত্র হয়, তবে আর বাইবেলের গৌরব কোথায় থাকে? খৃষ্টান হইলেই পুণ্যাত্মা এবং দেবোপাসক হইলেই পাপিষ্ঠ হইবে—ইহাই নিয়ম হওয়া উচিত—অতএব

ইহাই নিয়ম।" (How would the Gospel be glorified if heathens were holier than Christians? It ought to be so, therefore it is so). এই রমণীরত্নকে সংস্কারান্ধ সন্ন্যাসীরা লোষ্ট্রাঘাতে বধ করিয়া টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া বিচ্ছিন্ন ভগ্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি আগুনে পুড়াইয়া ভস্মসাৎ করিয়াছিল।

শাস্ত্রগত সংস্কার যেমন হৃদয়কে বিকৃত করে, তেমনি ইহা জ্ঞান-বিস্তারেও যুগে যুগে বাধা দিয়া আসিতেছে। ধর্ম্মের সহিত বিজ্ঞানের বিরোধ নাই, বিংশ শতাব্দীতে ইহা অনেকেই স্বীকার করিতেছেন, কিন্তু অল্পদিন পূর্ব্বেও অবস্থা অন্যরূপ ছিল। যখনই কোনও নবতত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, অমনি ধর্ম্মের নামে গোঁড়া খ্রীষ্টীয়ানেরা একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে এবং আবিষ্কর্ত্তাদিগকে কারাগারে নিঃক্ষেপ বা অন্য-প্রকারে নির্যাতন করিয়া নূতন সত্যটীকে মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছে। পাঠকগণ ড্রেপার (Draper) বিরচিত "ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের সংঘর্ষ" (The Conflict between Science and Religion) নামীয় পুস্তকে ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইবেন। আমরা উহা ও অন্যান্য গ্রন্থ হইতে কয়েকটী দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতেছি। বহুপ্রাচীন কালের কথা ছাড়িয়া দিয়া পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ যাম হইতে আরম্ভ করা যাক্। প্রথমেই কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্ক্রিয়ার কাহিনী। এই বিচিত্র আখ্যান সবিস্তার বর্ণনা করিবার আবশ্যক নাই। সকলেই জানেন, যে ইয়ুরোপ হইতে অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে ও অনায়াসে ভারতবর্ষে আগমন করা যায় কিনা, এই ভাবনার ফলেই কলম্বস অপ্রত্যাশিতরূপে আমেরিকা মহাদেশটায় যাইয়া উপনীত হইয়াছিলেন। তাঁহার মাথায় এই একটা খেয়াল ঢুকিয়াছিল, যে আটলান্টিক মহাসাগরের পরপারে নিশ্চয়ই একটা দেশ আছে—ইয়ুরোপ হইতে যাত্রা করিয়া ক্রমাগত পশ্চিম

মুখে জাহাজ চালাইলে ঐ দেশ পাওয়া যাইবে, উহা হয় ভারতবর্ষ, না হয় এসিয়ার আর কোনও ভূভাগ। এই কল্পনাটা বাস্তব কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি যখন স্পেনের রাজা ফার্ডিনাণ্ড ও রাণী ইজাবেলার নিকটে তিনখানি জাহাজ প্রার্থনা করিলেন, তখন আর সকলের অপেক্ষা ধর্ম্মযাজকেরাই তাঁহার বিষম শত্রু হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহারা বাইবেল খুলিয়া বলিতে লাগিলেন, "এই দেখ, অভ্রান্ত শাস্ত্র কি বলিতেছে। রাজর্ষি দায়ুদ বলিতেছেন, 'আকাশ তাঁবুর মত ধরণীর উপরে অবস্থান করিতেছে।' অতএব, পৃথিবী চাপটা; যদি তাই হয়, তবে আটলান্টিক মহাসাগরের একটা পর পার আছে, এ কথা যে বলে সে বাতুল। আর মহাজ্ঞানী ধর্ম্মপিতা লাক্টান্টিয়াস কি লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাও পাঠ করিয়া দেখ। তিনি বলিতেছেন, পৃথিবী চ্যাপটা, তাহার অপর পৃষ্ঠে মনুষ্য বা জীবজন্তুর বসতি নাই। কেমন করিয়া থাকিবে? মানুষগুলি সেখানে বাদুড়ের মত ঝুলিয়া আছে না কি? সে দেশে কি বৃষ্টিধারা ঊর্দ্ধদিকে উৎপতিত হয় এবং শিশিরকণাগুলি আকাশপানে লাফাইয়া উঠে?" এই ধর্ম্মধ্বজীদিগের অকাট্য যুক্তিতে প্রতিপন্ন হইল, যে আটলান্টিকের ওপারে স্থল নাই এবং কলম্বস পাগল। পাগল বলিয়া তাঁহাকে হাতে পায়ে শিকল দিয়া কারাগারে রুদ্ধ করিয়া রাখা হইল। শুনা যায় যে, শৃঙ্খলে কলম্বস আবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহার বংশধরেরা গৌরবমাল্যরূপে আজিও তাহা সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। কিছুদিন পরে কলম্বস রাজানুগ্রহে কারামুক্ত হইলেন। তার পর, এই উন্মাদের পুরুষকারের বলে অপৌরুষেয় বেদের অটল যুক্তি-পরম্পরা কিরূপে উড়িয়া গেল, তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না।

ইটালীর জ্যোতির্বিৎ গালিলেওকে (Galileo) একটি সাধারণ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব প্রচার করিয়া কি নিগ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছিল,

বিদ্যালয়ের বালকেরাও তাহা জানে। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে আলেকজাণ্ড্রিয়াবাসী গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিৎ টলেমী (Ptolemy) এই মত প্রচার করেন যে, পৃথিবী ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র, এবং সূর্য্য প্রভৃতি জ্যোতিষ্কমণ্ডলী তাহাকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। খৃষ্টীয় জগৎ এই মতটি শুধু অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল, তা' নয়; অধিকন্তু ইহাকে ধর্ম্ম-বিশ্বাসের একটি অঙ্গ করিয়া লইয়াছিল। অতএব, গালিলেও যখন প্রচার করিলেন যে পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে, তখন দেশময় একটা মহা কলরব উত্থিত হইল। যে কথা বাইবেলে নাই, এমন কথা যাহার রসনা হইতে নির্গত হয়, সে পাষণ্ড, সে পাপিষ্ঠ—অবিলম্বে তাহাকে কঠোর দণ্ড দেওয়া কর্ত্তব্য, ধর্ম্মযাজকেরা এই প্রকার বলিয়া পোপকে উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন। পোপ গালিলেওকে "অনুসন্ধান সমিতির" হস্তে সমর্পণ করিলেন। ঐ সমিতি তাঁহাকে রোমে আনয়ন করিয়া যথাবিধি বিচার করিলেন এবং বিচারের ফলে তাঁহার প্রতি এই দণ্ড বিহিত হইল। প্রথমতঃ বিচারালয়ে বহুজনের সমক্ষে নতজানু হইয়া তাঁহাকে বলিতে হইল, ধরিত্রী নিশ্চলা, সূর্য্য তাহাকে প্রদক্ষিণ করিতেছে; তিনি যাহা প্রচার করিতেছিলেন তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা। কথিত আছে, চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে এই কথা বলিয়া দণ্ডায়মান হইয়াও গালিলেও এক বন্ধুর কাণে কাণে বলিয়াছিলেন "কিন্তু পৃথিবী যে এখনও ঘুরিতেছে।" গালিলেও মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে পারেন নাই; প্রাণের মায়ায় তাঁহাকে সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য বলিয়া ঘোষণা করিতে হইল। কিন্তু এখানেই তাঁহার দুর্ভোগের পরিসমাপ্তি হইল না—তিনি দীর্ঘকাল আপনার গৃহে বন্দী হইয়া রহিলেন।

গালিলেওর জীবনের আর একটি ঘটনা একটা প্রহসন-বিশেষ।

ইনি দূরবীক্ষণের আবিষ্কর্তা; উহার সাহায্যে তিনি বৃহস্পতির চারিটি চন্দ্র আবিষ্কার করেন। এক ধর্ম্মাচার্য্য তাঁহার বন্ধু ছিলেন; তিনি এই আবিষ্কারের বার্ত্তা শুনিয়া বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, যে গ্যালিলেওর মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে, না হইলে তিনি এমন সৃষ্টিছাড়া কথা বলিবেন কেন? বাইবেলের কোন স্থলে তো বৃহস্পতির উপগ্রহের উল্লেখ দেখা যায় না। একদিন রাত্রিকালে গালিলেও তাঁহার বন্ধুকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, এবং দূরবীক্ষণ যন্ত্রটি বৃহস্পতি গ্রহের দিকে নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি এখন এই যন্ত্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দেখ, বৃহস্পতির চতুষ্পার্শ্বে চারিটি চন্দ্র সুস্পষ্ট দেখিতে পাইবে।" বন্ধু উত্তর করিলেন, "আমি কখনই ঐ যন্ত্রটা দেখিব না—তুমি উহার মধ্যে যাহা দেখিতেছ, তাহা শয়তানের খেলা।" ধর্ম্মাচার্য্য কিছুতেই দূরবীক্ষণটিতে দৃষ্টি স্থাপন করিলেন না—না করিয়াই রটনা করিতে লাগিলেন, "গালিলেও পাগল হইয়াছে—বৃহস্পতির আবার চন্দ্র! এমন আজগুবি খোস্‌গল্প যে করে, সে পাগল নয় তো কি?"

ইয়ুরোপে প্রাসিয়ার জ্যোতির্বিৎ কোপার্নিকাস (Copernicus) সর্ব্বপ্রথমে এই আবিষ্কার করেন, "সূর্য সৌরজগতের কেন্দ্র, এবং পৃথিবী প্রভৃতি তাহার গ্রহ।" টলেমীর মত খণ্ডন ও এই তত্ত্ব প্রতিপাদন করিয়া তিনি একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন; কিন্তু তিনি নিজে ধর্ম্মযাজক ছিলেন এবং ধর্ম্মযাজকদিগকে তিনি খুব ভাল করিয়াই চিনিতেন। এজন্য তিনি জীবদ্দশায় ঐ পুস্তক প্রকাশ করিতে সাহস করেন নাই। তিনি যখন বুঝিতে পারিলেন, এইবার যে জরাজীর্ণ হইয়া শয্যায় পড়িলেন, উহা হইতে আর উঠিবেন না, তখন গ্রন্থখানির মুদ্রাঙ্কন আরম্ভ হইল, এবং শেষ ফর্ম্মার প্রুফ দেখিয়া দিয়া উহা চুম্বন করিয়াই তিনি ইহলোক হইতে প্রস্থান করিলেন।

অত পুরাতন কাহিনীতে কাজ কি? এই সেদিন, ১৮৫৯ সনে, সভ্যজগতের শিরোভূষণ শ্বেতদ্বীপে কি ঘটিয়াছিল, তাহাই একবার দেখা যাক্ না। ঐ সনে প্রথিতযশাঃ বৈজ্ঞানিক ডারুইন, অভিব্যক্তিবাদের আদি বেদ "The Origin of Species" শীর্ষক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। উহা মানবের চিন্তারাজ্যে এক মহা বিপ্লব আনয়ন করিয়াছে। ১৯০৯ সনে ডারুইনের শত বার্ষিক ও ঐ গ্রন্থের পঞ্চাশৎ বার্ষিক জন্মোৎসব উপলক্ষে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় বড় বড় পণ্ডিতদিগের কতকগুলি প্রবন্ধ একত্র করিয়া যে পুস্তকখানি প্রচার করেন, তাহার সূচিপত্র পাঠ করিলেই দেখা যাইবে যে, অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, কাব্য, সাহিত্য—কতদিকে ডারুইনের প্রভাত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ডারুইনের গ্রন্থ যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন ইংলণ্ডে একটা হুলস্থুল পড়িয়া যায়। অভিব্যক্তিবাদ সত্য হইলে বাইবেল আর অভ্রান্ত শাস্ত্র বলিয়া টিঁকিয়া থাকিতে পারে না; বাইবেলেই যদি ভুলভ্রান্তি বাহির হইল, তবে ধর্ম্ম কোন্ ভিত্তি আশ্রয় করিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে? এই আশঙ্কায় দিশাহারা হইয়া পুরোহিত-সম্প্রদায় ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। ১৮৬০ সনে অক্সফোর্ডে ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশন (British Association) নামক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সভায় অধিবেশন হয়। পূর্ব্বেই রাষ্ট্র হইয়াছিল, উহাতে ডারুইনের নবপ্রচারিত অভিব্যক্তিবাদের আলোচনা হইবে; সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী ও ধর্ম্মাচার্য্য বিশপ উইলবারফোর্স (Wilberforce) উহার অযৌক্তিকতা দেখাইবেন, এবং অধ্যাপক হাক্স্লী—তিনি তখনও তত খ্যাতি লাভ করেন নাই—উহার সমর্থন করিবেন। যে দিন আলোচনার জন্য নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, সেদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ের বহু পূর্ব্বেই বিশাল শেল্ডোনিয়ান থিয়েটার (Sheldonean Theatre) নরনারীতে পূর্ণ হইয়া গেল; প্রাচীন ও

নবীনের এই মহা সংঘর্ষের ফল কি হইবে, তাহারই প্রতীক্ষায় নীরব নিঃস্পন্দ হইয়া সেই বিপুল জনমণ্ডলী বসিয়া রহিল। সভার অধিবেশন আরম্ভ হইলে প্রথমেই বিশপ্ উইলবারফোর্স অভিব্যক্তিবাদের অসারতা প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার ভাষা সুললিত, বাক্চাতুর্য্য অনন্যসুলভ, রসিকতা জনমনোমোহন, কিন্তু বক্তৃতার কোথাও যুক্তি নাই, প্রমাণ নাই, প্রতিপক্ষের সিদ্ধান্ত নিরসনের চেষ্টা নাই; আছে কেবল ঠাট্টা, বিদ্রূপ, ব্যঙ্গোক্তি, শ্লেষ, হাস্য পরিহাস। এই অপূর্ব প্রণালীতে অভিব্যক্তিবাদ একেবারে উড়াইয়া দিয়া তিনি এই বলিয়া বক্তৃতা শেষ করিলেন—"ডারুইন বলিতেছেন, মানুষ বানরের বংশধর; অধ্যাপক হাক্সলী এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি কোন্ কুলে বানরের সন্তান? পিতৃকুলে না মাতৃকুলে?" বিশপ মহাশয় উপবেশন করিলে শ্রোতৃবর্গের মধ্যে অনেকেই ভাবিল, হাক্স্লী এমন জব্দ হইয়াছেন, যে তাঁহার মুখ দিয়া আর কথা ফুটিবে না, অভিব্যক্তিবাদটা রসাতলে ডুবিল। হাক্স্লী ধীরে ধীরে মঞ্চের উপরে দাঁড়াইলেন; স্থির গম্ভীরভাবে যুক্তির পর যুক্তি উপস্থিত করিয়া অভিব্যক্তিবাদ সমর্থন করিতে লাগিলেন; সংযত ভাষায় বিশপের শূন্যগর্ভ বক্তৃতার অর্থহীন বাগাড়ম্বর ধূলিসাৎ করিয়া দিলেন; এবং পরিশেষে তাঁহার প্রশ্নটির এই উত্তর দিয়া আসন গ্রহণ করিলেন—"আমি জানি না, আমার পিতৃকুল কি মাতৃকুল বানরের বংশ ছিল; তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না; কেন না, এই অভদ্র বিশপ আমার পূর্ব্বপুরুষ হইলে আমি যেমন লজ্জাবোধ করিতাম, আমি যদি বানরের সন্তান হই, তবে কখনই তেমন লজ্জা বোধ করিব না।" এই বাদানুবাদের পরে অভিব্যক্তিবাদ বহু লোকের চিত্তে স্থান পাইল। হাক্সলী ও স্পেন্সার ডারুইনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই তিন

মনস্বী ব্যক্তির আমরণ জ্ঞান-সাধনার ফলে এই মতটি এখন সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে, বর্ত্তমান সময়ে যে ইহা অগ্রাহ্য করিবে, সে জনসমাজে বর্ব্বর বলিয়া উপহাসাস্পদ হইবে।

এই ভারতবর্ষেও শাস্ত্রগত সংস্কার জ্ঞানবিস্তারে বাধা না দিয়াছে, তা' নয়। ইংরেজী শিক্ষার প্রথম যুগে অনেকেই ইহার প্রতি বিমুখ ছিলেন। বিশেষতঃ মুসলমান সমাজে দীর্ঘকাল ধরিয়া এই একটা সমস্যা অমীমাংসিত ছিল যে, ইংরেজী বিদ্যালয়ে সন্তানদিগকে প্রেরণ করা ধর্ম্ম'-সঙ্গত কি না। গোঁড়া মুসলমানেরা আশঙ্কা করিতেন, ইংরেজী শিক্ষা করিলে যুবকেরা স্বধর্ম্মে নিষ্ঠা হারাইয়া ফেলিবে। এজন্য উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ যাম পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য শিক্ষা মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে খুব অল্পই বিস্তার লাভ করিয়াছিল। ইহার কুফল দেখিয়া স্যার সৈয়দ আহমদ প্রভৃতি নেতৃগণ আলিগড় কলেজ স্থাপন করেন; তদবধি পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি মুসলমানদিগের অনুরাগ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া আসিতেছে। সম্প্রতি তাঁহারা উহার প্রয়োজন এত গভীরভাবে অনুভব করিতেছেন যে আলিগড় কলেজটীকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করিবার আয়োজন চলিতেছে ও মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দিন নিকটবর্ত্তী বলিয়া বোধ হইতেছে। এক কালে শাস্ত্রগত সংস্কার যাহা বিষের মত পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিত, সংস্কার-মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহাই এখন পরম আদরের বস্তু হইয়া উঠিয়াছে।

সংস্কার-পঙ্কের আলোচনা আমরা এইখানে সমাপ্ত করিলাম। আমরা এতক্ষণ যাহা বলিলাম, তাহার মর্ম্মকথা এই যে, চিত্ত যত সংস্কার-মুক্ত হইবে, ততই তাহা সত্যগ্রহণের পক্ষে অনুকূল হইবে। এজন্য শিক্ষা ও সাধনা চাই। শিক্ষা বলিতে গ্রন্থপাঠ, গুরুপদেশ সাধুসঙ্গ, সদালোচনা, সকলই বুঝিতে হইবে। সত্য জানা ও সত্য আলিঙ্গন করা—এই দুইটী

সম্বন্ধেই শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে পার্থক্য আছে, ইহা নিত্যই দেখা যাইতেছে। পুস্তক পড়াটার প্রতি অনেকেই অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া থাকেন; কিন্তু উচ্চাঙ্গের সাহিত্য পড়িলে যে চিত্ত উদার, দৃষ্টি উন্নত ও হৃদয় সুকোমল হয়, তাহাও কি কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে? অনু-শীলন বা cultureএর ইহাই উদ্দেশ্য। আজকালকার দিনে বিশ্বমানবের জ্ঞানানুশীলনের সহিত যাহার পরিচয় নাই, সে শিক্ষিত বলিয়াই গণ্য নয়। বিশেষতঃ আমরা দেখিতে পাই যে, এক এক জন বৈজ্ঞানিকের মধ্যে যে ঐকান্তিক সত্যনিষ্ঠা বিদ্যমান, অনেক ধর্ম্মাচার্য্যের পক্ষে তাহা দুর্লভ। সত্যানুরাগ জাগ্রত করিতে হইলে বিবিধ বিদ্যার চর্চ্চা একান্ত আবশ্যক।

সত্যের কষ্টিপাথর

এখন প্রশ্ন উঠিতেছে যে, সত্যনির্ণয়ের পন্থা কি? সংস্কারের বন্ধন মোচন হইলেও সত্যের একটা কষ্টিপাথর চাই। আমার হৃদয় যখন সত্য গ্রহণে উন্মুখ, তখনও আমাকে কোন্‌টী গ্রহণীয়, কোন্‌টী বর্জ্জনীয়, তাহা পরখ করিয়া লইতে হইবে। সেই পরশ পাথর কোথায় পাইব?

প্রাচীনকাল হইতে এই বিশ্বাস চলিয়া আসিতেছে যে, সত্যের কষ্টি-পাথর দুইটী—প্রথম অভ্রান্ত গুরু; দ্বিতীয় অভ্রান্ত শাস্ত্র। ইয়ুরোপে মার্টিন লুথার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম সংস্কারের পূর্ব্বে খৃষ্টীয় জগৎ রোমের পোপকে অভ্রান্ত গুরু বলিয়া স্বীকার করিত; প্রটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায়গুলি তাঁহার শাসন মান্য করে না; তাহাদিগের নিকটে তাঁহার অভ্রান্ততার গৌরব নাই; কিন্তু রোমান কাথলিককেরা অদ্যাপি তাঁহাকে ভ্রান্তির অতীত বলিয়া বিশ্বাস করে। ভাবিলে আশ্চর্য্য বোধ হয় যে, জ্ঞানালোকিত উনবিংশ শতাব্দীতেও কার্ডিনাল নিউম্যানের মত তীক্ষ্ণধী সুপণ্ডিত

ব্যক্তি পোপকে অভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য আত্মজীবনীতে কতই যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। মুসলমানেরা মহম্মদকে শেষ পয়গম্বর বলিয়া মান্য করে, কিন্তু তিনি মানুষ ছিলেন, সুতরাং তাহাদিগের মতে তিনিও ভ্রম প্রমাদের অতীত ছিলেন না। তাহারা এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহাকেও ভ্রান্তিশূন্য বলিয়া স্বীকার করে না। হিন্দু ধর্ম্মে পোপের ন্যায় কোনও একটী নির্দ্দিষ্ট অভ্রান্ত গুরু নাই; কিন্তু বিভিন্ন সম্প্রদায়ে গুরুকরণের প্রথা আছে; শিষ্য সর্ব্ববিষয়ে গুরুর অনুগত হইয়া চলিবে, ইহাই বিধি; সুতরাং মুখে অভ্রান্ত বলিয়া না মানিলেও কাজে তাহাই দাঁড়াইয়া থাকে। এই প্রসঙ্গে যোগবাশিষ্ঠের একটি উক্তি উল্লেখযোগ্য। বশিষ্ঠ রামচন্দ্রকে বলিতেছেন—

যো যো যেন গুণেনেহ পুরুষঃ প্রবিরাজতে।
শিষ্যতে তং তমেবাশু তস্মাদ্বুদ্ধিং বিবর্দ্ধয়েৎ॥

মুমুক্ষুপ্রকরণ।২০।২

(মহাপুরুষের যে সমুদায় লক্ষণ আছে, সেগুলি যদি একেবারে কোন পুরুষে না থাকে) তবে যে পুরুষ যে গুণে লোকসমাজে বিখ্যাত হইয়াছেন, সেই পুরুষের সেই গুণটী শিক্ষা করিয়া তাহার সাহায্যে স্বীয়বুদ্ধি বর্দ্ধিত করিবে। এই শ্লোক পড়িয়া মনে হয়, প্রাচীন-কালেও এদেশে সকলে অভ্রান্ত গুরুবাদ মানিতেন না। এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে বহু লোকেই অভ্রান্ত গুরুবাদ ত্যাগ করিয়াছে। সুতরাং ইহা সত্যের কষ্টিপাথর বা test বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না। তৎপরে অভ্রান্ত শাস্ত্রের কথা। হিন্দুর নিকটে বেদ, মুসলমানের নিকটে কোরাণ, ইহুদীর নিকটে পুরাতন বাইবেল এবং খ্রীষ্টীয়ানের নিকটে পুরাতন ও নূতন বাইবেল অভ্রান্ত; প্রটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায়গুলি পোপকে অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করে না বটে,

কিন্তু তাহাদিগের বিবেচনায় বাইবেলের প্রত্যেক কথাই সত্য; দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ধর্ম্ম, যাহা বল, উহাতে কোন বিষয়েই কোনও ভ্রম-প্রমাদ নাই। এই সেদিন, ১৮৮০ হইতে ১৮৯০ সনের মধ্যে, মনস্বী গ্লাডষ্টোন ও অধ্যাপক হাক্সলীর মধ্যে মহা তর্কযুদ্ধ হইয়া গেল। কেন? এইজন্য যে, হাক্সলীর মতে বাইবেলের সৃষ্টিপ্রকরণে ও অন্যান্য বর্ণনায় অনেক বৈজ্ঞানিক ভ্রম আছে; গ্লাডষ্টোন প্রমাণ করিতে চাহিলেন, যে বর্ণনাগুলি সুষ্ঠুরূপে ব্যাখ্যা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, বাইবেল শাস্ত্র, ভূতত্ত্ব, জ্যোতিষ প্রভৃতি কোনটাতেই ভ্রমে পতিত হয় নাই। বৈজ্ঞানিকগণের বিবেচনায় গ্লাডষ্টোন হাক্সলীর হাতে নাকাল হইয়া-ছিলেন। অতএব মেধাবী লোকও যে বাইবেলকে অভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহাতেই বুঝা যাইতেছে, বহু সংখ্যক লোক শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াও অভ্রান্ত শাস্ত্রের নিগড়ে আবদ্ধ রহিয়াছে। হার্ব্বার্ট স্পেন্সার একস্থলে খুব একটা খাঁটি কথা বলিয়াছেন; কথাটা এই—কে কি বিশ্বাস করে, না করে, তাহা তাহার মস্তিষ্কের সংগঠনের (confirmation) উপরে নির্ভর করে। সে যাহা হউক, বর্ত্তমান যুগের জ্ঞানধারার সহিত যাঁহার পরিচয় আছে, তিনি জানেন যে, অভ্রান্ত শাস্ত্রবাদের দিনও ফুরাইয়া আসিয়াছে—উহা এখন শিক্ষিত সমাজে বহুজনের চিত্তেই স্থান পাইতেছে না। সুতরাং এটিও সত্যের কষ্টিপাথর নহে। এক কথায় বলা যাইতে পারে, বিচার ভিন্ন সত্য জানিবার কোনও সহজ উপায় নাই।

এ দেশের নানা শাস্ত্রে বিচারের গুণ ও অবশ্যকর্ত্তব্যতা বর্ণিত হইয়াছে। যোগবাশিষ্ঠকার বলিতেছেন,

বিচারাত্তীক্ষ্ণতামেতা ধীঃ পশ্যতি পরং পদম্।
দীর্ঘসংসাররোগস্য বিচারো হি মহৌষধম্॥ মুঃ প্রঃ।১৪।২

বুদ্ধি বিচার-বলে তীক্ষ্ণতা লাভ করিয়া পরম পদ দর্শন করিতে সমর্থ হয় ; বিচারই সংসাররূপ উৎকট রোগের মহৌষধ।

বিবেকান্ধো হি প্রাত্যন্ধঃ শোচ্যঃ সর্ব্বস্য দুর্মতিঃ।৪১

যাহার বিবেক-নয়ন নাই। সেই দুর্মতিই অন্ধ ও সকলের শোচনীয়।

ভাবাভাবগ্রহোৎসর্গদৃশামিহ হি রাঘব।

ন বিচারাদৃতে তত্ত্বং জ্ঞায়তে সাধু কিঞ্চন॥ ৫২॥

হে রাঘব, যাঁহারা সত্য দেখিয়া তাহা গ্রহণ ও অসত্য দেখিয়া তাহা বর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারাও বিচার ব্যতীত কোনও সাধু তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন না।

এখন প্রশ্ন এই যে, সত্যাসত্য কিরূপে নির্দ্ধারণ করিব? অকৃত্রিম স্বদেশসেবক ঋষিকল্প মাট্‌সীনী (Mazzini) তাহার দুইটী উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রথম উপায় বিবেকবাণী (the voice of conscience)। দ্বিতীয় উপায় বিশ্বমানবের বাণী (the voice of humanity)। এই উভয় বাণী যে ক্ষেত্রে মিলিত হয়, সেখানে সত্য সম্বন্ধে কোনও সংশয় থাকে না। কোনটী সত্য, কোন্‌টী মিথ্যা, কোন্‌টী শ্রেয়ঃ, কোন্‌টী অশ্রেয়ঃ, কোন্‌টী গ্রহণীয়, কোন্‌টী বর্জ্জনীয়, আমার বিবেকই সর্ব্বপ্রথমে তাহা বলিয়া দিবে। আমি যাহাতে বিবেকের সার পাই নাই, বিশ্বশুদ্ধ লোকে তাহার গুণ কীর্ত্তন করিলেও তাহা আমার পরিত্যাজ্য। কিন্তু আমি বিবেকের বাণী বুঝিতে ভুল করিতে পারি ; আমার রুচি, প্রবৃত্তি, বাসনা বিবেকের বেশ ধরিয়া আমার নিকটে উপস্থিত হইতে পারে ; এজন্য দেখিতে হইবে, আমি যাহা বিবেকবাণী বলিয়া মনে করিতেছি, বিশ্বমানবের বাণীর সহিত তাহার ঐক্য আছে কি না। বিবেকের অনুশীলন আবশ্যক। শিক্ষা ও সাধনার সাহায্যে বিবেক উজ্জ্বল হয়, এই দুইটীর অভাবে উহা মলিন ও নিস্তেজ

হইয়া পড়ে। মাট্‌সীনী বলিতেছেন, "Individual conscience speaks in proportion to the education, tendencies, habits and passions of the individual"—অর্থাৎ যাহার যেমন শিক্ষা, রুচি, অভ্যাস ও প্রবৃত্তি, তাহার বিবেকও তদনুযায়ী কথা বলে। ইহার ধর্ম্ম এই যে, যে ব্যক্তি উত্তম শিক্ষা পাইয়াছে, যাহার রুচিগুলি মার্জ্জিত হইয়াছে, যে সদাচার অভ্যাস করিয়াছে, ও যাহার প্রবৃত্তিসমূহ সংযত হইয়াছে, তাহার বিবেকও তীক্ষ্ণ ও সদাজাগ্রত, সে বিবেকবাণী স্পষ্টরূপেই শুনিতে পায়। বিবেক মানবের অন্তর্নিহিত একটী বৃত্তি, কিন্তু শিক্ষা ও সদাচার বিহনে ইহা নষ্ট হইয়া যায়। মানবের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে যে, জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বিবেকও কত বিকশিত ও সবল হইয়াছে। অতি প্রাচীনকালে নরবলি প্রভৃতি যাহা ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া গণ্য হইত, ধর্ম্মাধর্ম্ম বোধ উজ্জ্বল হওয়াতেই সেগুলি রহিত হইয়া যায়। বিবেক-বাণীর মত সত্যের কষ্টিপাথর আর নাই।

প্রথমে বিবেকবাণী, তৎপরে বিশ্বমানবের বাণী। মাট্‌সীনীর ভাষায় বলিতে পারি, "বিশ্বমানব যুগে যুগে ঈশ্বরের অবতার" (Humanity is the successive incarnation of God)। বিশ্বমানবের সাক্ষ্য অতি মূল্যবান্‌। এই পৃথিবী অনেক প্রাচীন হইয়াছে, মানবজাতি সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া ইহাতে বাস করিতেছে। এই দীর্ঘকালের মধ্যে মানবকে কত প্রকার দুরূহ সমস্যার মীমাংসা করিতে হইয়াছে। আমি যে আবার সেগুলি নূতন করিয়া ভাবিয়া নূতন একটা সমাধান করিব, অধিকাংশ স্থলেই তাহা সম্ভবপর নয়। বিদ্যালয়ের বালক জ্যামিতি পড়িতে যাইয়া যেমন বিন্দু হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ প্রতিজ্ঞা পর্য্যন্ত সমস্ত নিজে আবিষ্কার করে না, প্রথমে অনেকগুলি

তত্ত্ব তাহাকে ইয়ুক্লিড আশ্রয় করিয়া মানিয়া লইতে হয়, তেমনি জীবন-পথে চলিতে চলিতে আমাদিগেরও পদে পদে মানবেতিহাসের অভিজ্ঞতার প্রয়োজন আছে ; এগুলি উপেক্ষা করিলে বিপথগামী হইবার আশঙ্কা বিদ্যমান। এই জন্যই বিশ্বমানবের বাণীর এত মর্য্যাদা। কিন্তু এস্থলে প্রশ্ন উঠিতে পারে, তবে কি এক একটী করিয়া মত গণনা করিয়া বিবেকবাণীর সহিত মিলাইতে হইবে? আমি যদি একটা নূতন কার্য করিতে যাই, কি একটা নূতন মত গ্রহণ করিতে চাই, তবে আগে স্বদেশের ও বিদেশের সকলের ভোট সংগ্রহ করিতে হইবে, তবে আমি স্থির করিব, আমার কোন্ পথে চলা কর্ত্তব্য? প্রশ্নটি করিবামাত্রই বুঝা যায়, যে, এটা একটা অসম্ভব হাস্যাস্পদ ব্যাপার। এখানে ভোট-গ্রহণের কথা হইতেছে না। কথাটা এই যে নীতিধর্ম্মবিষয়ে অধিকাংশ স্থলেই মানবজাতির মধ্যে একটা ঐকমত্য দাঁড়াইয়া গিয়াছে—সেগুলি কাহারও জানিতে বাকি নাই। সত্য প্রেম, পবিত্রতা, দয়া, পরোপকার ; মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা ; ত্যাগ, বৈরাগ্য, সংযম ; বিনয়, ভক্তি, সেবা—এই সমুদায় সম্বন্ধে ধর্ম্মে ধর্ম্মে প্রভেদ কতটুকু? নাই বলিলেই হয়। ধর্ম্মের সার, ধর্ম্মের প্রাণ সকল দেশেই এক ; কলহ অবান্তর বিষয় লইয়া, কলহের মূল নানাপ্রকার সংস্কার। এ কথার অর্থ ইহা নয় যে, জ্ঞান বা বিবেক যাহা বিশ্বজননী ধর্ম্মের অনুমোদিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে, প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহা জানিয়া রাখিয়াছে ; সুতরাং সর্ব্বাগ্রে দেখা উচিত যে, যে তত্ত্বটীর বিচার চলিতেছে, তাহা জগতের সকলেই মানিয়া আসিতেছে কি না। আমরা যাহা বলিতেছি, তাহার মর্ম্ম এই। সার্ব্বভৌমিক তত্ত্বের একটী লক্ষণ এই যে, যে ব্যক্তি উহা অদ্যাপি অবগত হয় নাই, তাহার সম্মুখে উহা উপস্থিত করিলেই সে উহাকে জ্ঞানানুমোদিত বলিয়া স্বীকার করিবে। উহার দ্বিতীয় লক্ষণ

এই যে, যে-কেহ মনোবৃত্তির সম্যক্ উৎকর্ষ সাধন করিয়াছে, সেই জ্ঞান ও তপস্যার বলে উহা অবগত হইতে পারে। সুতরাং বিশ্বমানবের বাণী কি, তাহা বুঝা যে বড় কঠিন, তা' নয়। যে ব্যক্তি চিত্তবৃত্তি ও বিবেকের সমুচিত অনুশীলন করিয়াছে, সে বিশ্বমানবের বাণী অক্লেশে শুনিতে পায়। কিন্তু যাহার অন্তরাত্মা বধির, যাহার নিজের বিবেকই সাড়া দেয় না, এবং যে অজ্ঞানান্ধকারে ডুবিয়া রহিয়াছে, বিশ্বমানবের সাক্ষ্য কি করিয়া তাহার বোধগম্য হইবে?

মাট্‌সীনী সত্য-নির্ণয় সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, এ দেশের শাস্ত্রে ওই তদনুরূপ কথা পাওয়া যায়। যোগবাশিষ্ঠে উক্ত হইয়াছে,

স্বানুভূতেঃ সুশাস্ত্রস্য গুরোশ্চৈবৈকবাক্যতা।
যস্যাভ্যাসেন তেনাত্মা সন্ততেনাবলোক্যতে॥

নিজের অনুভূতি, সুশাস্ত্র এবং গুরুবাক্য, এই তিনের ঐক্য করিয়া যিনি নিরন্তর ব্রহ্মজ্ঞান অভ্যাস করেন, তিনি পরমাত্মাকে দর্শন করেন। এখানে স্বানুভূতি বা আত্মপ্রত্যয়, সুশাস্ত্র ও গুরু, এই তিন উপায়ের উল্লেখ আছে। গুরু জীবিত ও মৃত দুইই হইতে পারে। সুতরাং সুশাস্ত্র ও গুরু একই পর্য্যায়ে পড়িল। সুশাস্ত্র ও গুরুবাক্যই বিশ্ব-মানবের বাণী। তবেই দেখা যাইতেছে যে, সত্যনির্ণয়ের জন্য মাট্‌সীনী যে পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যোগবাশিষ্ঠ প্রদর্শিত পন্থাও প্রায় অবিকল তাই। এখানে একটী বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। যোগবাশিষ্ঠকার শাস্ত্র ও গুরু, কোন স্থলেই অভ্রান্ত শব্দটী ব্যবহার করেন নাই। 'সুশাস্ত্র' কথাটী পড়িলেই বোধ হয় যে, তাঁহার বিবেচনায় সকল শাস্ত্রের আদেশ শিরোধার্য্য নহে ; শাস্ত্রগুলি 'সু' ও 'কু' এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। কুশাস্ত্র বর্জ্জনীয়। এই মতের সহিত আমাদিগের বিরোধ নাই। তবে আমরা সুশাস্ত্র শব্দটী একটু ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করিতে চাই।

সত্যম্ শাস্ত্রম্ অনশ্বরম্"—সত্যই অবিনশ্বর শাস্ত্র। অতএব, যে গ্রন্থে যে পরিমাণে সত্য আছে, তাহা সেই পরিমাণে সুশাস্ত্র। এই অর্থে উপনিষদ, ভগবদ্‌গীতা, ভাগবত প্রভৃতি যেমন সুশাস্ত্র, ডারুইনের Origin of Species, স্পেন্সারের First Principles প্রভৃতিও তেমনি সুশাস্ত্র। সত্য বিশ্বজনীন; সত্যের জাতিভেদ নাই, শাস্ত্রেরও জাতিভেদ নাই। বেদ, বাইবেল, পুরাণ, কোরাণ—সত্যান্বেষীর পক্ষে কোনটীই অভ্রান্ত নহে, কোনটীই হেয় নহে; যাহাতে যেটুকু সত্য আছে, তাহাই আদরণীয়। কোন্‌টী সত্য, কোনটী মিথ্যা, তাহা বিবেক-বাণী ও বিশ্বমানবের বাণী, এই নিকষ পাথরে কষিয়া লইতে হইবে। ইহা অপেক্ষা সত্য নির্দ্ধারণের উৎকৃষ্টতর ও সুগমতর পন্থা আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।

উপসংহার

ঈশ্বর মনুষ্যকে বিচারশক্তি ও ধর্ম্মাধর্ম্ম বোধ দিয়া এই সংসারে প্রেরণ করিয়াছেন। অতএব সত্য সম্বন্ধে তাহার একটা অবশ্যপালনীয় কর্ত্তব্য আছে। সে সর্ব্বপ্রযত্নে সত্যনির্ণয়ের অনুকূল অবস্থায় বাস করিবে। এই অনুকূল অবস্থাটা কি? প্রথমতঃ, যে সকল অন্তরায় উল্লিখিত হইয়াছে, যতদূর সম্ভব, সেগুলিকে দূর করিতে হইবে? কিরূপে এগুলি দূর হইবে, তাহা সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। তৎপরে হৃদয়মনের উন্মুখীনতা চাই। মন সত্যগ্রহণের জন্য নিয়ত উৎসুক থাকিবে, হৃদয়কে ইচ্ছাপূর্ব্বক কখনই সত্যের প্রতি বিমুখ করিয়া রাখা হইবে না, ইহাই সত্যপ্রিয় ব্যক্তির লক্ষণ। মনের দরজা জানালা সমস্ত খুলিয়া রাখিতে হইবে। চিত্ত যত সংস্কারমুক্ত হইবে, হৃদয়মনের উন্মুখীনতাও ততই বাড়িবে। বিজ্ঞানের রাজ্যে কি দেখিতে পাই। পরমাণুবাদ, আলোকবাদ,

তাড়িতবাদ প্রভৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, এবং ভবিষ্যতে হয় তো আবার পরিবর্ত্তিত হইবে। প্রকৃত বৈজ্ঞানিক তাহাতে ক্ষুব্ধ হন না; চিরপোষিত মত মিথ্যা প্রতিপন্ন হইলে তিনি তাহা আঁকড়িয়া ধরিয়া বসিয়া থাকেন না। ধর্ম্ম, সমাজ ও রাজনীতির ক্ষেত্রেও কি এইরূপ হওয়া উচিত নয়? প্রত্যেককেই আত্মপরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে, হৃদয় সত্য গ্রহণের জন্য প্রস্তুত কি না। পরিশেষে, স্মরণ রাখিতে হইবে, যে হৃদয়মনের এই উন্মুখীনতার কোন অর্থই থাকে না, যদি আমরা নিজ নিজ জীবনে সত্যের অনুগামী না হই। সত্যনির্ণয়ের সর্ব্বাপেক্ষা অনুকূল অবস্থা সত্যানুসরণ। যেটুকু সত্য জানিলে, তাহা সমাদর করিয়া গ্রহণ কর, আচারে ব্যবহারে পালন কর, অপর সত্য তোমার নিকটে প্রকাশিত হইবে। আর, যে সত্য হৃদয়ে উদিত হইল, তাহাকে অবহেলা কর, অবমাননা করিয়া বিদায় করিয়া দাও, তাহার বাণীর প্রতি বধির হইয়া থাক—তুমি চিরদিনের তরে আপনাকে সত্যে বঞ্চিত রাখিবে। কবি গাহিয়াছেন,

কর্ত্তব্য বুঝিবে যাহা, নির্ভয়ে করিবে তাহা,
যায় যাক্ থাকে থাক্ ধন প্রাণ মান রে;
পিতাকে ধরিয়া রবে পর্ব্বত সমান রে।

ইহাই মানুষের মত কথা। বালক, যুবক, বৃদ্ধ সকলের পক্ষেই এ কথা খাটে। মনুষ্যমাত্রেরই কর্ত্তব্য এই যে, সে যাহা সরল অন্তঃকরণে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে, যথাসাধ্য তাহার অনুসরণ করিবে। এমন হইতে পারে যে, সে আজ যাহা সত্য বলিয়া আলিঙ্গন করিয়াছে, দুইদিন পরে তাহা তাহার নিকট মিথ্যা বলিয়া প্রতীয়মান হইবে; কিন্তু যতক্ষণ সে উহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেছে, ততক্ষণ সে উহাকেই ধরিয়া থাকিবে। এই পথ অবলম্বন করিয়াই মানবজাতি জ্ঞান ও ধর্ম্মে উন্নতি লাভ

করিয়াছে। সাধু মহাজনদিগের জীবনেও ইহাই দেখিতে পাই। বাইবেলে বর্ণিত আছে, সরল বিশ্বাসী আব্রাহাম ঈশ্বরের প্রীতির জন্য পুত্র আইজাককে বলি দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। আমরা নরবলির অনুমোদন করি না; কিন্তু আব্রাহাম সত্যই বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে, ঈশ্বর তাঁহার পুত্রকে চাহিয়াছেন; এই জন্যই তিনি প্রাণপ্রিয় পুত্রকে বিসর্জন করিতে সংকল্প করিয়াছিলেন। এইখানেই আব্রাহামের মহত্ত্ব। এই প্রকার সরল একনিষ্ঠ, সত্যানুগত্য লক্ষ্য করিয়াই গীতাকার ভগবানের মুখে এই বাণী আরোপ করিয়াছেন—যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্। (৪।১১)। "যে যেভাবে আমার ভজনা করে, আমি তাহাকে সেইরূপ ফল প্রদান করিয়া অনুগৃহীত করিয়া থাকি।"

কিন্তু মানুষের আর একটী কর্ত্তব্য আছে। সে যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছে, তাহার অনুসরণ তো করিবেই; তা' ছাড়া, প্রকৃত সত্য জানিবার জন্য তাহাকে বুদ্ধিবৃত্তির সমুচিত সদ্ব্যবহার করিতে হইবে; অর্থাৎ সে যাহা সত্য বলিয়া ধরিয়া রহিয়াছে, তাহা বাস্তবিকই সত্য কি না, তাহাও তাহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। তাহা না করিলে তাহার একটী গুরুতর কর্ত্তব্যের হানি হইল। যে সরলচিত্তে একটা ভ্রান্তিকেই আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, ভণ্ড কপট ব্যক্তি অপেক্ষা সে শ্রেষ্ঠ; কিন্তু যে সত্য জানিয়া সত্যেতেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অকপট, নিষ্ঠাবান্ পৌত্তলিক বিশ্বাসবিহীন কপটাচারী দেবোপাসক অপেক্ষা শতগুণে প্রশংসনীয়; কিন্তু সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মের উপাসনা সকল উপাসনার উপরে—ইহা এ দেশের শাস্ত্রই পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করিয়াছে। যাহারা মহত্তরকে জানিয়াও অধমতরকে বরণ করে, শ্রেষ্ঠকে জানিয়াও অশ্রেষ্ঠে ডুবিয়া থাকে, সত্যকে জানিয়াও অসত্যকে তদুপরি স্থান দেয়, তাহাদিগের মত অপরাধী ভূমণ্ডলে আর নাই।

কার্লাইল বলিতেছেন—ঈশ্বর যখন কৃপা করিয়া তোমাকে জীবনপ্রদ আলোক প্রদান করেন, তখনই তাহা গ্রহণ করিও। তুমি তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতেছ? বেশ; তিনি সে আলোক ক্রমে ক্রমে তোমার নিকট হইতে প্রত্যাহার করিবেন। তার পর, বিশ্বনিয়ম যেমন অটল ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, তেমনি অটল অমোঘ নিয়মানুসারে ঐ আলোক যথাকালে আবার তোমার নিকটে প্রত্যাগমন করিবে; কিন্তু এবার তাহা আসিবে বজ্ররূপে ঘনীভূত হইয়া; ধরণীতে এমন স্থূলচর্ম্মী কেহই নাই, যে সেই বজ্রদহন সহিতে পারে।" ভারতবর্ষের ইতিহাস কি বারংবার এই মহাকাব্যের সাক্ষ্য দেয় নাই? সত্যভ্রষ্ট না হইলে একটা বিশাল জাতি কখনও এমন হীনদশায় পতিত হয় না। ব্যক্তিগত জীবনে, সামাজিক জীবনে, জাতীয় জীবনে অন্বেষণ করিয়া দেখ, কোথায় সংস্কার-বর্জ্জিত সত্যালিঙ্গন? কোথায় জ্ঞান ও কর্ম্মের সামঞ্জস্য? শত শত ব্যক্তি এখনও ঘোররবে প্রচার করিতেছে, সমাজের অনাচার মানিয়া লইয়া সমাজকে তুলিয়া ধর; সংস্কারের নাগপাশে বদ্ধ থাকিয়া মুক্তির পথে অগ্রসর হও; মিথ্যার চরণে আপনাকে বিকাইয়া দিয়া একটা বিশাল বিক্রান্ত জাতি গড়িয়া তোল। কত কত জাতি ঐহিক বৈভবে স্ফীত ও বিষয়বিলাসে উন্মত্ত হইয়া ধরাকে সরাতুল্য জ্ঞান করিয়া চিরন্তন সত্যকে পায়ে দলিয়া মিথ্যার পশ্চাতে ছুটিয়া চলিয়াছিল; কিন্তু বিধাতার দারুণ কশাঘাতে চেতনা পাইয়া তাহাদিগকে আবার বলিতে হইয়াছে—Righteousness alone exalteth a nation—ধর্ম্মই জাতীয় উন্নতির একমাত্র পন্থা। দূর পুরাকালে ভারতের মহাজনগণ কতপ্রকারে এই মহাসত্য লোকচিত্তে মুদ্রিত করিয়া দিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন! "ধর্ম্মো ধারয়তে ধৃতঃ"—যে ধর্ম্মকে ধরিয়া থাকে, ধর্ম্মই তাহাকে রক্ষা করেন; আদি কবি বাল্মীকি এই সনাতন নিয়ম প্রকটিত করিবার জন্যই

মহাকাব্য রামায়ণ রচনা করিলেন। যে দিন হইতে ভারতবাসী এই অমূল্য বাণী ভুলিতে আরম্ভ করিল, সেই দিন হইতেই জাতীয় অধঃপতনের সূত্রপাত হইল। যুগে যুগে দেশে দেশে সত্যের মহিমা ঘোষিত হইয়াছে—ইতিহাস সত্য-লঙ্ঘনের দুঃসহ প্রায়শ্চিত্ত-কাহিনী পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে লিখিয়া রাখিয়াছে। মহর্ষি ঈশা বলিয়াছেন, "Ye shall know the truth, and the truth shall make you free"—"তোমরা সত্য অবগত হইবে, এবং সত্য তোমাদিগকে স্বাধীনতা দান করিবে।" এমন সার কথা আজিও মানুষের মনে স্থান পাইল না! সম্প্রতি ভারতবর্ষে জ্ঞানাহরণের জন্য কি প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে! জ্ঞানার্জ্জন ও জ্ঞানবিতরণের এই নবোদ্যমের মাদকতায় আমরা কি ভুলিয়া যাইব যে, জীবন যদি সত্যানুগত না হয়, তবে জ্ঞানে ধিক্, কর্ম্মে ধিক্, যশোমানে ধিক্? সত্যের সহিত যাহার যোগ নাই, তাহার জ্ঞান কি আবার একটা জ্ঞান? জ্ঞানযোগী জর্ম্মন কবি গেটে (Goethe) তাই বলিয়াছেন, "Wisdom lies only in truth"—সত্যই জ্ঞানের প্রতিষ্ঠাভূমি, সত্য ছাড়িয়া জ্ঞান থাকিতে পারে না। আমাদিগের চিত্ত এই বাণী স্বীকার করুক; আজ জাতীয় জীবনের প্রথম উষায় আমাদিগের গৃহে, কর্ম্মক্ষেত্রে, আমাদিগের সমাজে, রাষ্ট্রে, আমাদিগের আচরণে, প্রতিষ্ঠানে প্রতিক্ষণ এই ঋষি-বাক্য অন্তরে অন্তরে ধ্বনিত হউক,

সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্ ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যম্ কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্।

"সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইও না; ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইও না; কুশল হইতে ভ্রষ্ট হইও না।"

সম্পূর্ণ

সার্ব্ববর্ণিক ধর্ম্ম

সার্ব্ববর্ণিক ধর্ম্ম

—:::—

একটা সবল ও স্বাধীন জাতিসংগঠনের প্রধান উপাদান জ্ঞানচর্চ্চায় এবং ধর্ম্মসাধনে একত্ব। যে দেশে এই একত্ব নাই, সে দেশের অধিবাসীরা একভাষাভাষী হইয়াও, কিংবা এক রাজার অধীনে বাস করিয়াও সহজে মিলিত হইতে পারে না। একই জাতির মধ্যে জ্ঞানানুশীলনে ও ধর্ম্মাদর্শে ভেদ থাকিলে যে কুফল উৎপন্ন হয়, আমরা সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া তাহা ভোগ করিয়া আসিতেছি। অধুনা এদেশে ধর্ম্মভেদকে চিরন্তন করিয়া রাখিবার জন্য আবার একটা প্রবল প্রচেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। এজন্য ধর্ম্মভেদের বিষয়টি পুনশ্চ আলোচনা করিয়া দেখা স্বাজাত্যপ্রিয় ব্যক্তিমাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য।

ধর্ম্মভেদ দুই ক্ষেত্রে হিন্দুজাতিকে দুর্ব্বল ও নিব্বীর্য্য করিয়া রাখিয়াছে। প্রথমতঃ বর্ণে বর্ণে ধর্ম্মভেদ; দ্বিতীয়তঃ পুরুষ নারীতে ধর্ম্মভেদ। প্রথম বর্ণে বর্ণে ধর্ম্মভেদের কথা বলিতেছি।

প্রথম প্রকরণ

বর্ণে বর্ণে ধর্ম্মভেদ

বর্ণভেদে ধর্ম্মভেদের উল্লেখ বৈদিক সাহিত্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। বেদের অন্তর্গত আপস্তম্ব, গৌতম, বশিষ্ঠ. বৌধায়ন প্রভৃতির নামে প্রচলিত ধর্ম্মসূত্রসমূহ মন্বত্রিহারীযাজ্ঞবল্ক্যাদি বিংশতি সংহিতা

বা ধর্ম্মশাস্ত্রের উৎপত্তিস্থল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে ধর্ম্মসূত্রসমূহ ঈশাহী শকারম্ভের তিন শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত হয়। এগুলির মধ্যে গৌতমধর্ম্মসূত্র সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। উহার দশম অধ্যায়ে চারি বর্ণের বিভিন্ন ধর্ম্ম বর্ণিত হইয়াছে। বর্ণধর্ম্মের ইহাই বোধ হয় প্রাচীনতম বিবৃতি।

যাজ্ঞবল্কসংহিতার প্রথম অধ্যায়ে বিংশতি সংহিতাকারের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, যথা—

মন্বত্রিবিষ্ণুহারীতযাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গিরাঃ
যমাপস্তম্বসংবর্ত্তাঃ কাত্যায়নবৃহস্পতী॥
পরাশরব্যাসশঙ্খলিখিতা দক্ষগোতমৌ।
শাতাতপো বসিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজকাঃ॥ ৪, ৫ ॥

এই সংহিতা সকলের অনেকগুলিতে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বর্ণিত হইয়াছে। আমি বিষ্ণুসংহিতা হইতে একটী স্থল উদ্ধৃত করিতেছি—বাক্যটী সংক্ষিপ্ত ও সুস্পষ্ট এবং গদ্যে রচিত। উহার ভাবার্থ এবং মনুপ্রোক্ত চাতুর্ব্বর্ণ্যের সমগ্র ধর্ম্মবিধির ব্যাখ্যান (১০।৭৫—১৩১) অবিকল এক ও অভিন্ন; এজন্য মনুসংহিতা সর্ব্বাপেক্ষা মান্য হইলেও বক্ষ্যমান বিষয়ে তাহা হইতে আমরা কোনও বচন উদ্ধার করিলাম না।

বিষ্ণুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে—

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রশ্চেতি বর্ণাশ্চত্বারঃ॥ ১ ॥

তেষাঞ্চ ধর্ম্মাঃ—ব্রাহ্মণস্যাধ্যাপনম্, ক্ষত্রিয়স্য শস্ত্রনিত্যতা, বৈশ্যস্য পশুপালনম্, শূদ্রস্য দ্বিজাতিশুশ্রূষা দ্বিজানাং যজনাধ্যয়নে॥ ৪ ॥

অথৈতেষাং বৃত্তয়ঃ—ব্রাহ্মণস্য যাজনপ্রতিগ্রহৌ; ক্ষত্রিয়স্য ক্ষিতিত্রাণম্; কৃষিগোরক্ষবাণিজ্যকুসীদযোনিপোষণানি বৈশ্যস্য; শূদ্রস্য সর্ব্বশিল্পানি॥ ৫ ॥

"ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারি বর্ণ। তাহাদিগের ধর্ম্ম এই—ব্রাহ্মণের অধ্যাপনা, ক্ষত্রিয়ের অস্ত্রচর্চ্চা, বৈশ্যের পশুপালন, শূদ্রের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য) এই দ্বিজাতির সেবা। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের (সাধারণ ধর্ম্ম) যজন ও অধ্যয়ন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের বৃত্তি বা জীবিকা এই—ব্রাহ্মণের যাজন ও প্রতিগ্রহ, ক্ষত্রিয়ের ক্ষিতি পালন, বৈশ্যের কৃষি, বাণিজ্য, গোপালন, কুসীদব্যবহার ও ধান্যাদি বীজরক্ষা; শূদ্রের সকল প্রকার শিল্পকার্য্য।"

মহাভারতে শান্তিপর্ব্বের ৬০তম হইতে ৬৪তম অধ্যায়ে ভীষ্ম বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বর্ণনা করিয়াছেন। উহা হইতে দুই একটি প্রয়োজনীয় শ্লোক উদ্ধৃত হইতেছে।

ক্ষত্রিয়স্যাপি যোধর্ম্মস্তং তে বক্ষ্যামি ভারত।
দদ্যাদ্রাজন্ন যাচেত যজেত ন চ যাজয়েৎ॥
নাধ্যাপয়েদধীয়ীত প্রজাশ্চ পরিপালয়েৎ।
নিত্যোদ্যুক্তো দস্যুবধে রণে কুর্য্যাৎ পরাক্রমম্॥
৬০।১৩, ১৪॥

"হে যুধিষ্ঠির, ক্ষত্রিয়ের যে ধর্ম্ম, তাহা তোমাকে বলিতেছি। ক্ষত্রিয় ধন দান করিবেন, যাচ্ঞা করিবেন না; যজ্ঞ করিবেন, যাজন করিবেন না; অধ্যয়ন করিবেন, অধ্যাপনা করিবেন না। অধিকন্তু

তিনি প্রজা পালন করিবেন, নিত্য দস্যুবধে উদ্যুক্ত থাকিবেন, এবং যুদ্ধে বীর্য্য প্রকাশ করিবেন।"

প্রজাপতির্হি বর্ণানাং দাসং শূদ্রমকল্পয়ৎ।
তস্মাচ্ছুদ্রস্য বর্ণানাং পরিচর্য্যা বিধীয়তে॥ ২৮ ॥

"প্রজাপতি শূদ্রকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই তিন বর্ণের দাসরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন; অতএব এই তিন বর্ণের পরিচর্য্যাই শূদ্রের ধর্ম্ম।"

উদ্ধৃত শাস্ত্রবচনগুলির বিশ্লেষণ আবশ্যক। মুখবন্ধস্বরূপ বলিয়া রাখিতেছি যে, বিষ্ণু ব্রাহ্মণাদির কর্ত্তব্যসমূহকে ধর্ম্ম ও বৃত্তি, এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; সকল ধর্ম্মশাস্ত্রে এই বিভাগ দৃষ্ট হয় না। মনুর মতে অধ্যাপন, অধ্যয়ন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ, ব্রাহ্মণের এই ছয়টি কর্ম্ম; তন্মধ্যে শেষোক্ত তিনটী তাঁহার উপজীবিকা (১০।৭৫)। আমরা বিষ্ণুসংহিতার অনুসরণ করিয়া আলোচনায় প্রবেশ করিতেছি।

বর্ণধর্ম্মের বিধানে দুই প্রকার ভেদ সৃষ্ট হইয়াছে; প্রথম ভেদ দ্বিজ (বা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য) ও শূদ্রে; দ্বিতীয় ভেদ দ্বিজাতির অন্তর্গত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের মধ্যে। উভয় স্থলেই এই ভেদ আবার দুই প্রকার; প্রথমতঃ ধর্ম্মগত ভেদ, দ্বিতীয়তঃ বৃত্তিগত বা ব্যবসায়গত ভেদ।

অগ্রে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের ধর্ম্মভেদ ও বৃত্তিভেদ বিষয়ে আলোচনা করা যাক।

সামাজিক বৃত্তিবিভাগ

বৃত্তিবিভাগ সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইলে আমাদিগকে প্রথমেই দুইটী কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। প্রথমতঃ, ভারতীয়

শাস্ত্রকারেরা আপদ্ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন; অর্থাৎ তাঁহারা ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতিকে আপৎকালে বৃত্ত্যন্তর গ্রহণের ব্যবস্থা দিয়াছেন। যথা, যদি ব্রাহ্মণ অধ্যাপনাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ না হন, তবে তিনি গ্রামাদিরক্ষারূপ ক্ষত্রিয়বৃত্তি এবং তাহাতেও জীবিকা নির্ব্বাহে অসমর্থ হইলে, কৃষি-বাণিজ্যাদি বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিতে পারেন। (মনু। ১০।৮০, ৮১)।

তৎপরে, সকলেই স্বীকার করিবেন যে, সমাজের অভিব্যক্তিতে শ্রমবিভাগের ন্যায় বৃত্তিবিভাগের স্থান ও প্রয়োজন আছে। কথাটা একটু পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি।

মানবসমাজকে জীবদেহের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। জীবদেহের অভিব্যক্তিতে দেখিতে পাই, নিম্নতম স্তরে জীবদেহে বিভিন্ন প্রত্যঙ্গ বিকশিত হয় নাই। এককোষপ্রাণী (amœba, protozoa) সমগ্র দেহ দিয়া আহার করে, সমগ্র দেহ দ্বারা বিচরণ করে। ক্রমে, বহুযুগ অন্তে, স্তরের পর স্তর অতিক্রম করিয়া পূর্ণ-পরিণত প্রত্যঙ্গসহ মানবদেহ অভিব্যক্ত হইল; উহার ইন্দ্রিয়গ্রাম ও প্রত্যঙ্গসমূহ বিভিন্নধর্ম্মাক্রান্ত; প্রত্যেকের কার্য্য সুনির্দ্দিষ্ট, অথচ সকলেই পরস্পরের সহযোগী। মানবসমাজের প্রাথমিক অবস্থাতেও তেমনি শ্রমবিভাগ ছিল না; সমাজবাসী সকলেই সকল রকম কর্ম্ম করিত। ক্রমে শাসক ও শাসিত, রাজা ও প্রজা প্রভৃতি বিভাগ সৃষ্ট হইল। কিন্তু তখনও রাজা একাধারে পুরোহিত, যোদ্ধা, বিচারক, শিল্পী, বণিক্ ইত্যাদি রূপে কত প্রকার কর্ম্মে লিপ্ত থাকিতেন। সামাজিক প্রয়োজনে সূক্ষ্মতর শ্রমবিভাগ অপরিহার্য্য হইয়া পড়িল; সুতরাং সমাজস্থিতির জন্য কর্ম্মিগণের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভব হইল। জীবের প্রত্যঙ্গগুলি তিন ভাগে বিভক্ত—(১) পোষণেন্দ্রিয় (sustaining

organs (হস্ত, মুখ; (২) বহনেন্দ্রিয় (distributing organs), খাদ্যবাহনালী; (৩) শাসনেন্দ্রিয় (regulating organs), মস্তিষ্ক। মানবসমাজেও তেমনি কালক্রমে (১) পোষণেন্দ্রিয় (কৃষক, শিল্পী প্রভৃতি), (২) বহনেন্দ্রিয় (বণিক্, দোকানদার ইত্যাদি), এবং (৩) শাসনেন্দ্রিয় (রাজা, পুরোহিতাদি) অভিব্যক্ত হইয়াছে।

এইরূপে স্বাভাবিক নিয়মে মানবসমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভব হইয়া থাকে। ভগবদ্গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে তাহার ইঙ্গিত আছে; তথায় উক্ত হইয়াছে,

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ ॥ ১৩ ॥

"ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারিবর্ণ আমাকর্তৃক গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ অনুসারে সৃষ্ট হইয়াছে।" শঙ্কর ইহার ভাষ্য করিয়াছেন—"গুণ তিনটী, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। ব্রাহ্মণ সত্ত্বপ্রধান। তাঁহার কর্ম্ম শম, দম, তপস্যা ইত্যাদি। ক্ষত্রিয় সত্ত্বমিশ্রিত রজঃপ্রধান; শৌর্য্য, তেজঃ প্রভৃতি তাঁহার কর্ম্ম। বৈশ্য তমোমিশ্রিত রজঃপ্রধান; তাহার কর্ম্ম কৃষি ইত্যাদি। শূদ্র রজোমিশ্রিত তমঃপ্রধান; সেবাই তাহার কর্ম্ম।" সামাজিক শ্রেণীবিভাগ এই প্রকারে প্রকৃত গুণ-কর্ম্মের ভিত্তিতে স্থাপিত হইলে আপত্তির হেতু থাকে না। কিন্তু তাহা বংশগত হইলেই জাতীয় দুর্গতির পথ প্রশস্ত হইয়া পড়ে।

দ্বিজাতির ধর্ম্মবিভাগ

ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশাসন মতে শুধু ব্রাহ্মণের অধ্যাপনা ও যাজনের অধিকার আছে; ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পক্ষে এই দুইটি নিষিদ্ধ। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দুইটী আপত্তি আছে।

(১) অধ্যাপনার অধিকার না থাকিলে জ্ঞানার্থীর অধ্যয়নের ফল পরিপক্ক হয় না; এবং তাহাতে ক্রমশঃ জ্ঞানে অরুচি জন্মিয়া থাকে। যাঁহারা শিক্ষাদানের কর্ম্মে ব্যাপৃত আছেন, তাঁহারা সাক্ষ্য দিবেন, যে গৃহে একাকী অধ্যয়ন করিবার কালে যে তত্ত্বটি সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হয় নাই, নিঃসংশয়িতরূপে প্রতিপন্ন ও উজ্জ্বলভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠে নাই, ছাত্রগণের নিকটে ব্যাখ্যা করিবার কালে তদুপরি নূতন আলোকপাত হইয়াছে, কিম্বা চক্ষুর পলকে তাহার অভিনব অর্থ মানসপটে উদ্ভাসিত হইয়া পড়িয়াছে। এই জন্যই বিখ্যাত ইংরাজ দার্শনিক জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের পিতা জেমস্ মিল, পুত্রের পাঠাবস্থায় অষ্টম বর্ষ হইতে এই নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন, যে জন্ মিল পূর্ব্বাহ্নে পিতার নিকট যাহা শিক্ষা করিবেন, অপরাহ্নে ভ্রাতা ভগিনীদিগকে তাহা শিক্ষা দিবেন। তিনি নিজে আত্মচরিতে স্বীকার করিয়াছেন, যে এই পদ্ধতি শিক্ষণীয় বিষয়গুলি বুঝিবার ও আয়ত্ত করিবার পক্ষে তাঁহাকে প্রভূত সাহায্য করিয়াছিল। অধ্যাপনার অধিকারে বঞ্চিত থাকিয়া দুই নিম্নতর দ্বিজাতি জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ হারাইল, এবং এইরূপে তাহাদিগের মধ্যে, বিশেষতঃ বৈশ্যসমাজে, বেদজ্ঞান ধীরে ধীরে লুপ্ত হইল, ইহা অনায়াসেই বলা যাইতে পারে।

তৎপরে এই ব্যবস্থা গুণগত শ্রেণীবিভাগের বিরোধী। অধ্যাপনা, অস্ত্রচর্চ্চা, কাব্যরচনা, বিজ্ঞানানুশীলন, শিল্পকর্ম্ম—সকলই বিশেষ বিশেষ গুণের উপরে নির্ভর করে। অধ্যাপকের পুত্র অধ্যাপক, কবির পুত্র কবি, সেনাপতির পুত্র সেনাপতি, কিম্বা চিত্রকরের পুত্র চিত্রকর হইবে, এমন কোনও নৈসর্গিক নিয়ম নাই। প্রবাদ আছে, "যার কাজ তার সাজে, অপরের লাঠি বাজে।" "যাহার অধ্যাপনার যোগ্যতা আছে, সে অধ্যাপক হউক, যাহার নাই, সে স্বীয় যোগ্যতার অনুরূপ

অন্য ব্যবসায় অবলম্বন করুক"—এই প্রকার ব্যবস্থাই সমাজের পক্ষে হিতকর, এবং ইহাই জীবিত সমাজের লক্ষণ। "সকলে সকল কাজের যোগ্য নয়", এই স্থূল কথাটা ভুলিয়া গিয়াই ভারতবাসী এত দুর্গতি ভোগ করিতেছে।

(২) ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পক্ষে যাজন নিষিদ্ধ। ইহার অর্থ এই, যে বেদবিহিত উচ্চতম ধর্ম্মানুষ্ঠানে (অর্থাৎ যজ্ঞে) পুরোহিতরূপী মধ্যবর্ত্তী অপরিহার্য্য। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, যজ্ঞ করিতে পারে, করাইতে পারে না। ব্রাহ্মণেতর যে-ব্যক্তি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে চাহে, তাহাকে ব্রাহ্মণ ডাকিয়া যজ্ঞ সম্পাদন করাইতে হইবে। এই ব্যবস্থার ফলে ক্ষত্রিয় বৈশ্য উচ্চাঙ্গ ধর্ম্মক্রিয়ার সাক্ষাৎ অব্যবহিত অধিকারে বঞ্চিত রহিয়া গেল।

এই ব্যবস্থার সহিত আর একটি ব্যবস্থা একত্র প্রণিধান করা উচিত। তাহা এই যে, ক্ষত্রিয়বৈশ্যের পক্ষে দানগ্রহণ নিষিদ্ধ, একা ব্রাহ্মণ দানগ্রহণের অধিকারী। এই বিধানটাও ঘাতসহ নহে। যাহারা বৈষয়িক উন্নতির আকাঙ্ক্ষা বিসর্জ্জন দিয়া, জ্ঞানালোচনায় লিপ্ত থাকে, এবং সেজন্য দারিদ্র্যকে বরণ করিতে কুণ্ঠিত হয় না, তাহাদিগের গ্রাসাচ্ছাদনের ক্লেশ বিমোচন করা অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু এই কর্ত্তব্য জাতিবিশেষে আবদ্ধ থাকা বাঞ্ছনীয় নহে।

ধর্ম্মভেদের বিরুদ্ধে ক্ষত্রিয়গণের প্রতিবাদ

জ্ঞানচর্চ্চা ও ধর্ম্মসাধনের ভেদ ক্ষত্রিয়গণ সব সময়ে মাথা পাতিয়া গ্রহণ করেন নাই। উপনিষদের যুগে তাঁহারা দুরূহ ব্রহ্মবিদ্যার চর্চ্চা করিতেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে দেখিতে পাই, ব্রহ্মবিৎ যাজ্ঞবল্ক্য "সূক্ষ্মতত্ত্ব আলোচনা করিবার জন্য "সম্রাট্" জনকের নিকটে আগমন করিয়াছেন। (৪।১।১)। ছান্দোগ্যোপনিষদে লিখিত

আছে, প্রাচীনশাল প্রভৃতি পঞ্চ "মহাগৃহস্থ ও মহাশ্রোত্রিয়," "কে আমাদিগের আত্মা? ব্রহ্ম কি?" এই দুই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য জন্য প্রথমে উদ্দালক আরুণির নিকটে উপস্থিত হইলেন, এবং তিনি আপনাকে সদুত্তর দানে অসমর্থ জানিয়া জিজ্ঞাসুদিগকে রাজা অশ্বপতির নিকট প্রেরণ করিলেন। (৫।১১।১—৪)। বশিষ্ঠের সহিত কলহে পরাজিত হইয়া রাজা বিশ্বামিত্র তপস্যাবলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন, এই কাহিনী বিদ্যালয়ের বালকেরাও অবগত আছে; আদি কবি বাল্মীকি রামায়ণের আদিকাণ্ডে (৫২—৫৭ সর্গে) তাহা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিয়াছেন। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে, ব্রাহ্মণকুলের নিত্য জপ্য ঋগ্বেদের গায়ত্রী মন্ত্র এই বিশ্বামিত্রের রচনা। মহাভারতে ভীষ্ম বর্ণাশ্রমধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতে করিতে সহসা বলিয়া উঠিলেন,

যথা রাজন্ হস্তিপদে পদানি
সংলীয়ন্তে সর্ব্বসত্ত্বোদ্ভবানি
এবং ধর্ম্মান্ রাজধর্ম্মেষু সর্ব্বান্
সর্ব্বাবস্থা সম্প্রলীনান্ নিবোধ ॥
অল্পাশ্রয়ান অল্পফলান্ বদন্তি
ধর্ম্মান অন্যান্ ধর্ম্মবিদো মনুষ্যাঃ।
মহাশ্রয়ং বহুকল্যাণরূপং
ক্ষাত্রং ধর্ম্মং নেতরং প্রাহুরার্য্যাঃ ॥
শান্তি। ৬৩।২৫, ২৬ ॥

"হে রাজন্ যেমন হস্তীর পদচিহ্নে অপর সমুদায় জীবের পদচিহ্ন বিলীন হইয়া যায়, তেমনি, জানিও, রাজধর্ম্মে আর সকল ধর্ম্ম সর্ব্বদা বিলীন হইয়া রহিয়াছে। ধর্ম্মবিৎ লোকেরা অন্যান্য ধর্ম্মকে অল্পাশ্রয়

ও অল্পফলপ্রদ বলিয়া থাকেন ; পণ্ডিতগণ বলেন, ক্ষাত্রধর্ম্মই মহাশয় ও বহুকল্যাণের নিদান, অপর কোনও ধর্ম্ম নহে।”

ধর্ম্মবিভাগ ও বৃত্তিবিভাগ লইয়া যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ে পুনঃ পুনঃ বিরোধ ঘটিয়াছে, পরশুরামের উপাখ্যান তাহার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। তিনি একুশবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন, এই আখ্যায়িকাটী খাঁটি ঐতিহাসিক সত্য হউক বা না হউক, ইহাতে একটা উপচীয়মান দ্বন্দ্বের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ব্রাহ্মণেরা যে সকল সময়ে স্বীয় প্রাধান্য রক্ষা করিতে পারেন নাই, তাহারও প্রমাণ আছে। বুদ্ধের সমকালে ক্ষত্রিয় সামাজিক মর্য্যাদায় ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন, এবং চতুর্বর্ণ ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ বৈশ্য শূদ্র, এই পর্য্যায়ে উল্লিখিত হইত, সুত্রপিটক তাহার সাক্ষ্য দিতেছে।

শূদ্রের প্রতি ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধান

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ক্ষত্রিয় বৈশ্যের পক্ষে অহিতকর প্রতিপন্ন হইয়াছে তো বটেই, শূদ্রের পক্ষে উহা নিদারুণ অভিশাপে পরিণত হইয়াছে। দেশের একটা সংখ্যাবহুল শাখাকে—সংখ্যাবহুল বলি কেন, অধিকাংশ অধিবাসীকে—জ্ঞানে ধর্ম্মে বঞ্চিত করিয়া রাখা একটা ঘোরতর অপরাধ। ভারতবর্ষ চিরকাল এই পাপের দণ্ডভোগ করিয়া আসিতেছে।

আপনারা জ্ঞানধর্ম্মের অধিকার বিষয়ে ভারতীয় দাসজাতির সহিত অন্যান্য দেশের দাসগণের তুলনা করুন। গ্রীসে দাসগণ সর্ব্বপ্রধান জাতীয় পর্ব্ব অলুম্পিয়ার মহোৎসবে উপস্থিত থাকিতে পারিত ; এবং তাহারা গ্রীক জাতির শ্রেষ্ঠ অন্তরঙ্গ ধর্ম্মসাধন এলেয়ুসিসের গুপ্তপূজায় দীক্ষাগ্রহণের অধিকারী ছিল। আথেন্সের বালকেরা এক এক জন

দাসের সহিত গৃহ হইতে বিদ্যালয়ে ও বিদ্যালয় হইতে গৃহে যাইত ; আচারে ব্যবহারে এই “শিশুনায়কের” বাধ্য হইয়া চলা বালকগণের অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল। “গ্রীসে যত দেবদেবীর পূজা প্রচলিত ছিল, তাহার অধিকাংশই প্রকাশ্যে, সর্ব্বসাধারণের নয়নসমক্ষে নির্ব্বাহিত হইত।” (সোক্রাটীস, ১ম খণ্ড, ২৩৩ পৃ:)। রোমে দাসেরা আপন আপন প্রভুর গৃহে সকল প্রকার ধর্ম্মক্রিয়ার অংশভাক্ ছিল। কত কত দাস গৃহশিক্ষক ও চিকিৎসকের কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিত। আফ্রিকা-বাসী দাস টেরেন্স (Terence) দাসত্ব বিমোচনের পরে রোমের প্রধানপুরুষগণের গৃহে বন্ধুরূপে সমাদৃত হইতেন ; নাটক রচনা করিয়া তিনি রোমক সাহিত্যে অমর হইয়া রহিয়াছেন। এপিকৃটীটসের ন্যায় দাস তত্ত্বজ্ঞানের বিমল জ্যোতিঃ বিস্তার করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তির অধিকারী হইয়াছেন। আমেরিকার যে-যুগে শ্বেতকায় প্রভুরা দাসত্বে নিয়োজিত নিগ্রোদিগের প্রতি নৃশংস অত্যাচার করিত, সে যুগেও তাহারা ধর্ম্মাচরণ ও ধর্ম্মগ্রন্থপাঠ করিবার অধিকার হারায় নাই। আর ভারতবর্ষে দাসজাতির জন্য কি ব্যবস্থা প্রণীত হইয়াছিল, আপনারা তাহার স্থূলমর্ম্ম অবধারণ করুন।

শূদ্রজাতির জুগুপ্সিতশব্দযুক্ত অর্থাৎ নিন্দাবাচক নাম রাখিবে ; তাহার নামের শেষে কিঙ্করবোধক উপপদ থাকিবে। (মনু।২।৩১,৩২॥ শঙ্খ।২।৩॥)। শূদ্রের উপনয়নাদি সংস্কার নাই, অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞে অধিকার নাই—নাস্যাধিকারো ধর্ম্মেঽস্তি (মনু।১০।১২৬) ; বিবাহেও মন্ত্র নাই। শূদ্র যদি জপহোমাদি করে, তবে অত্রির আদেশ,

বধ্যো রাজ্ঞা স বৈ শূদ্রো জপহোমপরায়ণঃ।
ততো রাষ্ট্রস্য হন্তাসৌ যথা বহ্নেশ্চ বৈ জলম॥ ১৯॥

"যে শূদ্র জপ ও হোমে নিরত থাকিবে, রাজা তাহাকে বধ করিবেন, কেন না, জল যেমন অগ্নিকে বিনাশ করে, তেমনি ঐ শূদ্র রাষ্ট্রকে বিনষ্ট করে।" রামায়ণ-পাঠকেরা জানেন, এই অনুশাসন অনুসারে রামচন্দ্র শূদ্রমুনি শম্বূকের শিরশ্ছেদন করিয়াছিলেন।

গৌতমের ধর্ম্মসূত্রে বিধি আছে—

অথ হাস্য বেদমুপশৃণ্বতস্ত্রপুজতুভ্যাং শোত্রপ্রতিপূরণম্,
উদাহরণে জিহ্বাচ্ছেদো, ধারণে শরীরভেদঃ ॥১২।৪॥

"শূদ্র যদি (ইচ্ছাপূর্ব্বক) বেদ (-পাঠ) শ্রবণ করে, তবে সীসা ও গালা দ্বারা তাহার দুই কর্ণ পূর্ণ করিয়া দিতে হইবে; যদি বেদ উচ্চারণ করে, তবে তাহার জিহ্বা ছেদন করিতে হইবে; যদি বেদ (স্মৃতিতে) ধারণ করে, তবে তাহার শরীর দুই ভাগে কাটিয়া ফেলিতে হইবে।"

পরাশর বলেন,

বেদাক্ষর বিচারেণ শূদ্রস্য নরকং ধ্রুবম্ ॥১।৬৪॥
(পাঠান্তর—শূদ্রঃ পততি তৎক্ষণাৎ ॥)

"বেদাক্ষর বিচার করিলে শূদ্র নিশ্চয়ই নরকে পতিত হইবে।"
("তৎক্ষণাৎ পতিত হইবে।")

বৌদ্ধ, খৃষ্টীয় ও মুসলমানধর্ম্মের সহিত এস্থলে বৈদিক ধর্ম্মের কি বিষম ব্যবধান দেখা যাইতেছে! বুদ্ধ, ঈশা, মহম্মদ জাতিবর্ণের ভেদ অতিক্রম করিয়া বিশ্বমানবের জন্য মুক্তির বার্ত্তা প্রচার করিয়াছেন; তাঁহাদিগের অনুবর্ত্তীরা সমুদায় জগদ্বাসীকে স্বীয় স্বীয় ধর্ম্মের আশ্রয়ে আনয়ন করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া দেশে বিদেশে, সভ্য অসভ্য, উন্নত অনুন্নত, প্রবল দুর্ব্বল কত জাতির দ্বারে দ্বারে পরিভ্রমণ করিতেছেন; আর আমাদের শাস্ত্রকারেরা আপনার সমাজেরই একটী বিশাল শাখার

নিকটে জ্ঞানের দ্বার ধর্ম্মের দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। এমন অদ্ভুত ব্যবস্থা আর কোনও দেশে আছে কি?

সংহিতাসমূহে শূদ্রের প্রতি ব্রাহ্মণগণের কি অমানুষিক অবজ্ঞা ঘোষিত হইয়াছে, দণ্ডনীতিতে তাহাদিগের জন্য কি পক্ষপাত-দোষ-দুষ্ট নিষ্ঠুর দণ্ড ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, তাহা বর্ণনা করিবার সময় নাই; দুই একটী বাক্যই যথেষ্ট—

"ব্রাহ্মণ আশ্রিত শূদ্রের ভক্ষণের জন্য উচ্ছিষ্ট অন্ন, পরিধানের জন্য জীর্ণ বসন, শয়নের জন্য জীর্ণ শয্যা, এবং ধান্যের পুলাক প্রদান করিবেন।" (মনু।১০।১২৫)। মনে রাখিবেন,

শূদ্রান্নং শূদ্রসম্পর্কঃ শূদ্রেণৈব সহাসনম্।
শূদ্রাজ্ জ্ঞানাগমঃ কশ্চিজ্জ্বলন্তমপি পাতয়েৎ ॥
আপস্তম্ব। ৮।৮ ॥ পরাশর। ১২।৩২ ॥

"শূদ্রান্নভোজন, শূদ্রের সহিত সম্পর্ক, শূদ্রের সহিত একাসনে উপবেশন, শূদ্রের নিকটে জ্ঞানলাভ, (এ সকল) জ্বলন্ত (ব্রহ্মতেজে বিখ্যাত) পুরুষেরও পতনের কারণ হইয়া থাকে।"

জাতিভেদ

এইরূপে ধর্ম্মভেদ ও বৃত্তিভেদের উপরে যে জাতিভেদ প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহা অচিরে জন্মগত হইয়া পড়িল, গীতোক্ত গুণকর্ম্মবিভাগের পথে অগ্রসর হইল না। উপরে উদ্ধৃত শঙ্করের ভাষ্যটি পড়িলেই ইহা আপনারা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিবেন। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই তিন গুণানুসারে কর্ম্মের বিভাগ করিতে হইলে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও

শূদ্র, এই চারিটি সমাজকে সদাপ্রবহমান, পরিবর্ত্তনশীল ও নবীকরণ-যোগ্য করিয়া রাখিতে হইবে। ব্যবস্থা করিতে হইবে, যে যে-ব্যক্তি সত্ত্বপ্রধান, সে যে কুলেই জন্ম গ্রহণ করুক না কেন, সে ব্রাহ্মণ; সে শম, দম, তপস্যা, অধ্যয়ন, অধ্যাপন ইত্যাদি কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিবে। যে-ব্যক্তি সত্ত্বমিশ্রিত রজঃপ্রধান, সে যে কুলেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন, সে ক্ষত্রিয়; তাহার কর্ম্ম যুদ্ধ ও রাজ্য-পালন। যে-ব্যক্তি তমোমিশ্রিত রজঃপ্রধান, সে যে কুলেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন, সে বৈশ্য; তাহার কর্ম্ম কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি। যে-ব্যক্তি রজোমিশ্রিত তমঃপ্রধান, সে যে কুলেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন, সে শূদ্র; সেবাই তাহার কর্ম্ম। এই প্রকার গুণকর্ম্মবিভাগ সহজসাধ্য নহে; কেন না, এই বিভাগকে ফলপ্রদ করিতে হইলে সমাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির গুণ পরীক্ষা করিয়া পরে তাহার কর্ম্মের ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহা সম্ভবপর হউক বা না হউক, গুণবান্ ব্যক্তির নিম্নতর স্তর হইতে উচ্চতর স্তরে আরোহণ, এবং গুণহীন পুরুষের উচ্চতর স্তর হইতে নিম্নতর স্তরে অবরোহণ যদি হিন্দুসমাজে অবাধে প্রচলিত থাকিত, তবে ইহা বর্ত্তমান দুর্দ্দশা হইতে বাঁচিয়া যাইত। সত্ত্ব প্রভৃতি গুণ মানুষ উত্তরাধিকারসূত্রে নিশ্চয়ই লাভ করিবে, জগতে এমত কোনও অলঙ্ঘ্য বিধি নাই। সত্ত্বপ্রকৃতির পুত্র সত্ত্বপ্রকৃতি, ধার্ম্মিকের পুত্র ধার্ম্মিক, পণ্ডিতের পুত্র পণ্ডিত, বীরের পুত্র বীর হয় না, ইহা আমরা অহরহই দেখিতে পাইতেছি। তবে কেন ভারতীয় জাতিভেদ প্রস্তরীভূত হইল? কেন বিহিত হইল, জন্মবশঃতই ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের পুত্র ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের পুত্র বৈশ্য, শূদ্রের পুত্র শূদ্র হইবে? ঋগ্বেদের যুগে এ প্রকার ছিল না। একটি বৈদিক উপাখ্যান তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

একদা দর্ভের পুত্র রাজা রথবীতি যজ্ঞ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া অত্রি-বংশীয় অর্চ্চনানন্দকে হোতৃকার্য্যে বরণ করিলেন। অর্চ্চনানা পিতৃসমীপে রাজকুমারীকে দর্শন করিয়া স্বীয় পুত্র শ্যাবাশ্বের সহিত তাহার বিবাহ দিবার নিমিত্ত রাজার নিকটে প্রার্থনা করিলেন। রাজা তাহাতে সম্মত হইয়া রাণীর মত জিজ্ঞাসা করিলে রাণী এই প্রস্তাবে আপত্তি জানাইয়া বলিলেন, "আমাদিগের বংশে সকল কন্যারই ঋষিগণের সহিত বিবাহ হইয়াছে; শ্যাবাশ্ব ঋষি নহেন, সুতরাং তাঁহার সহিত আমাদিগের কন্যার বিবাহ হইতে পারে না।" এই আপত্তি উপস্থিত হওয়াতে রাজা শ্যাবাশ্বের সহিত রাজকুমারীর বিবাহ দিতে অসম্মত হইলেন। শ্যাবাশ্ব রাজকুমারীকে পাইবার আশায় কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়া পর্যটন করিতে করিতে মরুদ্‌গণের সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহাদিগের স্তব করিতে লাগিলেন, তাঁহারা তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ঋষি বলিয়া স্বীকার করিলেন; অতঃপর রথবীতি ও তাঁহার মহিষী শ্যাবাশ্বের সহিত রাজ-কুমারীর বিবাহ দিলেন। (ঋগ্বেদ, ৫ম মণ্ডল ৬১ সূক্তের ভাষ্যে সায়ণাচার্য্যের টীকা)।

পরবর্ত্তী যুগের ব্যবস্থা মতে অর্চ্চনানা ব্রাহ্মণ ও রথবীতি ক্ষত্রিয়; অথচ আখ্যায়িকাটি বলিয়া দিতেছে, ঋগ্বেদের কালে ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়ের ভেদ জন্মগত হইয়া পড়ে নাই। বুদ্ধের সময়েও জন্মগত জাতিভেদ সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। জন্মগত জাতিভেদ হইতেই ভারতে মহান্ অনর্থ উপস্থিত হইয়াছে।

বিদেশের কথা

গুণকর্ম্মবিভাগজনিত শ্রেণীবিভাগ প্রাচীনকালে, গ্রীসে, পারস্যে ও মিশরে ছিল, কোন না কোন আকারে এখনও সকল দেশেই আছে। কিন্তু কোন দেশেই উহা ঠিক ভারতীয় আকার ধারণ করে নাই।

গ্রীস

গ্রীসে (যেমন আথেন্সে) পূর্ণস্বত্ববান্ পুরবাসীরা জ্ঞানচর্চ্চা ও রাষ্ট্রের সেবাতে নিযুক্ত থাকিত; ইহারা যে দেশের ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়। তথায় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ে ভেদ ছিল না।

আথেন্সে এক শ্রেণীর প্রজা ছিল, তাহারা "প্রবাসী" বলিয়া অভিহিত হইত। ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া ধনোপার্জ্জনের উদ্দেশ্যে ইহারা বিদেশ হইতে আসিয়া তথায় বাস করিত। "প্রবাসীরা" গ্রীসের বৈশ্য। (সোক্রাটীস, ১ম খণ্ড, ৯৮ পৃঃ)।

গ্রীসে দাসত্বপ্রথা প্রচলিত ছিল। দাসগণ গ্রীসের শূদ্রজাতি। কিন্তু ভারতবর্ষের শূদ্রজাতির ন্যায় ইহারা জ্ঞানধর্ম্মের অধিকারে বঞ্চিত ছিল না।

পারস্য

প্রাচীন পারসীকেরা ভারতীয় আর্য্যগণের জ্ঞাতি। তাহারা (১) পুরোহিত, (২) যোদ্ধা, (৩) রাজকর্ম্মচারী এবং (৪) কৃষিজীবী ও শিল্পী, এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। কৃষকদিগের অবস্থা অপেক্ষাকৃত হীন ছিল, এবং পারস্যেও দাসত্বপ্রথা অবিদিত ছিল না। সুতরাং বলা যাইতে পারে, খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী হইতে সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত, সাসানীয় রাজগণের রাজত্বকালে পারস্যে যে-সমাজ বিধিবদ্ধ হয়, তাহাতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারিটী জাতি বর্ত্তমান ছিল। সেখানেও যজন, যাজন ও অধ্যাপনা এক পুরোহিত-শ্রেণীর করায়ত্ত ব্যবসায় ছিল। কিন্তু তথায় বৈশ্য শূদ্রের ক্ষত্রিয়পদবী লাভ দুরূহ হইলেও অসাধ্য ছিল না। এবং পারস্যকেও এই জাতিভেদের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছে। এই পাপেই একদা বহুবলনিলয়, বিপুল সাম্রাজ্যের

অধীশ্বর পারসীক জাতি খৃষ্টীয় ৬৪২ সনে নাহাবন্দের যুদ্ধক্ষেত্রে আরবগণের নিকটে পরাজিত হইয়া প্রথমে জাতীয় স্বাধীনতায় ও তৎপরে অচিরাৎ জাতীয় ধর্ম্মে বিসর্জ্জন দেয়।

মিশর

মিশর "স্বর্গের প্রতিমা, ধরণীর দেবমন্দির ও ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাভূমি" বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। সুতরাং "পুণ্যভূমি ভারতভূমির" সহিত তাহার তুলনা করিলে অন্যায় হইবে না। মিশরেও রাজা "মহতী দেবতা হ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি" (মনু। ৭।৮॥)—নররূপী মহতী দেবতা বলিয়া পূজিত হইতেন। ঈশাহী শকের ২৫০০ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত একা তিনিই দেবসন্নিধানে গমন করিবার, দেবগণের নিকটে কাম্যবস্তু প্রার্থনা করিবার ও দেহান্তে অমৃতত্ব সম্ভোগ করিবার অধিকারী ছিলেন। প্রাকৃত জন দেবতার নিকটে প্রার্থনা করিতে পারিত না, তাহাদিগের জন্য মৃত্যুর পরপারে অসীম শূন্যতা বই কিছুই অপেক্ষা করিত না। তখন শুধু ভূপতির উপরত আত্মার অন্তহীন বসতির উদ্দেশ্যে অবিনশ্বর সৌধসমূহ নির্ম্মিত হইত, শুধু তাঁহার পরিত্যক্ত দেহ বিকারাতীতরূপ ধারণ করিয়া সৌধে স্থান পাইত, কারণ কেবল তিনিই স্বর্গে যাইবার যোগ্য ছিলেন। তৎপরে রাজশক্তির প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে ভূস্বামী ধর্ম্মযাজক-সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইল। ক্রমশঃ খৃঃ পূঃ ২১৬০ হইতে ১৫৮০ সনের মধ্যে আপামরসাধারণ জাতিশ্রেণী-নির্ব্বিশেষে রাষ্ট্রীয় স্বত্ব ও ধর্ম্মাধিকার লাভ করিল। দেব অসিরিসের সংগ্রাম, মরণ, বিজয় ও পুনর্জন্মের মহোৎসব যেমন জনগণের অধিগম্য হইল, তেমনি নরপতি পুরোহিত একবাক্যে স্বীকার করিয়া লইলেন, যে তাহারাও অমৃতের অধিকারী, তাহাদিগের আত্মাও সুকৃতিগুণে স্বর্গে যাইতে পারে, তাহাদিগের দেহও মৃত্যুর পরে সযত্নে রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

তখন এই নীতি পরিগৃহীত হইল যে, রাজা দেশের সেবক এবং প্রজাগণ তাঁহার সমসেবক। তখন সমগ্র সমাজ—জাতিবর্গ, ধর্ম্মযাজকগণ, জনসাধারণ—স্ব স্ব শক্তি অনুসারে, প্রকৃত "গুণকর্ম্ম-বিভাগশঃ," পুরোহিত, প্রাড়্‌বিবাক, সৈনিক, কৃষক বা শিল্পীরূপে দেশের পরিচর্য্যায় ধর্ম্মকর্ম্মে আহূত হইল। এই প্রকারে খৃঃ পূঃ ২০০০ সনের পরে মিশরে জ্ঞানে ধর্ম্মে পরিপূর্ণ সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইল। সেখানে জন্মগত সামাজিক বৈষম্য কিংবা social castes বর্ত্তমান ছিল না; যে কেহ ইচ্ছা করিলেই কৌলিক বৃত্তি বা ব্যবসায় পরিবর্ত্তন করিতে পারিত।

ভারতীয় জাতিভেদ এই পথে অভিব্যক্ত হইলে উহা হইতে এ দেশের এমন অপরিসীম অকল্যাণ হইত না।

প্রতিপক্ষের আপত্তি

কেহ কেহ হয় তো এখানে দুইটী আপত্তি উত্থাপন করিবেন। তাঁহারা বলিবেন, (১) আর্য্য নৃপতিরা কি সত্য সত্যই বেদপাঠের অপরাধে শূদ্রের জিহ্বা ছেদন করিতেন? কিংবা বেদ শ্রবণ করিলে লাক্ষা বা সীসা দ্বারা তাহার কাণ বুজাইয়া দিতেন?

ভারতবর্ষে যখন আর্য্যগণের একাধিপত্য বর্ত্তমান ছিল, তখন রাজগণ ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশাসন অগ্রাহ্য করিয়া চলিতে চাহিতেন, বা চাহিলেও চলিতে পারিতেন, তাহা বোধ হয় না। সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের প্রধান সহায় ও সচিব কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বিবৃত করিয়া লিখিতেছেন,

স্বধর্মঃ স্বর্গায়ানন্ত্যায় চ। তস্যাতিক্রমে লোক
শঙ্করাদুচ্ছিদ্যতে—

তস্মাৎ স্বধর্ম ভূতানাং রাজা ন ব্যভিচারয়েৎ।
স্বধর্মং সংদধানো হি প্রেত্য চেহ চ নন্দতি॥

অর্থশাস্ত্র। ১।৩।১ ॥

স্বধর্ম্ম (অর্থাৎ প্রত্যেক বর্ণের পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্ম, যথা ব্রাহ্মণের অধ্যয়ন অধ্যাপন ইত্যাদি) স্বর্গ ও অনন্ত সুখের হেতু। স্বধর্ম্ম অতিক্রম করিলে লোক সকল ধর্ম্ম ও বর্ণের সংমিশ্রণ-বশতঃ উচ্ছিন্ন হইবে।—

"অতএব রাজা জনগণকে স্বধর্ম্মের ব্যভিচার করিতে দিবেন না। যে-ব্যক্তি স্বধর্ম্ম পালনে নিরত থাকে, সে ইহলোকে ও মরণান্তে আনন্দে বিহার করে।

কৌটিল্যের উক্তি হইতে এই সিদ্ধান্তই নিঃসৃত হইতেছে, যে ব্রাহ্মণগণ যতদিন আপনাদের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ ছিলেন, ততদিন শূদ্রেরা শাস্ত্রীয় বিধি লঙ্ঘন করিলে নিগৃহীত হইত। এ বিষয়ে ঐতিহাসিক প্রমাণও দুর্লভ নহে। যে কালে হিন্দু জাতির স্বাধীনতা-সূর্য্য রাহুগ্রস্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, সিন্ধুদেশে মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, গজনীর অধিপতি সুলতান মামুদ আগ্নেয়-গিরির গলিতধাতুস্রাবের মত পুনঃ পুনঃ উৎপতিত হইয়া পশ্চিম ভারতকে বিদ্রুত বিলুণ্ঠিত করিয়া শ্মশানসম করিয়া তুলিতেছেন, সেই কালে, খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে, ঐতিহাসিক অল্‌বেরুণি ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিয়া ও ভারতীয় সাহিত্যদর্শনে পারগামী হইয়া লিখিয়াছেন,

"বৈশ্য ও শূদ্র বেদ পাঠ করিবে, তাহা তো দূরের কথা, তাহারা বেদ শ্রবণ করিতেও পারে না। যদি কোনও বৈশ্য বা শূদ্র বেদ পাঠ করে, তবে ব্রাহ্মণেরা রাজার নিকটে যাইয়া তাহার

বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করে, রাজার আদেশে তাহার জিহ্বা ছেদন করিয়া ফেলা হয়।" (ভারত বিবরণ, ২২শ ও ৬৪তম অধ্যায়।)

ধর্ম্মশাস্ত্রে বৈশ্যের বেদপাঠের বিধি আছে। সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, মুসলমান কর্তৃক ভারতবিজয়ের প্রাক্কালে বৈশ্যেরা দ্বিজত্ব হইতে শূদ্রের দশায় অধঃপতিত হইয়াছিল।

তৎপরে প্রতিপক্ষ বলিতে পারেন, (২) পুরাকালে জাতিভেদ যে আকারই ধারণ করুক না কেন, এখন তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে; ফলতঃ মুসলমান রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে, বিশেষতঃ ইংরাজের আগমনাবধি, শাস্ত্রীয় অনুশাসন শাস্ত্রেই নিবদ্ধ রহিয়াছে, শূদ্র বেদ পাঠ করিলে জিহ্বা হারাইবে, ইহা এখন একটা অলীক উপাখ্যানের মত শুনাইতেছে। তবে জাতিভেদের প্রতি আক্রমণ কেন?

এই আপত্তির উত্তরে আমরা বলিতে চাই, যে জাতিভেদ এক্ষণে পূর্ব্বের আকারে নাই বটে, কিন্তু ইহার কুফল আমরা হাড়ে হাড়ে ভোগ করিতেছি। হিন্দুগণ যে আজিও ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারিতেছে না, তাহার কারণ কি? কারণ, জাতিভেদ। আজ যে ভারতের সর্ব্বত্র অবনত শ্রেণী বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছে, তাহার জন্য দায়ী কে? দায়ী অস্পৃশ্যতা নামক মহাব্যাধি। জগতে আর কোন সমাজ এই ব্যাধিতে পঙ্গু হইয়া রহিয়াছে? কোন্ দেশে কোটি কোটি নরনারী অবাধে রাজপথে চলিবার, দেবমন্দিরে প্রবেশ করিবার অপর বর্ণের সংস্পর্শে আসিবার অধিকারে বঞ্চিত রহিয়াছে? কোন দেশে মানুষের ছায়াতে মানুষের অঙ্গ অশুদ্ধ হয়, দৃষ্টিতে অন্ন অপবিত্র স্পর্শে ঐহিক পারত্রিক দুর্গতি ঘটে? বাস্তবিক অস্পৃশ্যতা নামক পদার্থটি ভারতের বাহিরে কোথাও নাই।

তারপর আপনারা অবনত শ্রেণীর দুরবস্থার কথা ভাবিয়া দেখুন। এদেশ এখনও নিবিড় অজ্ঞানান্ধকারে ডুবিয়া আছে। এই অন্ধকার ভদ্র সমাজ অপেক্ষা অবনত শ্রেণীর মধ্যে আরও গভীরতর। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারীদিগের নামের তালিকা পাঠ করুন। দেখিবেন, ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থের তুলনায় তথাকথিত নিম্নবর্ণের শিক্ষিত লোকের সংখ্যা কত অল্প। রাজনীতিক্ষেত্রে দেখুন, সমুদায় জাতীয় প্রতিষ্ঠান অদ্যাপি ব্রাহ্মণাদির দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। জাতীয় মহাসমিতির প্রথম সভাপতি স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া গত বৎসরের সভাপতি পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু পর্য্যন্ত হিন্দুসমাজজাত যত জন সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছেন। প্রাদেশিক ও ভারতীয় পরিষদে যাঁহারা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে নেতৃত্ব করিতেছেন; শিক্ষাক্ষেত্রে, ধর্ম্মপ্রচারে, লোকহিতব্রতে যাঁহারা নিযুক্ত রহিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে শূদ্রগণের স্থান বলিতে গেলে আজিও অপূর্ণ রহিয়াছে।

এ দেশে শিক্ষার অবস্থা কি শোচনীয়! জাপানের অধিবাসিগণের মধ্যে শতকরা এক জন নিরক্ষর; জর্ম্মণীতে বিগত যুদ্ধের পূর্ব্বে ছিল দশ হাজারে এক জন; ভারতবর্ষে শতকরা প্রায় ৮৯ জন অর্থাৎ দশ হাজারে প্রায় ৮৯০০ জন বর্ণজ্ঞানহীন। শিক্ষাহীনতার জন্য দোষী কে, তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু ইহাতে সন্দেহ নাই, যে এই উচ্চহারের জন্য প্রধানতঃ দায়ী শূদ্রজাতির আবহমানকালব্যাপী জ্ঞানচর্চ্চার অভাব। যাহারা বহু শতাব্দী ধরিয়া শিক্ষার অধিকার না পাইয়া অজ্ঞানতায় নিমগ্ন ছিল, তাহাদিগের বংশধরগণের মধ্যে শিক্ষা দ্রুতগতিতে প্রসার লাভ করিবে, ইহা কেহই আশা করিতে পারে না।

দ্বিতীয় প্রকরণ

নারীজাতির হীনাবস্থা

জ্ঞানচর্চ্চা ও ধর্ম্মসাধনের দ্বিতীয় প্রকারের ভেদ পুরুষ ও নারীতে। শাস্ত্রকারগণ নারী ও শূদ্রদিগকে এক পর্য্যায়ে স্থান দিয়াছেন। মনু বলিতেছেন,—

নাস্তি স্ত্রীণাং ক্রিয়া মন্ত্রৈরিতি ধর্ম্মোব্যবস্থিতঃ।
নিরিন্দ্রিয়া হ্যমন্ত্রাশ্চ স্ত্রিয়োঽনৃতমিতি স্থিতিঃ।৯।১৮॥

"স্ত্রীজাতির জাতকর্ম্মাদি নয়টী সংস্কার মন্ত্রদ্বারা সম্পন্ন হয় না, ধর্ম্মশাস্ত্রের ইহাই বিধি। স্মৃতি ও বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে ইহাদের অধিকার নাই, এবং কোন মন্ত্রেও ইহাদের অধিকার নাই—এইজন্য ইহারা অশুভ ও অপদার্থ।

গৌতমধর্ম্মসূত্রের ভাষ্যকার মস্করি গৃহ্যস্মৃতি হইতে নিম্নোক্ত বাক্যটী উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

সাঙ্গো বেদঃ স্ত্রীশূদ্রসকাশে নাধ্যেতব্যঃ।

"বেদ ও বেদাঙ্গ (শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ স্ত্রী এবং শূদ্রের সন্নিকটে পাঠ করিবে না।"

অত্রি সংহিতায় উক্ত হইয়াছে,—

জপস্তপস্তীর্থযাত্রা প্রব্রজ্যামন্ত্রসাধনম্।
দেবতারাধনঞ্চৈব স্ত্রীশূদ্রপতনানি ষট্॥ ১৩৫ ॥

"জপ, তপস্যা, তীর্থযাত্রা, সন্ন্যাস, মন্ত্রসাধন ও দেবতার আরাধনা, এই ছয়টী কর্ম্ম স্ত্রী ও শূদ্রের পতনের কারণ।"

জপ, তপঃ দেবপূজা, সকলই যদি নারীর পক্ষে নিষিদ্ধ, তবে

স্ত্রীজাতির ধর্ম্ম কি? বিষ্ণুসংহিতায় আপনারা এই জিজ্ঞাসার উত্তর পাইবেন—

অথ স্ত্রীণাং ধর্ম্মাঃ॥ ভর্ত্তুঃ সমানব্রতচারিত্বম্॥ শ্বশ্রূ-শ্বশুরগুরু-দেবতাথিপূজনম্॥ সুসংস্কৃতোপস্করতা॥ অমুক্তহস্ততা॥ সুগুপ্তভাণ্ডতা॥ মূলক্রিয়াস্বনভিরতিঃ॥ মঙ্গলাচারতৎপরতা॥ ভর্ত্তরি প্রবসিতেঽপ্রতিকর্ম্মক্রিয়া॥ পরগৃহেষ্বনভিগমনম্॥ দ্বারদেশগবাক্ষকেষ্বনবস্থানম্॥ সর্ব্বকর্ম্মস্বস্বতন্ত্রতা॥ বাল্যযৌবনবার্দ্ধক্যেষ্বপি পিতৃভর্ত্তৃপুত্রাধীনতা॥ মৃতে ভর্ত্তরি ব্রহ্মচর্য্যং তদন্বারোহণং বা॥ ২৫।১—১৪।

"অতঃপর স্ত্রীজাতির ধর্ম্ম কথিত হইতেছে। ভর্ত্তার সহিত সমান ব্রতাচরণ; শ্বশুর, শাশুড়ী, গুরুজন, দেবতা ও অতিথির পূজা; গৃহের দ্রব্যসামী পরিষ্কার করিয়া গুছাইয়া রাখা; ব্যয়ে মুক্ত হস্ত না হওয়া (অর্থাৎ অধিক ব্যয় না করা); ধনের ভাণ্ড সাবধানে গোপন করিয়া রাখা; বশীকরণাদি ক্রিয়াতে অরুচি; মঙ্গলাচারে তৎপরতা; স্বামী প্রবাসে থাকিলে বেশভূষা হইতে বিরত থাকা, এবং দরজায় বা জানালায় অবস্থিতি না করা; সকল কর্ম্মেই অস্বতন্ত্রতা বা পরাধীনতা, অর্থাৎ বাল্যে পিতার, যৌবনে স্বামীর ও বার্দ্ধক্যে পুত্রের বংশে বাস করা; এবং স্বামীর মৃত্যু হইলে ব্রহ্মচর্য্য পালন, অথবা স্বামীর পশ্চাৎ চিতায় আরোহণ—(এই সমুদায় স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম।")

অত্রি নারীর পক্ষে দেবতার পূজা নিষেধ করিয়া দিয়াছেন, বিষ্ণু তাহা করেন নাই। কিন্তু যে দেশে একদা বিশ্ববরা বেদমন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন, গার্গী, মৈত্রেয়ী, দুরূহ ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারিণী হইয়াছিলেন, লীলাবতী বীজগণিতের আলোচনা করিয়া যশোমন্দিরে স্থান পাইয়াছিলেন, সে দেশে নারীজাতির জন্য এই ব্যবস্থা। গৃহকর্ম্ম ও

স্বামীশ্বশ্রূশ্বশুরের সেবা স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য, সন্দেহ নাই; কিন্তু এগুলি ছাড়া তাহাদিগের আর কোনও কর্ত্তব্য নাই? তাহারা জ্ঞানলাভে বঞ্চিত থাকিবে, নিগূঢ় ধর্ম্ম সাধনের সন্ধান পাইবে না, ঈশ্বরকে জানিয়া ও তাঁহার আরাধনা করিয়া ঐহিক এবং পারত্রিক কল্যাণের পথে অগ্রসর হইবে না—অন্য কোনও দেশে কদাপি এমন সামাজিক ব্যবস্থা ছিল কি?

নারীজাতির প্রতি অবজ্ঞা ভারতীয় সভ্যতার দুরপনেয় কলঙ্ক। নারীগণের বর্ত্তমান হীনাবস্থা এই অবজ্ঞার ফল। মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে নারী-নিন্দা পাঠ করিতে করিতে এক এক সময়ে লজ্জায় মাথা হেঁট হয়। স্ত্রী উপবাস-ব্রত আচরণ করিলে স্বামী অল্পায়ু হয়, এমন কথা এ দেশের সংহিতায় কি করিয়া স্থান পাইল? (অত্রি ১৩৬॥ বিষ্ণু। ২৫। ১৬॥)। সত্য বটে উহাতে নারীর অনুকূল অনেক বাক্য আছে; কিন্তু সেই সকল বাক্য-সাম্যবাদ প্রসূত নহে; পুরুষের আরাম, সুখ ও শান্তি সেগুলির মুখ্য অভিপ্রায়। যে দেশে পিত্রাজ্ঞায় মাতৃবধ মহাকাব্যে অক্ষয়কীর্ত্তি লাভ করিয়াছে, সে দেশ নারীকে যথোচিত সম্মান করিত, ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। রামায়ণ ও মহাভারতের প্রধান দুই নায়িকার পরিকল্পনার মধ্যেই ভারতরমণীর হীনদশা ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। সীতার অগ্নিপরীক্ষা ও দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ সেই জাতির কবির নির্ম্মাণ-কৌশল হইতে কায়াপরিগ্রহ করিতে পারিয়াছে, যে জাতি আজিও নারীকে মর্য্যাদা দিতে শিখে নাই।

সীতার অগ্নিপরীক্ষা

বাল্মীকির রামায়ণে সীতার অগ্নিপরীক্ষার বর্ণনাটী প্রক্ষিপ্ত কি না, সে প্রশ্ন এখানে তুলিবার প্রয়োজন নাই। উহা যাঁহার কল্পনাপ্রসূত,

তিনি যে পুরুষ অপেক্ষা নারীকে হীনতর জীব বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, তাহাতে সংশয় নাই। তাহা না হইলে অগ্নিপরীক্ষার কথা তাঁহার মাথায় কি করিয়া প্রবেশ করিল? কবি বালকাণ্ডের শেষ সর্গে রাম-সীতার দাম্পত্য-প্রেমের যে মনোহর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, যুদ্ধকাণ্ডে তাহা না হয় ভুলিয়া গিয়াছেন; কিন্তু হনুমান্ তো লঙ্কায় সীতাকে দেখিয়া আসিয়া রামকে বলিয়াছিলেন,

রাবণান্তঃপুরে রুদ্ধা রাক্ষসীভিঃ সুরক্ষিতা।
একবেণীধরা দীনা ত্বয়ি চিন্তাপরায়ণা॥
অধঃশয্যা বিবর্ণাঙ্গী পদ্মিনীব হিমাগমে।
রাবণাদ্বিনিবৃত্তার্থা মর্ত্তব্যাকৃতনিশ্চয়া।
এবং ময়া মহাভাগ দৃষ্টা জনকনন্দিনী।
উগ্রেণ তপসা যুক্তা ত্বদ্ভক্ত্যা পুরুষর্ষভ॥

সুন্দর। ৬৪। ১৪, ১৫, ১৯॥

"হে মহাভাগ, পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম, আমি দেখিয়া আসিলাম, জনক নন্দিনী রাবণের অন্তঃপুরে রাক্ষসীগণের দ্বারা সুরক্ষিতা ও অবরুদ্ধা রহিয়াছেন; তিনি এক বেণী ধারণ করিয়া দীনবেশে তোমার চিন্তাতে নিমগ্না হইয়া ভূতলে শয়ন করিয়া আছেন; শীত ঋতুর আগমনে যেমন পদ্মিনী বিবর্ণ হয়, তেমনি তাঁহার অঙ্গ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে; রাবণের প্রতি তাঁহার চিত্ত বিমুখ; তিনি মরিতে কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন; এবং উগ্রতপস্যায় নিরতা ও তোমার প্রতি ভক্তিতে আপ্লুতা হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন।" ইহার পরেও সীতার উদ্ধার সাধন করিয়া রাম তাঁহাকে বলিতে পারিলেন, "আমি পৌরুষ প্রদর্শনপূর্ব্বক শত্রুকে বধ ও তোমাকে জয় করিয়া স্ত্রীহরণরূপ অবমানের প্রতিশোধ

লইয়াছি; তোমাতে এক্ষণে আমার প্রয়োজন নাই; তুমি লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, সুগ্রীব বা বিভীষণ, যাহাকে ইচ্ছা ভজনা কর, অথবা নিজের অভিরুচি অনুসারে যেখানে যাও চলিয়া যাও।" (যুদ্ধকাণ্ড, ১১৫ সর্গ)। এমন কুৎসিত কথা শুনিয়া পতিপ্রাণা সীতা যে অগ্নিতে প্রবেশ করিবেন, তাহা বিচিত্র নয়; কিন্তু ইহাতে রামের গৌরব বর্দ্ধিত হইয়াছে কি?

দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ

দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের ন্যায় একটা বীভৎস ব্যাপার জগতের আর কোনও মহাকাব্যে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। উহাও ভারতরমণীর হীন-দশা তারস্বরে ঘোষণা করিতেছে; কেননা, সমগ্র কাহিনীটির অন্তর্নিহিত তত্ত্ব এই যে, স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তি; স্বামী তাহাকে বন্ধক দিতে পারে—বাবীলোনিয়া ও আসীরিয়ায় যেমন পারিত—এবং অক্ষক্রীড়ায় তাহাকে পণ রাখিবারও তাহার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। এ বিষয়ে দ্রৌপদীর মনেও লেশমাত্র সন্দেহ ছিল না। যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে পণে ন্যস্ত করিয়া দ্যূতে পরাজিত হইলে দুর্য্যোধনের আদেশে প্রাতিকামী যখন তাঁহাকে অন্তঃপুর হইতে রাজসভায় আনয়ন করিতে গেল, তখন দ্রৌপদী প্রথমে বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "ক্রীড়ায় পণ রাখিবার জন্য তাঁহার কি অন্য ধন মিলিল না?" যখন শুনিলেন, যুধিষ্ঠির তাঁহাকেই পণ রাখিয়া হারিয়া গিয়াছে, তখন প্রাতীকামীকে বলিলেন,—

গচ্ছ ত্বং কিতবং গত্বা সভায়াং পৃচ্ছ সূতজ।
কিং নু পূর্ব্বং পরাজৈষীরাত্মানমথবা নু মাম্॥ সভা।৬৭।৭॥

"হে সূতপুত্র, তুমি যাও, দ্যূতস্থানে যাইয়া সভায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা

কর, যে তিনি অগ্রে তাঁহাকে কি আমাকে পণ রাখিয়া পরাজিত হইয়াছিলেন।" যুধিষ্ঠির এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলেন না। দুঃশাসন অস্পৃশ্যা জ্যেষ্ঠভ্রাতৃবধূকে কেশাকর্ষণ করিয়া সভাস্থলে লইয়া আসিয়া ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি মহাবীরগণের সমক্ষে তাঁহাকে বিবস্ত্রা করিতে উদ্যত হইল; দুর্য্যোধন কর্ণাদির নীচজনোচিত পরিহাস-বাক্যে তাঁহার হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হইতে লাগিল; লাঞ্ছনা ও অপমানে অধীর হইয়া তিনি কাতর বচনে বারংবার গুরুজনের শরণ ভিক্ষা করিলেন; কিন্তু এই নিগৃহীতা কুলবধূকে রক্ষা করিবার জন্য কেহই একটী অঙ্গুলী উত্তোলন করিলেন না। ভীষ্ম শুধু দ্রৌপদীর প্রশ্নটী লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,

ন ধর্ম্মসৌক্ষ্ম্যাৎ সুভগে বিবেক্তুং
শক্নোমি তে প্রশ্নমিমম্ যথাবৎ।
অস্বামাশক্তং পণিতুং পরস্বং
স্ত্রিয়াশ্চ ভর্ত্তুর্বশতাং সমীক্ষ্য॥ ঐ।৪৭॥

"হে সুভগে, তোমার জিজ্ঞাস্য বিষয়টী সূক্ষ্ম; স্বয়ং যে-ব্যক্তি পরাজিত হইয়া অপরের দাস হইয়াছে, সে অন্যের ধন পণ রাখিতে পারে না, অথচ স্ত্রী স্বামীর অধীন (সুতরাং দাসের ভার্য্যাও দাসী), ইহা পর্য্যালোচনা করিয়া আমি তোমার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতে সমর্থ হইতেছি না।" আপনারা দেখিতে পাইতেছেন, যুধিষ্ঠির যদি আপনাকে পণ রাখিবার পূর্ব্বে দ্রৌপদীকে পণ রাখিয়া হারিয়া যাইতেন, তবে কোন প্রশ্নই উঠিত না। "স্ত্রীর উপরে স্বামীর সম্পূর্ণ প্রভূতা আছে," ভীষ্ম এ কথাটা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়া দিয়াছেন।

মহাকবিগণের কল্পনায় নারীজাতির প্রতি যে অবজ্ঞা মূর্ত্তিমতী হইয়া উঠিয়াছে, তাহা আজিও ভারতীয় সমাজের অস্থিমজ্জায় অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছে। সভ্যতাসমুজ্জ্বল বিংশ শতাব্দীতেও নারীর সুখ-

স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি অবহেলা ঘরে ঘরে দেখিতে পাওয়া যায়। সম্পন্ন গৃহের গৃহিণীকেও দিনের পর দিন কতবার গ্রহবৈগুণ্যে অনাহারে থাকিতে হইতেছে; "তাঁহার দুবেলা আহার প্রায় ঘটিত না; কাজের গতিকে কোন কোন দিবস একবার আহারও ঘটিত না"; অথচ অনুরক্ত স্বামী আহারান্তে নির্ব্বিকার চিত্তে নিদ্রা যাইয়া আপনার কর্ত্তব্য পালন করিতেছেন, একটী বারও জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন বোধ করিতেছেন না যে, স্ত্রী মধ্যাহ্নে বা রাত্রিতে অন্নের মুখ দেখিয়াছেন কি না—এমন দৃষ্টান্ত যে বিরল নহে, স্বর্গীয়া রাসসুন্দরী প্রণীত "আমার জীবন" নামক পুস্তকে আপনারা তাহার প্রমাণ পাইবেন। এক ধনী ভূম্যধিকারীর ভ্রাতুষ্পুত্রের পুত্রবধূ কঠিন রোগ ভোগ করিয়া অকালে ভবলীলা সাঙ্গ করিল; লোকে বলিতে লাগিল, বধূটী অচিকিৎসায় মরিল। ইহা শুনিয়া ঐ ব্যক্তি আত্মসমর্থন করিবার আগ্রহে জনৈক প্রতিবেশীকে একদিন বলিলেন, "দেখ ঈশান, শত্রুরা আমার নামে কি মিথ্যা কথাই রটনা করিতেছে; তাহারা বলিয়া বেড়াইতেছে, আমি নাকি বৌর চিকিৎসা করাই নাই। তুমি আমার জমাখরচের খাতা দেখ, আমি ঔষধে কবিরাজে বৌর জন্য তিন টাকা ব্যয় করিয়াছি, তবু হতভাগারা আমার দুর্নাম প্রচার করে।" গল্পটা অনেক বৎসর পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম, হুবহু সত্য কি না, বলিতে পারি না; কিন্তু ঐ প্রকার মনোভাব প্রাচীন সমাজে অনেকেরই আছে। স্ত্রীলোকের রোগে যে সব সময়ে সমুচিত যত্ন ও চিকিৎসা হয় না, ইহা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারেন? ধাত্রীবিদ্যাবিশারদ এক অভিজ্ঞ চিকিৎসকের মুখে শুনিয়াছি, পল্লীগ্রামের তো কথাই নাই, বঙ্গের রাজধানীতেও প্রসূতিরা অযত্ন ও অন্ধসংস্কারবশে কি অকথ্য দুঃখ পায়। এই জন্যই তো কলিকাতায় ১৯২৬ সনে পুরুষের মৃত্যুর হার ছিল এক হাজারে ২৬·৮, আর স্ত্রীলোকের হাজার করা ৪৮·৩।

একজন চিন্তাশীল লেখক বলিয়াছেন, সভ্যতার কষ্টিপাথর নারীজাতির অবস্থা, নারীজাতির প্রতি পুরুষগণের ব্যবহার। এই কষ্টিপাথরে পরখ করিলে কি ভারতীয় সভ্যতাকে জগতে মহত্তম বলা যায়? অর্দ্ধসভ্য প্রাচীন জর্ম্মনীতে নারীর যে সম্মান, যে গৌরব ছিল, এদেশে আজও তাহা কল্পনার অতীত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে।

তৃতীয় প্রকরণ

সার্ব্ববর্ণিক ধর্ম্ম

এতক্ষণে আমরা মূল বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। বর্ণধর্ম্মের উপরে একটা সার্ব্ববর্ণিক ধর্ম্ম আছে, ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা তাহা জানিতেন। আমরা নিম্নে সংক্ষিপ্ততর বচন হইতে আরম্ভ করিয়া কতকগুলি বাক্য উদ্ধৃত করিতেছি।

গৌতমধর্ম্মসূত্রে বর্ণধর্ম্মবিবৃতির মধ্যে শূদ্রসম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে,

তস্যাপি সত্যমক্রোধঃ শৌচম্‌॥ ১০॥৫১॥

"সত্য, অক্রোধ, শৌচ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের ন্যায়) শূদ্রেরও ধর্ম্ম।"

শঙ্খসংহিতায় উক্ত হইয়াছে—

ক্ষমা সত্যং দমঃ শৌচং সর্ব্বেষামবিশেষতঃ॥১ ৫॥

"ক্ষমা, সত্য, ইন্দ্রিয়সংযম ও শৌচ, বর্ণনির্ব্বিশেষে সকলেরই ধর্ম্ম।"

বশিষ্ঠসংহিতায় আছে—

সর্ব্বেষাং সত্যমক্রোধো দানমহিংসা প্রজননঞ্চ ॥ ৪র্থ অধ্যায় ॥

"সত্য, অক্রোধ, দান, অহিংসা ও সন্তানোৎপাদন সকল বর্ণেরই ধর্ম্ম।"

কৌটিল্যের মতে,

সর্ব্বেষামহিংসা সত্যং (শৌচং) অনসূয়া আনৃশংস্যং ক্ষমা চ। অর্থশাস্ত্র ১।৩।১॥

"অহিংসা, সত্য, শৌচ, অসূয়াত্যাগ (অর্থাৎ পরের গুণে দোষারোপ না করা), নিষ্ঠুরতাপরিহার ও ক্ষমা—সাধারণ ধর্ম্ম।"

মনুর উপদেশ—

অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
এতং সামাসিকং ধর্ম্ম চাতুর্বর্ণ্যেঽব্রবীন্মনুঃ॥ ১০।৬৩॥

"অহিংসা, সত্য কথা বলা, চুরি না করা, শৌচ এবং ইন্দ্রিয়-সংযম—মনু সংক্ষেপে এই কয়টীকে চতুর্বর্ণের ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।"

যাজ্ঞবল্ক বলিতেছেন,

অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ
দানং দয়া দমঃ ক্ষান্তিঃ সর্ব্বেষাং ধর্ম্মসাধনম্॥ ১।১২২॥

"অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (চুরি না করা), শৌচ, বহিরিন্দ্রিয়নিগ্রহ, দান, দয়া, দম (অন্তরিন্দ্রিয়সংযম) এবং ক্ষমা (অপকারে চিত্তের অবিকারভাব) সকলেরই ধর্ম্মসাধন।"

শান্তিপর্ব্বে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া ভীষ্ম ভূমিকাস্বরূপ সার্ব্ববর্ণিক ধর্ম্মের সংজ্ঞা দিয়াছেন, যথা,

অক্রোধঃ সত্যবচনং সম্বিভাগঃ ক্ষমা তথা।
প্রজনঃ স্বেষু দারেষু শৌচমদ্রোহ এব চ।
আর্জ্জবং ভৃত্যভরণং নবৈতে সার্ব্ববর্ণিকাঃ॥ ৬০।৭,৮॥

"অক্রোধ, সত্য কথা বলা; সম্যক্‌রূপে অর্থবিভাগ, ক্ষমা, স্বীয় ভার্য্যায় সন্তানোৎপাদন, শৌচ, অহিংসা, সরলতা এবং ভৃত্যের ভরণ-পোষণ—এই নয়টী সার্ব্ববর্ণিক ধর্ম্ম।"

বিষ্ণুসংহিতায় সার্ব্ববর্ণিক ধর্ম্মের চৌদ্দটী লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে—

ক্ষমা সত্যং দমঃ শৌচং দানমিন্দ্রিয়সংযমঃ।
অহিংসা গুরুশুশ্রূষা তীর্থানুসরণং দয়া॥
আর্জ্জবং লোভশূন্যত্বং দেবব্রাহ্মণপূজনম্।
অনভ্যসূয়া চ তথা ধর্ম্মঃ সামান্য উচ্যতে॥২।৭,৮॥

"ক্ষমা, সত্য, দম, শৌচ, দান, ইন্দ্রিয়সংযম, অহিংসা, গুরুজনের শুশ্রূষা, তীর্থভ্রমণ, দয়া, সরলতা, লোভহীনতা, দেবব্রাহ্মণপূজা এবং অসূয়াপরিহার—এইগুলি সামান্য বা সার্ব্ববর্ণিক ধর্ম্ম বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।"

আপনারা লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন, যে দেবপূজা বিষয়ে এস্থলে অত্রসংহিতার সহিত বিরোধ ঘটিয়াছে। সে যাহা হউক, শেষোক্ত বাক্যের তীর্থভ্রমণ ও দেবব্রাহ্মণপূজা বর্জ্জন করিয়া সার্ব্ববর্ণিক ধর্ম্মের অপর সমুদায় অঙ্গই আমরা স্বীকার করিয়া লইতেছি।

গৌতমধর্ম্মসূত্রে সার্ব্ববর্ণিক ধর্ম্মের লক্ষণ তিনটী, মনু ও বশিষ্ঠের

মতে পাঁচটী; ভীষ্ম নয়টী এবং বিষ্ণু চৌদ্দটি লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছে। কিন্তু ধর্ম্মের উচ্চাঙ্গ সাধন বিষয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণের মধ্যে মতবৈষম্য নাই। সত্য, অক্রোধ, অহিংসা, দয়া, ক্ষমা, ইন্দ্রিয়সংযম, পবিত্রতা—এগুলি সর্ব্ববর্ণের সাধনীয়, ইহা সকলেই শিক্ষা দিতেছেন। এই ঐক্য শুধু ভারতের ধর্ম্মোপদেষ্টাদিগের মধ্যে নিবদ্ধ নহে; জগতের সকল মহাজনগণ এক্ষেত্রে তাঁহাদিগের সহিত একমত। বৌদ্ধ, খৃষ্টীয়, মুসলমান, সমুদায় ধর্ম্মেই অহিংসা, অক্রোধ, দয়া, ক্ষমা, সত্য, শুদ্ধতা প্রভৃতির সাধন উপদিষ্ট হইয়াছে। এই অর্থে সার্ব্ববর্ণিক ধর্ম্ম ভারতবর্ষে আচরিত হউক, আমরা ইহাই চাই।

কিন্তু আরও কিছু চাই। কেন না, এই সমস্ত গুণ একজন নাস্তিকেরও থাকিতে পারে, অনেক নিরীশ্বরবাদী বৌদ্ধ অরহতের ছিল। ধর্ম্মের মর্ম্মকথা পরমাত্মার সহিত মানবাত্মার সাক্ষাৎ অব্যবহিত সম্বন্ধ ও প্রেমের আদান প্রদান। অতএব এক নিরাকার অদ্বিতীয় ঈশ্বরের পূজা সার্ব্ববর্ণিক ধর্ম্মের প্রথম লক্ষণ। উপনিষদে ব্রহ্মের স্বরূপ ও সাধন বিষয়ে যে অমূল্য তত্ত্বসকল ব্যাখ্যাত হইয়াছে, রামমোহন রায়ের আবির্ভাবের পূর্ব্বে যাহা প্রায় বিস্মৃতিসাগরে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, যাহা ভারতের গৌরবময় যুগেও মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে আবদ্ধ ছিল, তাহা জাতিবর্ণ-পুরুষনারী-নির্ব্বিশেষে ধর্ম্মার্থীমাত্রেই শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন, ধ্যান ধারণা ও সমাধিযোগে সাধন করিবে, সার্ব্ববর্ণিক ধর্ম্মের এই আদর্শই বর্ত্তমানকালের উপযোগী। যাহা অন্যায়, অসত্য ও অসাম্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত, যাহা ভেদবুদ্ধি-প্রসূত, যাহা মানুষকে মানুষ বলিয়া শ্রদ্ধা করিতে শিক্ষা দেয় না, যাহা মানুষের পরিপূর্ণ সর্ব্বাঙ্গীন অভিব্যক্তিকে বাধা দেয়, তাহা বিষবৎ বর্জ্জনীয়। ঈশ্বর মানবজাতির পিতা, এবং মানবগণ পরস্পরের ভ্রাতা, ইহা যে ধর্ম্ম

স্বীকার করে না, তাহা কখনও সামান্য ধর্ম্মরূপে গৃহীত হইতে পারে না। সার্ব্ববর্ণিক ধর্ম্ম হইবে সাম্যবাদী। অসাম্যমূলক বর্ণাশ্রমধর্ম্ম হিন্দু জাতির মধ্যেই ঐক্য স্থাপন করিতে পারে নাই, প্রত্যুত দ্বিজে শূদ্রে বিরোধ ঘটাইয়া দেশময় অশান্তির আগুন জ্বালাইয়া রাখিয়াছে, উহা কি করিয়া হিন্দু মুসলমানে, শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গে মিলন স্থাপন করিবে? কি পরিতাপের বিষয়, ভারতের প্রাচীনতন্ত্রীরা আজিও আবৃত্তি করিতেছেন,

> ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
> উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥
>
> ঋগ্বেদ। ১০।৯০।১২॥

"ইহার (পুরুষের) মুখ ব্রাহ্মণ হইল; দুই বাহু রাজন্য হইল; যাহা দুই উরু ছিল, তাহা বৈশ্য হইল; দুই পদ হইতে শূদ্র উদ্ভূত হইল।"

ভুলিয়া যাও, এদেশের বিদ্যার্থী যুবকবৃন্দ, এই প্রক্ষিপ্ত বেদোক্তি; তোমরা দিবানিশা আবৃত্তি কর, ধ্যান কর, ললাটে ভূষণরূপে ধারণ কর এই ঋষিবাক্য—

> ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
> ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতম্॥
>
> শান্তিপর্ব্ব।১৮৮।১০॥

"বর্ণে বর্ণে প্রভেদ নাই; এই জগৎ সমস্তই ব্রহ্মময়; লোকসমূহ প্রথমে ব্রহ্ম দ্বারা সৃষ্ট হইয়া পরে কর্ম্মবশতঃ ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে পরিণত হইয়াছে।"

সহস্রধাবিভক্ত ভারতবাসীরা যদি বেদাতীত অনৈক্যবিষবর্জ্জিত

ঐক্যের মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে চাহে, তবে তাহাদিগকে ভেদবুদ্ধির অব্যর্থ প্রতিষেধ প্রেমের সন্ধানে প্রেমময়ের সাক্ষাৎকারের জন্য ব্যাকুল হইতে হইবে; মনে রাখিতে হইবে, প্রেম ভিন্ন মানুষের অন্তরে সাম্যবোধ জাগে না, জাগিলেও স্থায়িত্ব লাভ করে না। স্বার্থপ্রণোদিত প্রেমালিঙ্গনের মূলে যে কুটিল কপটতা প্রচ্ছন্ন থাকে, অন্ধজনকেও তাহা প্রবঞ্চিত করিতে পারে না। আমরা তাই বলিতেছি, সাম্যবাদ সার্ব্ববর্ণিক ধর্ম্মের দ্বিতীয় লক্ষণ।

সাধারণ ধর্ম্মের তৃতীয় লক্ষণ স্বাধীনতা। জ্ঞানচর্চ্চায় ধর্ম্মসাধনে; চিন্তায় বাক্যে কর্ম্মে; ব্যক্তিগত জীবনে, জাতীয় জীবনে স্বাধীনতা; ফুটিয়া উঠিবার, বড় হইবার, সর্ব্বাবয়ব সুন্দর হইবার স্বাধীনতা; পূজার স্বাধীনতা, বন্ধনমুক্ত হইবার স্বাধীনতা, ব্রহ্মপ্রকৃতি অনুকৃতির স্বাধীনতা; পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়া অন্তহীন বিকাশের পথে অবিচ্ছেদে অগ্রসর হইবার স্বাধীনতা—যে ধর্ম্ম মানবের এই প্রকার সর্ব্বতোগামিনী স্বাধীনতাকে সমাদর করিতে পরাঙ্মুখ, তাহা অশ্রদ্ধেয়, বর্ত্তমানকালের অনুপযোগী।

কিন্তু এ সকলই ব্যক্তিগত সাধনের কথা—ব্যক্তিগত সাধনই বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিশেষ প্রকৃতি। ইহা ব্যষ্টি ধরিয়া সমষ্টিকে ভুলিয়া গিয়াছে, প্রত্যগাত্মার মোক্ষের উপায় শিক্ষা দিতে গিয়া সমবেত সাধন, collective worship, উপেক্ষা করিয়াছে। তাই ভারতবাসী প্রায় দুই শতাব্দী কাল পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে বাস করিয়াও আধ্যাত্মিক স্বার্থপরতার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতেছে না; তাই আজিও অধিকাংশের চিত্তে দেশাত্মবোধ জাগ্রত হয় নাই। প্রাচীন সাহিত্যে ধর্ম্মের যে-সকল সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে, যে শিক্ষা-পদ্ধতি প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার কোথাও সামাজিক উপাসনার প্রসঙ্গ নাই,

স্বদেশের সেবা জনসাধারণের অবশ্য কর্ত্তব্য, এমত উপদেশ নাই। মনু ধর্ম্মের দশটী লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,

ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যাসত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্ ॥৬।৯২॥

"সন্তোষ, ক্ষমা, দম, অচৌর্য্য, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, সম্যক্ জ্ঞানলাভ, আত্মজ্ঞান, সত্য, অক্রোধ—ধর্ম্মের এই দশ লক্ষণ।"

তৈত্তিরীয় উপনিষদের শিক্ষাধ্যায়ে ব্রাহ্মণের জন্য একটী চমৎকার শিক্ষার আদর্শ অঙ্কিত হইয়াছে। উহাতে নানাবিধ উৎকৃষ্ট উপদেশ দিতে দিতে গুরু শিষ্যকে বলিতেছেন,

মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব, আচার্য্যদেবো ভব, অতিথিদেবো ভব।

"মাতাকে দেবতার ন্যায় পূজা কর, পিতাকে দেবতার ন্যায় পূজা কর, আচার্য্যকে দেবতার ন্যায় পূজা কর, অতিথিকে দেবতার ন্যায় পূজা কর।" কিন্তু তিনি এমন কথা বলেন নাই, "দেশমাতৃদেবো ভব—দেশমাতাকে দেবতার ন্যায় পূজা কর।" আমাদের দুইখানি বিপুলায়তন মহাকাব্যে, কালিদাস ভবভূতি প্রভৃতির নাটকে, ধর্ম্মসূত্রে, স্মৃতিশাস্ত্রে—কোনখানেই এই জাতীয় একটী উক্তিও আমাদিগের দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই, যাহাতে স্বদেশের পরিচর্য্যার প্রসঙ্গ আছে। ইলিয়াডে দেখিতে পাই, হেলেনার উদ্ধারের জন্য গ্রীকেরা যখন ট্রয় অবরোধ করিয়া শিবিরে বাস করিতেছিল, তখন জন্মভূমি হইতে দীর্ঘকাল দূরে অবস্থান করিয়া তাহারা এতই ক্লিষ্ট হইয়াছিল যে "পিতৃদেশ", patria gaia, এই শব্দটী উচ্চারণ করিতেই তাহাদিগের

চিত্ত ভাবাবেশে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। ঠিক তদনুরূপ অবস্থায়, লঙ্কার অবরোধকালে, রামায়ণের কবি রামলক্ষ্মণের মুখে অযোধ্যা সম্বন্ধে এই প্রকার আবেগময়ী বাণী আরোপ করেন নাই।

আথীনীয় যুবকেরা শিক্ষা সমাপন করিয়া শৈলোপরি দণ্ডায়মান হইয়া পুরী ও পুরীর দেবপ্রতিমার প্রতি চক্ষু রাখিয়া অস্ত্রশস্ত্র হস্তে লইয়া শপথ গ্রহণ করিত—

"আমি একাকী এবং সর্ব্বসাধারণের সহিত মিলিত হইয়া দেব-মন্দির ও স্বদেশের পবিত্র সম্পত্তির জন্য যুদ্ধ করিব। আমি আমার জন্মভূমিকে যেমন প্রাপ্ত হইয়াছি, তদপেক্ষা মহত্তর ও শ্রেষ্ঠতর করিয়া রাখিয়া যাইব, কদাপি তাহাকে হীনতর হইতে দিব না। আমি বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সমুদায় বিধি মানিয়া চলিব; যদি কেহ তাহা অমান্য বা রহিত করিতে প্রয়াস পায়, আমি একাকী কিংবা সর্ব্বসাধারণের সহিত মিলিত হইয়া তাহাকে দমন এবং বিধিসমূহকে রক্ষা করিতে প্রাণপণে সংগ্রাম করিব।" (সোক্রোটীস, ১ম খণ্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, সংক্ষিপ্তীকৃত)।

ভারতীয় শিক্ষাপদ্ধতিতে এই প্রকার কোনও ব্যবস্থা দেখিতে পাই না। আমরা সংঘবদ্ধ হইয়া দেশের কথা ভাবিতে এতই অপারগ, যে ইংরাজীতে civic virtue বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ করিতে গেলে অভিধান ঘাঁটিয়া আমাদিগকে হয়রাণ হইতে হয়। ভারতীয় সাধনপন্থার এই চিরাগত অভাব পূরণ করিতে হইবে। পূরণ করিবার প্রধান উপায়, এক সত্যস্বরূপ অখণ্ড অদ্বিতীয় পূর্ণ ব্রহ্মের সম্মিলিত আরাধনা। সম্ভূয় সাধন ভিন্ন সমষ্টিবোধের, দেশাত্মবোধের, জাতীয় ঐক্যবোধের উদ্বোধন অসম্ভব।

একটা জাতির মধ্যে collectivism বা ব্যষ্টিবোধ উন্মেষিত করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক একেশ্বরবাদ। বহুদেববাদ ঐক্য

সংস্থাপনের কি প্রবল পরিপন্থী, এদেশের শাক্তবৈষ্ণবের অনির্ব্বাপণীয় বিরোধ তাহার অন্যতম উদাহরণ। এই তত্ত্বটী নূতন নয়। ঈশাহী শকের চৌদ্দশত বৎসর পূর্ব্বে মিশরের অধিপতি আখেনাটেন ইহার গুরুত্ব অনুভব করিয়াই বহুদেববাদী মিশরবাসীদিগের মধ্যে একেশ্বর-বাদ প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মসংস্কারের লক্ষ্য ছিল এই যে, সাম্রাজ্যের প্রজাগণ স্বর্গে সবিতারূপী এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের পূজা করিবে, এবং ভূতলে তাঁহার প্রতিনিধি এক একচ্ছত্র ভূপতির অনুগত হইয়া চলিবে। এই অভিপ্রায় সুসিদ্ধ করিবার জন্য তৎকালে যে মনোহর সবিতার স্তব প্রচারিত হইয়াছিল, তাহার দুই এক ছত্র পাঠ করিতেছি—

"হে অদ্বিতীয়, তুলনারহিত পরমেশ্বর, তুমি দৃশ্য ও অদৃশ্য কত অসংখ্য পদার্থই সৃষ্টি করিয়াছ। তুমি মনুষ্য এবং গৃহপালিত ও বনচর পশুসমন্বিত এই ধরণী নিজের মনোমত করিয়া রচনা করিয়াছ; যাহা কিছু ধরাতলে বর্ত্তমান; যত জীব পদের সাহায্যে গমনাগমন করে, যত জীব পক্ষ বিস্তার করিয়া আকাশে বিচরণ করে; আমাদের এই দেশ, এবং কুশ, খারু প্রভৃতি বিদেশ—এ সকলই তোমার সৃষ্টি। তুমি ধন ও সম্পত্তি দিয়া প্রত্যেক মানুষকে স্ব স্ব স্থানে স্থাপন করিয়াছ; প্রত্যেকের কাম্য বস্তু বিধান করিতেছ; এবং ভাষায়, শব্দে, আকারে ও বর্ণে এক হইতে অপরের পার্থক্য সাধন করিয়া বৈদেশিক জাতিসমূহের মধ্যে বৈচিত্র্য সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছ।"

মধ্য যুগে ইয়ুরোপের পোপদিগেরও সমস্ত ধর্ম্মব্যবস্থার মূলে এই উদ্দেশ্য নিহিত ছিল, যে, খৃষ্টীয় জগৎ যেমন এক ঈশ্বরের উপাসনায় সম্মিলিত হইবে, তেমনি ঐহিক ও পারত্রিক সকল ব্যাপারে সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মাচার্য্য পোপের অধীনতা স্বীকার করিবে।

আমরা একনায়কত্বের পক্ষপাতী নই; আমরা গণতন্ত্র চাই। কিন্তু ভারতে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী জাতিসমূহকে রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টায় সম্মিলিত করিবার জন্য সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক ধর্ম্মবিরোধের অবসান। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম এই বিরোধের নিরসন করিতে কস্মিন্ কালেও সমর্থ হইবে না। সমগ্র হিন্দুজাতি ইসলাম গ্রহণ করিবে, অথবা সমুদায় হিন্দু-মুসলমান ঈশাপন্থী হইয়া যাইবে, সুদূর ভবিষ্যতের গহনতিমির মধ্যে সে আশার ক্ষীণতম রশ্মিও কোনও চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির নয়নকে স্পর্শ করিতেছে না। তবে ভারতের জাতীয় ঐক্যবন্ধনের সূত্র কোথায়? সূত্র একটী নয়—সূত্র শিক্ষা; সূত্র একসাম্রাজ্যে এক দণ্ডনীতির শাসনে একত্র সুখদুঃখভোগ; সূত্র রাষ্ট্রীয় সংগ্রামে ও গৃহের জীর্ণ-সংস্কারে মিলন। কিন্তু এ সকলের উপরে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সূত্র এক প্রাণে এক মনে এক হৃদয়ে এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের আরাধনা। এক দেশে বসতি করিলেও যাহাদিগের ধর্ম্ম এক নয়, বংশপ্রভাব এক নয়, বৈজিক ধারা এক নয়, আচার ব্যবহার এক নয়, হৃদয় মনের বিকাশ এক নয়; যাহাদিগের মধ্যে শিক্ষায় সভ্যতায়, আকাঙ্ক্ষায় প্রচেষ্টায় ভেদের অন্ত নাই; যাহারা সমগ্র ভারতবর্ষকে কোনও কালে স্বদেশ বলিয়া প্রীতি করিতে অভ্যস্ত হয় নাই, ভারতবর্ষ কথাটাই যাহাদিগের নিকটে আজিও একটা ভৌগোলিক নামের অস্ফুট ধ্বনি হইয়া রহিয়া গিয়াছে; যে দেশের বিদ্যালয়ে, কলকারখানায়, পথে ঘাটে, রেলষ্টিমারে, কথায় কথায় ধর্ম্মে ধর্ম্মে কলহ জন্মিয়া যায়, একটা অর্থনৈতিক বিরোধ মুহূর্ত্তে দাবাগ্নির মত জলিয়া উঠিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী দুইটী সমাজের রণরঙ্গিণী উদ্দাম তাণ্ডবলীলায় পরিণত হয়—সে দেশে সে দেশের অধিবাসীদিগের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের পথ, "ভাব সেই একে"—এই আহ্বান; "তোমরা উদার হও, সহিষ্ণু হও, প্রেমিক হও, এক প্রেমময় পিতার নামে মিলিত হও" এই আহ্বান; "যাহা কিছু ক্ষুদ্র, যাহা কিছু অধম, যাহা কিছু অপবিত্র তাহা পরিহার করিয়া সত্যস্বরূপ, মহতো মহীয়ান্ পরমেশ্বরের উপসনায় মিলিত হও", এই আহ্বান। এই আহ্বান ভারতবাসীর প্রাণ স্পর্শ করুক। ঋগ্বেদের ঋষি উচ্চ বর্ণের স্তবকর্ত্তাদিগকে লক্ষ্য করিয়া যে মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্ববর্ণের জপমন্ত্র হউক, গৃহে গৃহে অধীত হউক, অনৈক্যের স্থলে ঐক্য, ভেদের স্থলে অভেদ, বিরোধের স্থলে প্রেম, বিচ্ছিন্নতার স্থলে সংহতি আনয়ন করুক—

"তোমরা মিলিত হও, একত্র স্তব উচ্চারণ কর, তোমাদিগের মন পরস্পর একমত হউক।"

সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্ ॥১০।১৯১।২

জ্ঞানং সর্ব্বতো মার্গিতব্যম্

জ্ঞানং সর্ব্বতো মার্গিতব্যম্

অমরকীর্ত্তি শেক্‌স্‌পীয়ারের ‘Measure for Measure’ নাটকে উক্ত হইয়াছে—

O it is excellent
To have a giant's strength ; but it is tyrannous
To use it like a giant. II. 2.

“দানবের বল ধারণ করা খুবই ভাল ; কিন্তু সে বল দানবের ন্যায় ব্যবহার করিলে প্রকাশ পায় দুর্ব্বৃত্তের যথেচ্ছাচার।”

কবি এই উক্তিটীতে বলিতেছেন, মানুষের বিশেষত্ব উদ্ধত বাহুবলে নয়, তাহার অসামান্যতা দৈহিক বলের জ্ঞানানুগত প্রয়োগে। দানব ও ও মানবের পার্থক্য এইখানে—দানব বাহুবল অপেক্ষা মহত্তর বলিয়া কিছু জানে না ; মানব ক্রমবিকাশের উচ্চতর স্তরে উপনীত হইয়া জ্ঞানবলকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছে।

মানবের অভিব্যক্তি

নব্য বিজ্ঞান বলে, বিশ্বধারিণী পৃথিবীর বয়স প্রায় ২০০ কোটি বৎসর ; অনুমান ৩০ কোটি বৎসর পূর্ব্বে ধরাতলে জীবের আবির্ভাব হয় : তাহার লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে, ন্যূনাধিক তিন লক্ষ বৎসর হইল, ইহাতে মানবজাতি অভিব্যক্ত হইয়াছে। মানবের, অথবা মানব-

শান্তিপর্ব্ব। ৩১৮।৯২ “জ্ঞান সর্ব্বত্র অন্বেষণ করিবে।”

দেহের আদি জনক নগণ্য সামুদ্রিক জীব। সমগ্র প্রাণী-জগৎ এক-কোষ ও বহুকোষ, এই দুই ভাগে বিভক্ত। বহুকোষ প্রাণীর দুই শাখা—মেরুদণ্ডহীন ও মেরুদণ্ডবিশিষ্ট। দ্বিতীয় শাখা হইতে ক্রম-বিকাশের নিয়মানুসারে পর পর মৎস্য, সরীসৃপ, পক্ষী, পশু এবং এবং মনুষ্য প্রসূত হইয়াছে। বানর মানুষের নিকটতম পূর্ব্বপুরুষ। অবতারবাদের মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, এই পর্য্যায়ে ক্রম-বিকাশের আভাস আছে।

১৮৫৯ সনে ডারুইনের "বিভিন্ন শ্রেণীর জীবের উৎপত্তি" (Origin of Species) নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পরে পশ্চিম ভূখণ্ডে দারুণ উষ্মা ও বাগ্‌বিতণ্ডার উৎপত্তি হইয়াছিল, কিন্তু এখন গোঁড়া খৃষ্টানেরাও মানিয়া লইয়াছেন যে, মানুষ চতুষ্পদ জন্তু হইতে উদ্ভূত হইয়াছে।

এই পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিকেরা একমত। কিন্তু ঐকমত্য দেহ সম্বন্ধে, মানবের উচ্চতর বৃত্তি সম্বন্ধে নয়। ডারুইন বলেন, প্রেম, স্মৃতিশক্তি, মনোনিবেশ, অনুসন্ধিৎসা, অনুকরণ, বিচারবুদ্ধি প্রভৃতি যে সকল বৃত্তিকে আমরা মানবের বৈশিষ্ট্য বলিয়া বিবেচনা করি, তাহা ইতর প্রাণীর মধ্যেও কখনও অঙ্কুরাকারে, কখনও বিকশিত অবস্থায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। শুধু তাহাই নহে। পরার্থপরতারূপ যে গুণটি সমাজ-বন্ধনের মূলে বিদ্যমান, এবং যাহা হইতে ধর্ম্মনীতি নিঃসৃত হইয়াছে, মানবেতর জীবের মধ্যেও তাহার প্রভাব নিরন্তর কার্য্য করিতেছে। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে, দেহ ও মন, উভয়ের বিকাশ বিষয়েই মানুষ গরিলা, শিম্পাঞ্জি প্রভৃতি পশুর উত্তরাধিকারী।

অভিব্যক্তিবাদ প্রচারে ডারুইনের সহযোগী ওয়ালেস (Alfred Russel Wallace) এই মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি বলেন, পৃথিবীর ইতিহাসে তিনটী অধ্যায় আমাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। প্রথম অধ্যায়ে আমরা দেখিতে পাই, পৃথিবী একটী জড়পিণ্ড; প্রথমে উহা বাষ্পরাশি ছিল, তৎপরে জলময় হইল; এবং পরিশেষে জল স্থলে বিভক্ত হইয়া ধরণী, বসুন্ধরা প্রভৃতি নামের সার্থকতা লাভ করিল। দ্বিতীয় অধ্যায় অত্যাশ্চর্য্য। একদা কোন নিগূঢ় উৎস হইতে এই জড়পিণ্ডে চৈতন্য ফুটিয়া উঠিল; এবং সেই চৈতন্য জীব ও উদ্ভিদ্, এই দুই ধারায় প্রবাহিত হইয়া জল, স্থল ও বায়ুমণ্ডল পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিল; জীবন-বৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গে সংজ্ঞা জাগিল, সুখদুঃখবোধ আসিল। তৃতীয় অধ্যায় আরও বিস্ময়কর। ইহাতে মানবের জ্ঞান ও ধর্ম্মের বিকাশ দেদীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে। যেখানে শুধু সংজ্ঞা ছিল, সেখানে আত্মজ্ঞান, ব্যক্তিত্ববোধ বিকশিত হইয়াছে। মানুষ জানিয়াছে, সে কেবল দেহ নয়, সে দেহ ও আত্মার ঘাত প্রতিঘাত ও সমবায়ের ফল। ক্রমে জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্বন্ধ তাহার চিত্তে প্রতিফলিত হইল। মনুষ্য যাহার বলে মনুষ্য নামের যোগ্য হইয়াছে। ললিত কলায় অনুরাগ, সত্যানুসন্ধানে অক্লান্ত উৎসাহ, স্বদেশপ্রীতি, ভগবদ্‌ভক্তি প্রভৃতি যাহা কিছু মানবের বৈশিষ্ট্য ঘোষণা করে, তাহার বীজ অণুপরিমাণেও ইতর জীব হইতে মানুষের অন্তরে উপ্ত হইয়াছিল, ইহা কিছুতেই স্বীকার করা যায় না।

আদিম মানব

এই দুই মহারথীর মতবিরোধের সামঞ্জস্য করিবার দুশ্চেষ্টায় আমি শক্তি ও সময়ের অপব্যবহার করিতে চাহি না। কিন্তু এইটুকু মানিয়া লইতে দ্বিধা নাই, যে আদিম মানব ও তাহার অব্যবহিত নীচের সোপানের ইতর জীবের মধ্যে ব্যবধান অধিক ছিল না।

প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পুর্ব্বে গ্রীক কবি ইস্কিলাস "পাশবদ্ধ প্রমীথেয়ুস" নামক গীতিনাট্যে অনুপম ভাষায় আদিম মানবের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন। প্রমীথেয়ুস বলিতেছেন—"মানুষের চক্ষু ছিল, কিন্তু তাহারা বৃথাই দর্শন করিত; কর্ণে শুনিত বটে, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিত না। তাহারা আজীবন স্বপ্নদৃষ্ট ছায়াশরীরীর ন্যায় লক্ষ্যহারা হইয়া কাজ করিয়া যাইত। তাহারা ইষ্টকের দ্বারা সূর্য্যের দিকে মুখ রাখিয়া গৃহ নির্ম্মাণ করিতে জানিত না; দারুশিল্পীর কাজও জানিত না। প্রত্যুত তাহারা পিপীলিকাপুঞ্জের মত মৃত্তিকার নিম্নে অন্ধকার গহ্বরে বাস করিত। তাহারা শীত, বসন্ত ও গ্রীষ্ম ঋতুর বিভিন্ন লক্ষণ বুঝিতে পারিত না, সর্ব্বত্রই বিচারবুদ্ধিবিরহিত হইয়া চলিত; আমিই তাহাদিগকে তারারাজির উদয়াস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিতে শিক্ষা দিলাম। রোগে আক্রান্ত হইলে তাহাদিগের কোনও প্রতীকার ছিল না; না ছিল আরোগ্যপ্রদ পথ্য, না ছিল অনুলেপ, বা পেয় ঔষধ। যতদিন না আমি তাহাদিগকে আরামদায়ক ঔষধ প্রস্তুত করিতে শিখাইলাম, ততদিন তাহারা ব্যাধিতে ক্ষয় প্রাপ্ত হইত; এখন তাহারা ঔষধের গুণে রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে।" এইরূপে প্রমীথেয়ুস মানবজাতিকে একে একে সংখ্যাগণনা, বর্ণমালা, সঙ্গীতবিদ্যা, ভারবাহী পশুপালন, শকটের জন্য অশ্ববশীকরণ, নৌনির্ম্মাণ, স্বর্ণরৌপ্যাদি ধাতুর ব্যবহার ভবিষ্যদ্গণনার সঙ্কেত প্রভৃতি সমগ্র অত্যাবশ্যক জ্ঞান দান করিলেন। "ফলতঃ মানবের সমস্ত শিল্পকলা প্রমীথেয়ুস হইতেই আসিয়াছে।"

প্রমীথেয়ুস মর্ত্ত্য মনুষ্যের জন্য অমরাবতী হইতে অগ্নি আনয়ন করিয়াছিলেন। কবি আদিমানবের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে অগ্নিব্যবহারের পূর্ব্বকার অবস্থা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

মানুষ যতদিন জীবনযাত্রা নির্ব্বাহে অগ্নির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারে নাই, ততদিন সে পশু হইতে অধিক দূরে অগ্রসর হয় নাই। অগ্নির প্রচলনই সভ্যতার বিকাশে যুগযুগান্তব্যাপী ও উত্তরোত্তর প্রবর্দ্ধমান বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছে। এক সুধী ঠিক কথাই বলিয়াছেন —মানবজাতির ইতিহাসে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার অগ্নির, দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার অক্ষরের।

একটা প্রশ্ন

এখানে একটা প্রশ্ন উঠিতেছে। আমরা যদি ধরিয়া লই যে, মানুষ তিন লক্ষ বৎসর হইল ভূতলে আবির্ভূত হইয়াছে, তবে তাহার ইতিহাস এত স্বল্পপরিসর কেন? ঐতিহাসিক গবেষণা আজ পর্য্যন্ত অতীতের নিবিড় অন্ধকার ঠেলিয়া বড় জোর দশ হাজার বৎসরের সভ্যতার উপরে কখনও উজ্জ্বল, কখনও বা অতি অস্ফুট আলোকপাত করিয়াছে। তাহার পশ্চাতে মানবজাতির লক্ষ বৎসরের ঐতিহ্য কোথায়? এই জিজ্ঞাসার একটী মাত্র উত্তর মনে উদিত হইতেছে। আমাদের এই ধরণীতে যুগে যুগে মহা মহা প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় সংঘটিত হইয়াছে। একদা উত্তর ইয়ুরোপ ও উত্তর আমেরিকা স্থলযোগে যুক্ত ছিল। একদা দক্ষিণ আমেরিকা হইতে আফ্রিকা ও ভারতবর্ষ লইয়া অষ্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত এক মহাদেশ বর্ত্তমান ছিল। নিরবধিকাল আজ এই ভূখণ্ডগুলিকে অতল জলে নিমজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। আবার নগাধিরাজ হিমালয় "পূর্ব্বাপরৌ তোয়নিধীবগাহ্য স্থিতঃ পৃথীব্যা ইব মানদণ্ডঃ", পূর্ব্ব ও পশ্চিম সাগরে অবগাহন করিয়া যেন পৃথিবীর মানদণ্ডরূপে অবস্থান করিতেছেন বটে, কিন্তু হিমালয়, আল্‌প্‌স্‌; আণ্ডিজ প্রভৃতি গিরিরাজগণ সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়াই অম্বরচুম্বিত, শুভ্রতুষার-

কিরিট শৃঙ্গবৃন্দ লইয়া অধুনা দণ্ডায়মান রহিয়াছে। কত কত দেশ বারংবার সাগরগর্ভে অন্তর্হিত হইয়াছে, আবার বহু শতাব্দী অন্তে অতল জলের ঘোর অন্ধকার হইতে পৃথ্বীপ্রসবিতা সবিতার আলোক-রাজ্যে অভ্যুত্থিত হইয়াছে। তখন কালক্রমে এই সকল দেশ নিবিড় বনরাজির শ্যামল শোভায় মণ্ডিত হইয়াছে, অগণ্য জীবের কলরবে মুখর হইয়া উঠিয়াছে। জীবন ও মরণের, সৃষ্টি ও প্রলয়ের এই লীলার চিহ্ন পৃথিবী অদ্যাপি বক্ষে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে। ইয়ুরোপে এক কালে অনেক বর্ব্বর জাতি বাস করিত; তাহারা ফ্রান্সে বল্গা-হরিণ শিকার করিত; অতিকায় রোমশ হস্তী ও কেশরী বন্য বৃষ তাহাদের সুপরিচিত প্রতিবেশী ছিল। তাহারা কত প্রাচীন, কেহ বলিতে পারে না; গ্রীক ও রোমানেরা তাহাদের সংবাদ পায় নাই। যে আর্য্যগণের কণ্ঠ হইতে ভারতের তপোবনে প্রথম সামরব ধ্বনিত হইয়াছিল, যাহারা অতি পুরাতন চীন, আসীরিয়া ও মিসরের সভ্যতার পত্তন করিয়াছিল, ইহারা সকলেই প্রাগ্‌ঐতিহাসিক যুগের ঐ সকল বর্ব্বর জাতির তুলনায় অর্ব্বাচীন।

দ্বিতীয় প্রশ্ন

মানবের যুগযুগবাহী জ্ঞানোন্নতির প্রবাহ কেন যে সহস্র সহস্র বৎসর অন্তঃসলিলা ফল্গু নদীর মত অদৃশ্য থাকিয়া মোটে অযুত বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশমান হইল, তাহা যেমন দুর্ব্বোধ্য, তেমনি ইহার আর একটা দিক্‌ও আমাদিগের নিকটে প্রহেলিকা বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ঐতিহাসিক কালের জ্ঞানধারা পূর্ব্বাপর সমবেগে অগ্রসর ও প্রসারিত হয় নাই কেন? তিমিরাচ্ছন্ন সুদূর অতীতের কথা নাই বলিলাম। কি প্রাচ্যে, কি প্রতীচ্যে সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই, যেন

জ্ঞানসাধনে সিদ্ধি ও অসিদ্ধি, দ্রুতগতি ও মন্থরগতি, আলোক ও অন্ধকার, সত্যযুগ ও কলিযুগ, দিবারজনীর মত পরস্পরের অনুসরণ করিতেছে। ভারতের চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য, গ্রীসের পেরিক্লীস, রোমের অগষ্টাস, ফ্রান্সের চতুর্দ্দশ লুই, ইংলণ্ডের এলিজাবেথ—ইহাদের কাল তৎ তৎ দেশে স্বর্ণ-যুগ নামে খ্যাত। সেই সেই যুগের ভাস্বর জ্ঞানপ্রভার তুলনায় পূর্ব্ববর্তী ও পরবর্ত্তী যুগ যেন নিশীথ যামিনীর ঘনান্ধকার। উন্নতি ও অবনতি, গতিবেগ ও শ্লথতা—এই ছন্দঃ (rhythm) জগতের স্বাভাবিক নিয়ম; ধর্ম্ম, সমাজ, রাষ্ট্রনীতি, জ্ঞানবিজ্ঞান, কোনটাই এই নিয়মের বহির্ভূত নহে। কিন্তু সমস্যাটীর ইহাতেই মীমাংসা হইতেছে না। অনুন্নত তিমিরমগ্ন ভারতের কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। ধরিত্রীর অধিনায়ক শ্বেতাঙ্গ-জাতিদিগের জ্ঞানবিজ্ঞানের ইতিহাসে কি দেখিতে পাই? অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত ১৮০০ বৎসরে ইয়ুরোপ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যতদূর অগ্রসর হইয়াছিল, পরবর্ত্তী কিঞ্চিদধিক এক শতাব্দীর তুলনায় তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর। জ্যোতিষের বয়স তিন হাজার বৎসর হইলেও উহার শ্রেষ্ঠ বাহন দূরবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহৃত হইল মোটে তিন শত বৎসর পূর্ব্বে গ্যালিলেওর দ্বারা সপ্তদশ শতাব্দীতে। কিন্তু গালিলেওর দূরবীন বিংশ শতাব্দীর লিক্ বা উইলসন মানমন্দিরের দূরবীনের কাছে শিশুর ক্রীড়নকের মত। যে তারার আলোক পনর কোটি বৎসর পূর্ব্বে যাত্রা করিয়াও সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল পশ্চাতে রাখিয়া আজ পৃথিবীতে পঁহুছিল, তাহাও নবীন দূরবীনে ধরা দিয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জ্যোতির্ব্বিদেরা শুধু চক্ষুর সাহায্যে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর অয়ন ও উদয়াস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিতেন; এখনকার বৈজ্ঞানিকেরা নানা প্রকার যন্ত্রের সাহায্যে লক্ষ লক্ষ

আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত তারাগণের পরিধি, ভার, বর্ণ, গতি, উপাদান ও আভ্যন্তরীণ উত্তাপ নির্দ্ধারণ করিতেছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে পারিসের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা দিত, পৃথিবী নিশ্চলা, সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডলী তাহাকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। অত্যগ্রসর মার্কিণ জাতির শ্রেষ্ঠ দুই বিশ্ববিদ্যালয় হার্ভার্ড ও ইয়েল, পৃথিবী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে ও সূর্য্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে, নিরপেক্ষভাবে এই দুই মতই প্রচার করিত। স্যার জেম্‌স্ জীন্‌স্ (Sir James Jeans) এই জন্যই বলিয়াছেন,—মানবজাতি ধরাতলে যত কাল বসতি করিতেছে, তাহার সহিত তুলনা করিলে বলিতে হইবে, জ্ঞানচর্চ্চা সবে গত কল্য আরম্ভ হইয়াছে।

মানব তিন সহস্র বৎসরে বিজ্ঞানের অনুশীলনে কতটুকু সাফল্য লাভ করিয়াছিল সে আলোচনা রাখিয়া দিয়া যদি ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর তুলনা করি, তবে দেখিতে পাই, জ্যোতিষ, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, রসায়ন, ভূবিদ্যা, উদ্ভিদবিচার প্রভৃতি সকল বিভাগেই যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। শাস্ত্রশাসিত জ্যোতিষ বলিত, পৃথিবী ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র, মানব তাহার শিরোভূষণ। ঊনবিংশ শতাব্দীর পাশমুক্ত জ্যোতিষ বলিত, "নভোমণ্ডলে ঐ যে অগণন তারা দেখিতেছ, উহারা এক একটী সূর্য্য; প্রত্যেকটীরই আমাদের সূর্য্যের ন্যায় গ্রহ আছে, এবং সেই সকল গ্রহের কোন না কোনটী মানবের বা মানবসদৃশ জীবের বাসভূমি।" বিংশ শতাব্দীর জ্যোতিষ বলিতেছে, "আমাদের এই মেদিনীর মত গ্রহ বিশ্বভুবনে সুলভ নয়; লক্ষের মধ্যে একটী তারারও গ্রহ আছে কি না, সন্দেহের বিষয়; জীবসৃষ্টি প্রকৃতির অমোঘ বিধি নয়, অবিচল অভিপ্রায়ও নহে। সুতরাং এই পৃথিবীর মত গ্রহ ও মানবের ন্যায় বুদ্ধিজীবী প্রাণী জগতে আর নাই, থাকিলেও খুব অল্পই আছে।"

ঊনবিংশ শতাব্দীর জ্যোতিষ বলিত, বিশ্ব অনন্ত ও অসীম। বিংশ শতাব্দীর জ্যোতিষ সিদ্ধান্ত করিয়াছে, বিশ্বের অন্ত আছে, যদিও সীমা নাই (finite, but unbounded)। বিংশ শতাব্দীর প্রাকৃতিক বিজ্ঞান পরমাণুবাদ উড়াইয়া দিয়া নিরাকার অনুমানলব্ধ প্রোটন্, ইলেক্‌ট্রন্, নিয়ুট্রন ইত্যাদি লইয়া সৃষ্টিরহস্য উদ্ঘাটন করিবার প্রয়াস পাইতেছে। রসায়ন নূতন নূতন মৌলিক উপাদান আবিষ্কার করিতেছে। নব্য বৈজ্ঞানিকেরা এক ভূতকে অপর ভূতে রূপান্তরিত করিয়া অলৌকিক ক্রিয়াকে বাস্তব বলিয়া দেখাইয়া দিতেছেন। ভূবিদ্যা পর্ব্বত গাত্রে, নদ-নদী-জলপ্রপাতে, ভূগহ্বরে, অগাধ সাগরতলে অগণিত চিহ্ন ধরিয়া এবং লক্ষবৎসরসঞ্চিত জীব ও উদ্ভিদের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল পরীক্ষা করিয়া ধরণীর বিগত ইতিহাসের এক একটী বিস্ময়কর অধ্যায় রচনা করিতেছে। ওষধি-বনস্পতি-বিজ্ঞানে আমাদের জগদীশচন্দ্র উপনিষদুক্ত সেই একের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হইয়া জীবে ও উদ্ভিদে এক অখণ্ড চৈতন্যের লীলা চর্ম্মচক্ষুর গোচর করিবার উদ্দেশ্যে আমরণ তপস্যা করিয়া গিয়াছেন।

বিজ্ঞানের দুই দিক্—(২) ব্যাবহারিক

বিজ্ঞানের একটা দিক্ তাত্ত্বিক, আর একটা ব্যবহারিক। ব্যবহারিক দিকের আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই চিকিৎসা-শাস্ত্রের কথা মনে পড়ে। এক্ষেত্রে কতকগুলি ক্লেশনিবারক ও আরোগ্যপ্রদ আবিষ্কার হইয়াছে ঊনবিংশ শতাব্দে। এতকাল অস্ত্রোপচার একটা ভয়াবহ ব্যাপার ছিল। ১৮৪৭ সনে সিম্প্‌সন ক্লোরোফর্ম আবিষ্কার করিয়া রোগীর ভয় ভাঙ্গিয়া দিলেন। তৎপরে ১৮৭০ সন হইতে লিষ্টারের antiseptic বা পুঁজনিবারক ব্যবস্থা ক্ষত

হইতে আরোগ্যলাভ সুগম করিয়া তুলিল। ঐ শতাব্দীর শেষ যামে পাস্তুর জলাতঙ্ক, ডিফ্‌থীরিয়া প্রভৃতি মারাত্মক ব্যাধির প্রতিষেধক ঔষধ আবিষ্কার করিয়া জগদ্বাসীকে চির ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন। রঞ্জনরশ্মি বা X-ray আবিষ্কৃত হইল এই সে দিন ১৮৯৫ সনে; Radium ১৯০২ সনে। এই দুইটী এখন চিকিৎসকগণের পরম সহায়।

ব্যবহারিক বিজ্ঞান মানুষের জীবনযাত্রাকে অনায়াসসাধ্য ও আরামদায়ক করিবার জন্য যত প্রকার নিত্য নব উপকরণ জোগাইতেছে, বলিতে গেলে সে সমস্তই অদ্যতন, বিংশ শতাব্দীর দান। এডিসনের phonograph, megaphone, kinetoscope প্রভৃতি ঊনবিংশ শতাব্দীতে আবিষ্কৃত হইলেও আমরা সুদূর ভারতবাসী সেগুলি উপভোগ করিবার সুযোগ পাইয়াছি এই বিংশ শতাব্দীতে। এই কলিকাতা সহরে আমরা ঘোড়ার ট্রামে যাতায়াত করিয়াছি, কলেজে টানা পাখার নীচে বসিয়া শীতল হইবার বৃথা আয়াস পাইয়াছি, এই মন্দিরে টানা পাখার সাহায্যে গ্যাসের আলোকে উপাসনা, সভাসমিতির কার্য্য সম্পন্ন হইতে দেখিয়াছি; বিজলী বাতি দেখিবার সৌভাগ্য হইত এক ইডেন উদ্যানে গেলে, অন্যত্র নহে। এই কলিকাতায় আমরা স্পেন্সার পার্সিভ্যালকে ব্যোমযানে সুন্দরবনের দিকে অন্তর্হিত হইতে দেখিয়াছি, আবার একদা ছত্রসাহায্যে ব্যোমযান হইতে অবতরণ করিতে দেখিয়া বিস্ময়পুলকে পূর্ণ হইয়াছি। Aeroplane কলিকাতা-বাসী প্রথম দেখিল ১৯১৪।১৫ সনে। এখন অহরহ মাথার উপরে বায়ুযান (aeroplane) ঘর্ঘর শব্দ করিতেছে। বিদ্যুৎ-চালিত ট্রামের কৃপায় কয়বার মরিতে মরিতে বাঁচিয়া গিয়াছি—কতজনের প্রাণ গিয়াছে ও যাইতেছে। এখন কলিকাতার অলিতে গলিতে চলচ্চিত্রের

প্রাসাদ, ঘরে ঘরে রেডিও এবং গ্রামোফোন; বিজলি বাতি ও বিজলী পাখা নাই, এমন গৃহ নাই বলিলেই হয়। এই শতাব্দীর প্রথম দশকে কলিকাতার সর্ব্বপ্রধান চিকিৎসক জুড়ী গাড়ীতে রোগী দেখিয়া বেড়াইতেন; এখন যে-ডাক্তারের মোটর গাড়ী নাই, সে ডাক্তারই নয়। সাইকেল, মোটর গাড়ী ও টেলিফোনে দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে; এগুলি এক দিকে লোকের মহোপকার সাধন করিতেছে, অপর দিকে পাশববৃত্তির পরিতৃপ্তিকেও সহজসাধ্য করিয়া তুলিয়াছে।

বিংশ শতাব্দীর ইন্দ্রজাল বেতার যন্ত্র ও রেডিও। এখন দেশের দূরত্ব ঘুচিয়া গিয়াছে, মানুষের শ্রবণশক্তি পৃথিবীর পরিধিকে বেষ্টন করিতে পারিয়াছে। দশ বৎসর পূর্ব্বে কে কল্পনা করিতে পারিত যে, লণ্ডনে যে-বক্তৃতা হইতেছে, কানাডা, ভারত, অষ্ট্রেলিয়া হইতে তাহা সুস্পষ্ট শুনা যাইবে?

আমরা বিজ্ঞানের কাহিনী এতক্ষণ এইজন্য বলিলাম, যে এটা বৈজ্ঞানিক যুগ, এবং বিগত পঁচিশ বৎসরে বিজ্ঞানের সকল বিভাগেই অচিন্তনীয় বিকাশ সাধিত হইয়াছে; কিন্তু কাব্য, সাহিত্য, দর্শন ও ইতিহাসে নবীনেরা পূর্ব্বগামীদিগের গৌরবকে ছায়ায় ফেলিতে পারে নাই।

বিভিন্ন বিজ্ঞানের সহযোগিতা

"জ্ঞানং সর্ব্বতো মার্গিতব্যম্"—এই নীতিবাক্য বিজ্ঞানের বহুরূপ বিকাশে সম্যক্ অনুসৃত হইতেছে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, রসায়ন, জ্যোতিষ, ভূবিদ্যা, গণিত প্রভৃতি বিভিন্ন শাখার মধ্যে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ বিদ্যমান; সকলে এক সূত্রে বাঁধা; একে অন্যের সহযোগিতা না পাইলে পুষ্টি লাভ করে না, একের অর্জ্জিত তত্ত্ব অপরের সমস্যার

উপরে নূতন আলোকপাত করে; সকল বিভাগ শ্রেণীবদ্ধ সৈনিকের ন্যায় যুগপৎ অগ্রসর হইতেছে। একটা বায়ুযান নির্ম্মাণে কত শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক ও কারিগরের সমাবেশ!

কবির পক্ষে জ্ঞান আবশ্যক

এই সহযোগিতা অপর ক্ষেত্রেও অত্যাবশ্যক। একটা দৃষ্টান্ত দিলেই যথেষ্ট হইবে। ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস লিখিত হইলে লেখককে ভূবিদ্যা, জ্যোতিষ, গণিত, প্রত্নতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, ব্যাকরণ, সাহিত্য প্রভৃতি কত বিদ্যার সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। বর্ত্তমানে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত সুসভ্য দেশসমূহে কবিদিগকেও বিজ্ঞানের সহিত যোগ রাখিতে হয়; নিছক কল্পনার বলে এখন কি কবি, কি সাহিত্যিক, কেহই পাঠককে তৃপ্তি দিতে পারেন না। কে একজন ব্রাউনিং সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"Browning was the most learned of poets, and the most poetic of learned men—"ব্রাউনিং ছিলেন কবিদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিদ্বান্ এবং বিদ্বানদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি।" টেনীসনের কবিতায় নিখুঁত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা এই প্রসঙ্গে W. H. Hudson-এর একটী উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বিষয়টী পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিব।

The widest latitude may be allowed to every poet for the play of his imagination as long as his purpose is only to delight by the creation of beauty. But the moment he enters upon the work of a teacher, we demand that his teachings shall satisfy the understanding as well as engage the fancy and touch the heart. (Study of Lit. p. 113)

"যতক্ষণ সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়া শুধু আনন্দ দান করাই কবির উদ্দেশ্য, ততক্ষণ তিনি কল্পনাকে অবাধ বিহারের অধিকার দিতে পারেন। কিন্তু যখনই তিনি শিক্ষকের আসন গ্রহণ করিবেন, তৎক্ষণাৎ আমরা চাহিব, যে তিনি যাহা শিক্ষা দিবেন, তাহা যেমন এক দিকে আমাদের কল্পনাশক্তিকে উদ্দীপ্ত ও হৃদয়কে মুগ্ধ করিবে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তিকেও তৃপ্তি দিতে সমর্থ হইবে।"

শিক্ষা দিতে গেলে কবির পক্ষেই যদি জ্ঞান এত আবশ্যক হয়, তবে শিক্ষকতাই যাঁহাদিগের ব্যবসায়, তাঁহাদিগের পক্ষে জ্ঞানান্বেষণ আরও কত প্রয়োজনীয়। রাগ্‌বীর চিরস্মরণীয় প্রধান শিক্ষক ডাক্তার আর্ণোল্ড বলিয়াছেন, "বদ্ধ জলাশয়ের জল যেমন কেহ পান করে না, তেমনি যে-ব্যক্তি নিজে নিত্য নব নব জ্ঞান আহরণ করে না, তাহার শিক্ষাতে ছাত্রগণ প্রকৃত জ্ঞানের আস্বাদন পায় না।"

সর্ব্বত্র জ্ঞানান্বেষণ

আবার অন্য দিকে দেখুন, জল স্থল নভোমণ্ডল হইতে জ্ঞান আহরণের উদ্দেশ্যে সুসভ্য জাতিসমূহের মধ্যে নিরন্তর কি প্রবল উদ্যমের স্রোত বহিয়া চলিয়াছে।

জলে

সাগর মহাসাগরের গভীরতা কোন্ স্থানে কত, তাহার জলের স্বরূপ কি, তাহাতে কত প্রকার জীব ও উদ্ভিদ আছে, সেগুলি কিরূপে বাঁচিয়া থাকে, তাহার তলদেশের মৃত্তিকা পৃথিবীর অতীত ইতিহাস

বুঝিবার পক্ষে কতখানি সাহায্য করে, কোন্ দিকে কি কারণে সমুদ্রের স্রোত প্রবাহিত হয়—ইত্যাদি তত্ত্ব অবধারণের জন্য শত শত ব্যক্তি নিযুক্ত রহিয়াছে। সভ্যতার অঙ্কুরোদ্গম হইতে নৌকা জলের উপর চলিতেছে ; এখন অধিকন্তু জলযান জলের নীচে ডুবিয়া অগাধজল-সঞ্চারী গ্রাহের মত সংসারের কার্য্য সুলভ করিয়া তুলিতেছে।

স্থলে

স্থলে দিগ্‌দিগন্তবিহীন মরুভূমি, শ্বাপদসমাকীর্ণ, জনমানবরহিত ঘনান্ধকার অরণ্য, নরখাদক রাক্ষসের দেশ, সহস্র রোগের আধার সাক্ষাৎ যমপুরী—এমন কোন্ বিভীষিকাময় স্থান আছে, যথায় শুধু কৌতুহল নিবৃত্তির জন্য নয়, কিন্তু জ্ঞানভাণ্ডারের সম্পদ বাড়াইবার উদ্দেশ্যে পরিব্রাজকেরা গমন না করিয়াছেন ? পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ কেন্দ্র আবিষ্কার করিবার জন্য শত বর্ষ ধরিয়া শত শত দুঃসাহসী নাবিক ও জ্ঞানব্রত বীর প্রকৃতির দুর্ব্বার শক্তির সহিত যুঝিয়া ও অবর্ণনীয় দুঃখ সহিয়া পর্য্যুদস্ত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন, পুনঃ পুনঃ এই অধ্যবসায়ে কত ব্যক্তির প্রাণ গিয়াছে. কিন্তু পুরুষকার অনতিক্রম্য বিঘ্নবিপত্তির নিকটে পরাজয় স্বীকার করিতেছে না। সাতাইশ বৎসর পূর্ব্বে দক্ষিণ কেন্দ্র আবিষ্কৃত হইয়াছে. কিন্তু অদ্যাপি উত্তর কেন্দ্রে মানুষের পদচিহ্ন পড়ে নাই। দুরারোহ তুষারমণ্ডিত গিরিশিরে উঠিবার উদ্দেশ্যে পশ্চিমের সকল দেশেই সমিতি আছে। ভারতবাসী এত কাল জানিত, গৌরীশঙ্কর অজেয় ও অনধিগম্য। কিন্তু অমিতবিক্রম শ্বেত পুরুষেরা সকল ক্লেশ, সকল বিপদ অগ্রাহ্য করিয়া বৎসরের পর বৎসর, যেন মোহাবিষ্ট হইয়া ঐ দিকে ছুটিয়া আসিতেছেন। বারংবার এক একটী অভিযানে কত যাত্রী জীবন বিসর্জ্জন দিতেছেন, তথাপি পরবর্ত্তীদিগের

উৎসাহ দমিয়া যাইতেছে না। 'Mount Everestকে জয় করিতেই হইবে', এই মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া দলে দলে লোক এক দুঃসাধ্য ব্রত উদ্‌যাপনে লাগিয়া গিয়াছে।

নভোমণ্ডলে

উন্নতিকামী জাতিসমূহ জলে স্থলে আধিপত্য বিস্তার করিয়াই ক্ষান্ত হইতে পারে নাই। তাহারা খেচরের ন্যায় আকাশে বিচরণ করিবে—এই আকাঙ্ক্ষা দ্বারা প্রণোদিত হইয়া দেড় শত বৎসর ধরিয়া কত অসাধ্যই সাধন করিতেছে। ১৭৮৩ সনে প্রথম ব্যোমযান নির্ম্মিত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর আদি হইতে উহা জ্ঞানাহরণ ও তথ্য নির্ণয়ের কার্য্যে ব্যবহৃত হইতে থাকে ; বিশেষতঃ ঐ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধ হইতে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য ব্যোমযানের সমাদর খুব বাড়িয়া যায়। বায়ুমণ্ডলের স্থূলসূক্ষ্ম সমুদায় ধর্ম্ম অবগত হইবার অভিপ্রায়ে কত জ্ঞানী গুণী বার বার বহু যন্ত্রপাতি লইয়া ঊর্দ্ধে আরোহণ করিয়াছেন ; কত রকম দুর্ঘটনায় অনেকের অপঘাতে মৃত্যু ঘটিয়াছে, কিন্তু ইহাদিগের আত্মোৎসর্গের গুণে জগদ্বাসী জ্ঞানে সমৃদ্ধ হইতেছে। আকাশ-সঞ্চরণেও দেখা যাইতেছে, মানুষের আশার অবধি নাই, উৎসাহ উদ্যমেরও সীমা নাই। দশ হাজার বিশ হাজার ত্রিশ হাজার ফুট ঊর্দ্ধে আরোহণ করিয়াও ব্যোমবিহারীদিগের পরিতৃপ্তি হইল না। ১৯৩২ সনে ফরাসী অধ্যাপক পিকার (Picard) উঠিলেন ৫৪,৪৫০ ফুট অর্থাৎ দশ মাইলের অধিক। ছোট ব্যোমযান আরোহী বিনা নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক যন্ত্র লইয়া ১২৩,০০০ ফুট, প্রায় সোয়া ২৩ মাইল উঠিয়া নামিয়া আসিয়াছে। ১৯৩২ সনেই ইংলণ্ডের আন্‌উন্‌স্ (C. F. Unwins) বায়ুযানে (aeroplane) ৪৩,৯০০

ফুট উচ্চে গমন করেন। তাঁহার এই কীর্ত্তি আজ পর্য্যন্ত অনতিক্রান্ত রহিয়াছে।

বায়ুযানের কথা আর বলিব কি? চল্লিশ বৎসরের মধ্যে ইহা কত দূর বিকাশ ও প্রসার লাভ করিয়াছে, তাহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। ইহার প্রবল আকর্ষণে ধরা পড়িয়া ভারতবাসীও বিপদ বরণ করিতে ভয় পাইতেছে না, অবজ্ঞাত বাঙ্গালীও অকাতরে প্রাণ দিতেছে। এমন অসম সাহসের কার্য্যে নারীরাও পশ্চাৎপদ নহেন। যখন তখন মরণান্ত দুর্ঘটনা ঘটিতেছে, তথাপি আকাশ-নাবিকের সংখ্যা বাড়িয়াই চলিয়াছে।

কিন্তু লোকের আকাঙ্ক্ষা এত আশ্চর্য্য সফলতাতেও মিটে নাই। মানুষ স্বচ্ছন্দগগনবিহারী হইবে, এই লক্ষ্যই এখন বৈজ্ঞানিকদিগকে প্রলুব্ধ করিতেছে। তাঁহারা এমন যন্ত্রের উদ্ভাবনে লাগিয়া গিয়াছেন, যাহা ধরাপৃষ্ঠ হইতে ২৫০ মাইল উর্দ্ধে গমন করিবে, ঘণ্টায় এক হাজার মাইল ধাবিত হইবে, অথবা বায়ুমণ্ডল পার হইয়া নিবাত নিস্পন্দ দেশের মধ্য দিয়া মাধ্যাকর্ষণশক্তি অতিক্রম করিয়া একেবারে চন্দ্রলোকে যাইয়া পঁহুছিবে। ইহা উন্মাদের প্রলাপ নয়। জর্ম্মনী ও আমেরিকায় আন্তর্গ্রহসমিতি (Interplanetary Society) এই অভিপ্রায় পূরণের জন্য অনবরত পরীক্ষা করিতেছেন। আমেরিকার এক ধনবান্ পুরুষ কতিপয় সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকের হস্তে সফলতা নিশ্চিত ভাবিয়া দুই লক্ষাধিক টাকা দিয়াছেন।

বিজ্ঞানোন্নতির একটা কুফল

মানবের অপরিতৃপ্য জ্ঞানপিপাসার ফলে সংরক্ষণ ও সংহার, দুই দিকেই পথ প্রশস্ত হইয়া উঠিতেছে। সুখ ও দুঃখ, মঙ্গল ও অমঙ্গল

অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ, তাই ঐহিক সম্পদের পরাকাষ্ঠা লাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই দৃপ্ত, জ্ঞানোদ্ধত জাতিসমূহ তাহার মধ্যেই ধ্বংসের বীজ বপন করিয়াছে। এক শতাব্দী পূর্ব্বে টেনীসন দিব্য দৃষ্টিতে ভবিষ্য-মানবের উদ্ভাবিনী বুদ্ধির অত্যাশ্চর্য্য কীর্ত্তি দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন, কালে বিরোধরত জাতিসকল মধ্যনীলাকাশে, বজ্রবিদ্যুৎবাত্যাসমাকুল মেঘমালার মধ্যে আহবে মগ্ন হইবে, এবং সেই আহবের শোণিত-বর্ষণে মেদিনী সিক্ত হইয়া যাইবে। তাঁহার এই বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছে; রামায়ণের এক মেঘনাদের স্থলে ইদানীং শত সহস্র মেঘনাদের আবির্ভাব হইয়াছে। সভ্যতাবিস্তারের প্রভাবে জ্ঞানবল বাহুবলের স্থান অধিকার করিয়াছে বটে, কিন্তু জ্ঞানবল দানবের বিচারবিহীন বিনাশের কার্য্যে উত্তরোত্তর ব্যাপকতর ভাবে নিয়োজিত হইতেছে। বিগত মহাযুদ্ধে যে পরিমাণে লোকক্ষয় হইয়াছিল, পৃথিবীর ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। বিশেষজ্ঞেরা আশঙ্কা করিতেছেন, আবার যদি যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তবে রণোন্মত্ত জাতিগুলি নির্ম্মূল হইবে, অথবা মানব-সভ্যতাই লোপ পাইবে। এক ইংরেজ উপন্যাস-লেখক বলেন, পৃথিবী যদি নির্মনুষ্য হয়, ক্ষতি নাই। হয়-তো মহাপ্রলয়ের পরে কোনও উচ্চতর জীব অবতীর্ণ হইবে।

জ্ঞানার্জ্জনের প্রণালী ও লক্ষ্য

জ্ঞানোপার্জ্জনের প্রণালী ও লক্ষ্য চিরকাল একরূপ নহে। যত দিন মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার হয় নাই, তত দিন পুস্তকের সংখ্যা অল্প ছিল, এবং শিক্ষার্থীকে হস্তলিখিত গ্রন্থের উপরে নির্ভর করিতে হইত। প্রাচীন কালে সকল সভ্য দেশেই এই উপায়ে জ্ঞানবিস্তারের কাজ চলিত। ইহাতে উপকার ও অপকার দুই-ই হইত। উপকার হইত

এই যে, এক একখানি পুস্তকের প্রতিলিপি করিতে বিস্তর সময় ও শ্রমের প্রয়োজন হইত, এজন্য শুধু খাঁটি জ্ঞানপ্রদ ও কল্যাণানুকূল সদ্‌গ্রন্থই বাঁচিয়া থাকিত, এবং জ্ঞানানুরাগী ব্যক্তিরা যে, কয়খানি বই পড়িত, সেগুলি গভীর মনোনিবেশ সহকারে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিত। ক্ষতি হইত দুই প্রকারে; প্রথমতঃ, পুস্তকের সংখ্যা কম ছিল বলিয়া জ্ঞানার্জ্জন অধিকাংশ লোকের পক্ষেই দুঃসাধ্য থাকিয়া যাইত; তৎপরে বহু বহু উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বহুল প্রচারের অভাবে বিলুপ্ত হইত। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। গ্রীক কবিদিগের অমূল্য নাটক-গুলির এক দশমাংশও এই কারণে বর্ত্তমান কালের রসগ্রাহীদের সম্ভোগে আসিতে পারে নাই। কিন্তু ইহারও ক্ষতিপূরণ আছে। মুদ্রাযন্ত্রের প্রসাদে বর্ত্তমান যুগে এক একটা দেশের উপর দিয়া বন্যার প্লাবনের মত গ্রন্থের খরস্রোত বহিয়া যাইতেছে; তাহাতে একদিকে যেমন বিচিত্র মণিমুক্তা বৈদুর্য্য পাইয়া জনসমাজ সমৃদ্ধ হইতেছে, তেমনি অপর দিকে দুর্গন্ধ অপশিক্ষার বীজ সঞ্চয় করিয়া স্বাস্থ্য ও স্বস্তিকেও বিসর্জ্জন দিতেছে। অনুন্নত প্রাচীনদিগের এই বিপদ খুবই অল্প ছিল। তখন বাজে বই পড়িয়া কাল কাটাইবার সুযোগ ছিল না। এবং পল্লব-গ্রাহিতাও এখনকার মত প্রশ্রয় পাইত না।

পূর্ব্ব ও পশ্চিমে জ্ঞানোপার্জ্জনের লক্ষ্য কি ছিল, তাহাও দেখা কর্ত্তব্য। এ দেশে প্রাচীন যুগ হইতেই এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে, যে বিদ্যার্থী সমুদায় বিদ্যা আয়ত্ত করিবার প্রয়াসী হইবেন না; তাঁহার লক্ষ্য থাকিবে একটা বিদ্যায় পারগামী হওয়া। একজন ছত্রিশ বৎসর ব্যাকরণ পড়িলেন, হয় তো দর্শন স্মৃতি মোটে স্পর্শ করিলেন না। ইহাতে তাঁহার পূর্ণ বিকাশের পক্ষে বাধা ঘটিতে পারে; কিন্তু তিনি হইলেন একজন বিশেষজ্ঞ, specialist, অথবা বৈয়াকরণ অর্থাৎ

ব্যাকরণে authority, জ্ঞানের সকল বিভাগেই এইরূপ ব্যবস্থা ছিল, পুরাতন পথের পথিকদিগের মধ্যে এখনও আছে।

মধ্যযুগে ইয়ুরোপে জ্ঞানান্বেষণে লক্ষ্য থাকিত সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ হওয়া। এক এক অধ্যাপকের অগাধ জ্ঞানের খ্যাতি দিগ্‌দিগন্তে ছড়াইয়া পড়িত, এবং তাহাতে দেশ বিদেশ হইতে দলে দলে শিক্ষার্থী আসিয়া অন্তেবাসীরূপে দীর্ঘকাল তাঁহাদের উপদেশ গ্রহণ করিত। দ্বাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের আবেলার্ড (Abelard) সম্বন্ধে লোকে বলিত যে, জগতে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য আছে, তিনি সবই জানেন। তাঁহার ন্যায় চলমান বিশ্বকোষ সে যুগে আরও ছিল।

বিদ্যা-বিভাগ

বর্ত্তমান কালে—'অনন্তপারং কিল শব্দশাস্ত্রং'—শুধু শব্দশাস্ত্র নয়, সকল শাস্ত্রই অনন্তপার, বিদ্যা অন্তহীন, গ্রন্থ তো বটেই। সুতরাং এখন বিদ্যা-বিভাগ কিংবা বিশেষজ্ঞতা বা specialisationএর যুগ। বিশ্বজ্ঞান আয়ত্ত করিবার উদ্যমে যে মানুষ প্রবৃত্ত হইবে, তাহাকে তাহার হিতার্থীরা বাতুলালয়ে পাঠাইয়া দিবেন—কারণ সে ভুলিয়া গিয়াছে, 'স্বল্পশ্চ কালো বহবশ্চ বিঘ্নাঃ।' এই হেতু এক বিজ্ঞ পুরুষ ছাত্রদিগকে বলিতেছেন, "Know everything of something, and something of everything—একটা বিষয় সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত কর, এবং প্রত্যেক বিষয়ের কিছু না কিছু জানিয়া রাখ"। বিংশ শতাব্দীতে এই নীতিও অগ্রাহ্য। এখন আবার প্রাচীন ভারতের শিক্ষানীতি ফিরিয়া আসিয়াছে, এখন জ্ঞানানুসরণে এক বিভাগে জীবন সমর্পণ করিবার পদ্ধতিই প্রবর্ত্তিত হইতেছে। পাশ্চাত্য চিকিৎসাব্যবসায় ইহার একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পূর্ব্বে একই ডাক্তার নানা রোগের

চিকিৎসা করিতেন, ঔষধের ব্যবস্থাপত্র ও অস্ত্রোপচার এক জনের হাতেই থাকিত। এখন এই দুইটী,—Physician ও Surgeon এর কর্ম্ম,—একেবারে স্বতন্ত্র হইয়া গিয়াছে। শুধু তাই নয়, ঔষধমূলক চিকিৎসাতেও শ্রমবিভাগ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া উঠিতেছে। এখন যে-ডাক্তার চোখ দেখেন, তিনি নাক দেখেন না, যিনি নাক দেখেন, তিনি দাঁত দেখেন না। দাঁতের ডাক্তার তার সন্নিহিত গলার খোঁজ রাখেন না। আবার গলা, কাণ ও নাকের চিকিৎসা অদ্যাপি এক জনের হাতে থাকিলেও হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস এবং উদর-গহ্বরে যত যন্ত্রের যত রকম পীড়া আছে, তাহার প্রত্যেকটীর জন্য স্বতন্ত্র চিকিৎসক আবশ্যক। ফলতঃ মস্তকের কেশ হইতে পদতল পর্য্যন্ত ব্যাধিতকে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিভিন্ন রোগে বিভিন্ন চিকিৎসকের শরণ লইতে হয়। চিকিৎসা বিভাগের ফলে আরোগ্যলাভ পূর্ব্বাপেক্ষা নিশ্চিততর হইয়াছে, কিন্তু অস্বচ্ছল অবস্থার রোগীরা নিরাময় হইবার সঙ্গে সঙ্গে নিরন্ন হইয়াও পড়িতেছে। তবে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, বিংশ শতাব্দীর অভূতপূর্ব্ব জ্ঞানোন্নতিই এবংবিধ বিভাগের মূল।

জ্ঞানান্বেষণে বাধা

'জ্ঞান সকল স্থান হইতেই আহরণ করিবে—এই উদার আদর্শ কোন কালে কোন দেশেই সম্যক্ অনুসৃত হয় নাই, যদিচ পূর্ব্বে ও পশ্চিমে আদর্শ লঙ্ঘনের রীতিতে কোন কোন স্থলে পার্থক্য আছে। জ্ঞানান্বেষণে 'নরনারী সাধারণের সমান অধিকার'—এমন উন্নত নীতি পদদলিত হয় তিন কারণে। প্রথম কারণ ধর্ম্মান্ধতা, দ্বিতীয় স্বার্থান্ধতা, তৃতীয় অধিকারীভেদ স্বীকার। ধর্ম্মান্ধতা শতাব্দীর পর শতাব্দী জ্ঞান-

বিস্তারে কি বিষম বাধা দিয়াছে, তাহার দৃষ্টান্তগুলি ইয়ুরোপের ইতিহাসে জ্বল জ্বল করিয়া জ্বলিতেছে। আটলান্টিকের পরপারে এক মহাদেশ আছে, কলম্বস যখন এই প্রকার মত প্রকাশ করিলেন, তখন ধর্ম্মরক্ষকেরা শাস্ত্রবচন তুলিয়া দেখাইয়া দিলেন, যে পৃথিবীর অপর পৃষ্ঠে মানুষ থাকিতেই পারে না; তাহারা কি বাদুড়ের ন্যায় পায়ে ঝুলিয়া আছে? অতএব কলম্বস পাষণ্ড। পৃথিবী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, গালিলেও এই নব তত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন, এজন্য তাঁহাকে প্রকাশ্যে উহা প্রত্যাহার করিতে হইল, পরে তিনি স্বগৃহে দীর্ঘকালের জন্য অন্তরীণ হইয়া রহিলেন। প্রথমটী পঞ্চদশ ও দ্বিতীয়টী সপ্তদশ শতাব্দীর ঘটনা। কিন্তু এই সেদিন, ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় যামে, সভ্যতাসমুজ্জ্বল ইংলণ্ডে অভিব্যক্তিবাদ কিরূপ ধিক্কৃত হইয়াছিল, সে কথা ইঙ্গিতে গোড়াতেই বলিয়াছি, পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই। এয়ারোপ্লেনের যুগে ইহাও একটা মনে রাখিবার বিষয় যে, ফরাসী-বিপ্লবের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্যারিসের দুই ব্যক্তি ব্যোমযানে আকাশে উঠিবেন, এই সংবাদ পাইয়া রাজাদেশে এক ডিউক একদল অশ্বারোহী লইয়া তাঁহাদিগকে গ্রেফ্‌তার করিতে ছুটিয়াছিলেন; যখন দেখা গেল, আরোহীরা ঊর্দ্ধে উঠিয়া গিয়াছেন, তখন অগত্যা রাজপুরুষেরা অপরাধীদিগের অবতরণ করিবার অপেক্ষায় রহিলেন, এবং তাঁহারা ভূমিস্পর্শ করিতেই অবরুদ্ধ হইলেন। ধর্ম্মাচার্য্যেরা রাজাকে বুঝাইয়াছিলেন যে, মানুষ আকাশে উঠিয়া ঈশ্বরের নিগূঢ় সৃষ্টিলীলা বুঝিবার প্রয়াস পাইবে, ইহা তাঁহার অভিপ্রায় নহে।

ভারতবর্ষ প্রাচীনকালে জ্ঞানানুশীলনে সঙ্কীর্ণ ধর্ম্মান্ধতা হইতে মুক্ত ছিল। এ দেশে সেশ্বর ও নিরীশ্বর দর্শন, বেদস্তুতি ও বেদনিন্দা, কর্ম্ম-

কাণ্ডের প্রশংসা ও কর্ম্মকাণ্ডের নিস্ফলতা ঘোষণা—এই জাতীয় পরস্পর-বিরোধী বহু বিষয় স্বাধীনভাবে আলোচিত ও প্রচারিত হইয়াছে। বুদ্ধ পশুঘাতসমর্থক যজ্ঞীয় শ্রুতিসমূহের নিন্দা করিয়া আরাধনা-প্রার্থনাবিবর্জ্জিত বিশুদ্ধ জ্ঞানমূলক ধর্ম্ম প্রচার করিতে করিতে আশী বৎসর বয়সে দেহ রক্ষা করেন; সুদীর্ঘকাল ধরিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের সহিত তাঁহার বিচার চলিয়াছে, কেহ তাহাতে বাধা দেয় নাই। এ দেশে কস্মিন্ কালেও কণ্ঠরোধের আইন ছিল না।

কিন্তু যেখানে স্বার্থবুদ্ধি জ্ঞানার্জ্জনে প্রতিকূল আচরণ করে, সেখানে পূর্ব্ব ও পশ্চিম দেশের ঐক্য আছে। ইয়ুরোপের ধর্ম্মগুরুগণ স্থির করিয়াছিলেন, সর্ব্বসাধারণের বাইবেল পড়িবার প্রয়োজন নাই, তাহারা যাজকের মুখে ধর্ম্মের তত্ত্ব যতটুকু জানিবে, তাহাই যথেষ্ট। এই জন্য বহু শতাব্দী ধরিয়া ঐ গ্রন্থ কথ্য ভাষায় অনুবাদিত হয় নাই। প্রধান গুরু পোপ যতদিন খৃষ্টীয় জগতের একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন, ততদিন ধর্ম্মাচরণে ও জ্ঞানচর্চ্চায় কাহারও স্বাধীনতা ছিল না। এই হীন দশার প্রতিবাদকল্পেই মার্টিন লুথারের উদ্ভব হইয়াছিল।

ভারতে জ্ঞানাহরণে দ্বিজ ও শূদ্র, এবং পুরুষ ও নারীর মধ্যে শাস্ত্র-কারেরা বিষম বিভেদের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বিষয়টী কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই মন্দিরে বিবৃত করিয়াছিলাম, আবার না বলিলেও চলিবে। কিন্তু বিশ্বাবরা, গার্গী, মৈত্রেয়ীর দেশে নারীজাতির সমক্ষে জ্ঞানের দ্বার একেবারে রুদ্ধ করা সমাজপতিগণের সাধ্যায়ত্ত হইয়াছিল কি না, বলা কঠিন, পরবর্ত্তীকালের লীলাবতী, ভানুমতী, চন্দ্রাবতী প্রভৃতি বিদুষী নারীর উপাখ্যান এবিষয়ে সন্দেহ উৎপাদন করে। তারপর, ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা শূদ্রদিগকে জ্ঞানচর্চ্চায় বঞ্চিত রাখিবার জন্য যতই

কঠোর বিধি প্রণয়ন করুন না কেন, সে যুগে যে উচ্চ বর্ণের মধ্যেও উদারচিত্ত সমদর্শী জ্ঞানীর অভাব ছিল না, সে যুগেও যে অন্যায় ও নিষ্ঠুর দণ্ডবিধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হইত, মহাভারতে তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে। বিশ্বকোষসদৃশ এই মহাকাব্যে পুনঃ পুনঃ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে; আবার উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহার মূলে আঘাত করিতেও জ্ঞানীরা সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। আমরা যে শ্লোকটী বক্তব্য বিষয়রূপে গ্রহণ করিয়াছি, তাহার একটু পূর্ব্বেই যাজ্ঞবল্ক্য জনককে বলিতেছেন—"জ্ঞানই মোক্ষলাভের প্রধান কারণ···অতএব প্রকৃত জ্ঞানের অনুসন্ধান করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের কথা দূরে থাকুক, অতি নীচ শূদ্রাদি হইতেও জ্ঞানোপদেশ প্রাপ্ত হইলে তাহাতে শ্রদ্ধা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্রহ্ম হইতে সমুদয় বর্ণই সমুৎপন্ন হইয়াছে। অতএব সমুদয় বর্ণকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য করা যায়, এবং সকল বর্ণেরই বেদপাঠে অধিকার আছে।" এই সার্ব্বভৌম ভাব আর্য্যজাতির মধ্যাহ্নকালে শুধু কথায় নিবদ্ধ ছিল না। দ্রোণ, কৃপ প্রভৃতির জন্ম-বৃত্তান্ত, দ্বিজব্যাধসংবাদ, তুলাধার-জাজলিসংবাদ মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া দেখাইয়া দিতেছে, সে যুগে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের নাগপাশ সমাজকে একেবারে অসাড়, প্রস্তরীভূত করিয়া ফেলে নাই। গোঁড়ামির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিবার লোক ছিল বলিয়াই ভারতবর্ষ এখনও মরে নাই।

পূর্ব্ব ও পশ্চিম উভয়ত্রই প্রজাবর্গকে অজ্ঞানতায় নিমজ্জিত রাখিবার যে নীতি শত শত বৎসর সচল ছিল, তাহার পশ্চাতে একটা ভয় ছিল; সেটী এই, যে জ্ঞানই শক্তি -knowledge is power—ইংরেজী প্রবাদটা অবশ্য সেকালে রচিত হয় নাই। জনসাধারণ—পুরুষ এবং

নারী—জ্ঞানলাভ করিলে বশে থাকিবে না, বিদ্রোহী ও অরক্ষণীয়া হইবে, অতএব তাহাদিগকে বিদ্যা দান করিও না, এই স্বার্থবুদ্ধিই প্রবল রাষ্ট্রনায়কদিগকে দুর্ব্বল পদানত জনমণ্ডলীর মধ্যে অজ্ঞানতার ঘোরান্ধকার চিরস্থায়ী করিয়া রাখিবার অধ্যবসায়ে প্রণোদিত করিয়াছিল। এখনও, এই বিংশ শতাব্দীতেও পরাধীন দেশের বিদ্যার্থীর পক্ষে ভূমণ্ডলের কত বিদ্যাপীঠের দ্বার অর্গলবদ্ধ আছে, কেন না, জেতা ও জিতের মধ্যে জ্ঞানের অসাম্য না থাকিলে রাজনৈতিক অসাম্য রক্ষা করা দুরূহ।

পরিশেষে অধিকারীভেদ বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলা কর্ত্তব্য। এ দেশে এই ভেদ চিরকাল স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। ইহার ভিতরকার কথা এই, যে, সকলপ্রকার জ্ঞান সকলের উপযোগী নয়। অতএব গুরু শিষ্যের যোগ্যতা বুঝিয়া জ্ঞান দান করিবেন। অযোগ্য পাত্রে জ্ঞানার্পণ করিলে মহান্ অনর্থ ঘটে। মতটী একেবারে অযৌক্তিক নয়। অধুনা বিত্যালয়সমূহে সকল দেশেই প্রকারান্তরে এই নীতিই প্রভাব বিস্তার করিতেছে, নতুবা অধ্যেতব্য বিষয়গুলি দ্বিধা, ত্রিধা, চতুর্ধা বিভক্ত হইত না। যে বিজ্ঞানে অনুরক্ত, সে বৎসরের পর বৎসর সাহিত্যের দরজায় আটক থাকিবে, যাহার সাহিত্যে স্পৃহণীয় প্রতিভা আছে, সে বিজ্ঞানে অনুত্তীর্ণ হইয়া জীবনটাকে ব্যর্থ করিয়া ফেলিবে—এই দুর্ভোগ নিবারণের জন্যই সর্ব্বত্র বিষয় নির্ব্বাচনের অধিকার প্রদত্ত হইতেছে। কিন্তু প্রশ্ন এই, অধিকারী, অনধিকারী বিচার করে কে? বিচারটী গুরু শিষ্য কাহারও পক্ষেই সহজ নহে। বিচার করিতে যাইয়া বিচারক নানা অবান্তর কারণ দ্বারা পরিচালিত হইতে পারেন, জ্ঞানার্থীও আত্মজ্ঞানের অভাবে ভুল করিতে পারে। দৃষ্টান্ত নিষ্প্রয়োজন।

"জ্ঞানই শক্তি"

'জ্ঞানই শক্তি'—এই বাক্যের প্রমাণ আমরা প্রতিনিয়ত চক্ষুর সম্মুখে দেখিতে পাইতেছি। যুদ্ধের উল্লেখ নাই করিলাম—সম্প্রতি চীনে ইতিহাসের যে অধ্যায় নর-শোণিতে লিখিত হইতেছে, তাহা যুগ-যুগান্তের ঐ শিক্ষাই দিতেছে। ইংলণ্ডে অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজপুরুষ চ্যাটাম্ (Chatham) বলিতেন, "Government is based on knowledge"—"শাসনতন্ত্র জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।" শাসন-পদ্ধতির সফলতা নির্ভর করে জ্ঞানের উপরে। সে জ্ঞান কত অগণিত প্রকারের, তাহা বলিবার অবসর নাই! শত্রুর সংবাদ জানিবার জন্য সকল দেশেই চর নিযুক্ত আছে, চিরকালই ছিল। Chathamএর ন্যায়ই শ্রুতকীর্ত্তি তৎপুত্র পিট (Pitt) স্বদেশে বিদেশে সর্ব্বত্র সংখ্যাহীন চর রাখিতেন। কিন্তু তাঁহার যদি গুপ্তচর ছাড়া অন্যরূপ জ্ঞানসম্বল না থাকিত, তবে তিনি জীবন-মরণ সংগ্রামে স্বদেশকে রক্ষা করিতে পারিতেন না। অজ্ঞানতার দরুণ চরম দুর্দ্দশায় পড়িয়া ভারতবাসী যে এত দিনে বুঝিয়াছে, জ্ঞানই শক্তি, জ্ঞানই জীবন, অজ্ঞানতাই অশক্তি, অশক্তিই মৃত্যু—এই নবজাগরণই আগতপ্রায় মহত্তর ও বিশালতর জাতীয় জীবনের পূর্ব্বাভাস।

জ্ঞানাহরণের উপায়

জ্ঞানানুশীলনের কর্ত্তব্যতা যে এত করিয়া বলা যাইতেছে, ইহাতে কেহ যেন মনে না করেন যে, আমরা শুধু গ্রন্থগত বিদ্যার উপরেই জোর দিতেছি। কেবল পুস্তক পড়িয়াই যে কেহ প্রকৃত প্রস্তাবে জ্ঞানী হইতে পারে না, "পণ্ডিত মূর্খাণাং" প্রভৃতি বহু উপাখ্যানে তাহা চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে। জ্ঞান যে উপায়েই লব্ধ হউক

না কেন, তাহা আদরণীয়। পুস্তকপাঠ জ্ঞানলাভের উত্তম সহায়, কিন্তু যাঁহার তাহাতে রুচি নাই, তিনি জ্ঞানীর সহিত মিশিয়া, প্রকৃতির পরিচয় পাইয়া, কর্ম্মপ্রবাহে পড়িয়া, কল্যাণব্রতে যোগ দিয়া ধ্যানস্থ হইয়া, পরমাত্মায় আত্মা সমাহিত করিয়া জ্ঞান লাভ করুন, নিরক্ষর হইলেও তাঁহার উপদেশ লোকে শ্রদ্ধাভরে গ্রহণ করিবে। হজরত মহম্মদের একটা উপনাম ছিল 'উম্মি', অর্থাৎ অবিদ্বান্; তিনি লিখিতে পড়িতে মোটেই জানিতেন কি না, সে বিষয়ে দ্বিমত আছে। কিন্তু ইঁহার মুখ হইতে এমন মহামূল্য তত্ত্বনিচয় নিঃসৃত হইয়াছিল, যাহা অভ্রান্ত শাস্ত্ররূপে শত শত বৎসর ধরিয়া কোটি কোটি অনুবর্ত্তীর জীবন পরিচালিত করিয়া আসিতেছে। এ দেশের নরনারী যাঁহাদের বাণী প্রতিদিন ভক্তিভরে আবৃত্তি করিয়া প্রাণে বল ও হৃদয়ে শান্তি পায়, তাঁহারা অনেকেই নিরক্ষর ছিলেন। যাহার দেখিবার চক্ষু আছে, বুঝিবার মত বুদ্ধি আছে, সম্ভোগক্ষম হৃদয় আছে, সে রাজ্যভ্রষ্ট নৃপতির ন্যায় বনবাসেও বলিতে পারে—

And this our life exempt from public haunt
Finds tongues in trees and books in the running brooks
Sermons in stones and good in every thing.

As You like It. ii. I.15 17

"জনসমাগম হইতে নির্ম্মুক্ত আমাদের এই জীবনে আমরা বৃক্ষের বাণী শুনিতে পাই, চঞ্চল স্রোতস্বিনীতে গ্রন্থ পাঠ করি, প্রস্তর হইতে উপদেশ লই, এবং সকল ব্যাপারেই মঙ্গল দেখিয়া থাকি।"

বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম

১৭৯৯ সনে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফরাসী গণিতবিৎ লা প্লাস-প্রণীত Mechanique Celeste নামক ভুবনবিখ্যাত জ্যোতিষগ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট উহা পাঠ করিয়া তাঁহাকে বলেন, "আপনি গ্রহনক্ষত্রের উৎপত্তি, গতি প্রভৃতি এমন তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনা ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু কোথাও তো ঈশ্বরের নাম উল্লেখ করেন নাই।" লা প্লাস উত্তর করিলেন, "Sir, my theory does not require the hypothesis of a God"—"আমার প্রতিপাদ্য তত্ত্বে ঈশ্বরকে অনুমান করিবার প্রয়োজন নাই।" জগত্তত্ত্ব ঈশ্বরকে বর্জ্জন করিয়াও বুঝিতে পারা যায়, আধুনিক বিজ্ঞানের ইহাই মত ও বিশ্বাস। বৈজ্ঞানিকেরা অনেকে নাস্তিক, অনেকে অজ্ঞেয়তাবাদী, কেহ কেহ আস্তিক্যবুদ্ধি রক্ষা করিয়াছেন, কদাচিৎ দুই একজন দেশপ্রচলিত ধর্ম্মে আস্থাবান্; পাস্তুরের ন্যায় নিষ্ঠার সহিত কুলক্রমাগত ধর্ম্ম পালন করিয়াছেন, এরূপ বৈজ্ঞানিক অতি বিরল। জড়বিজ্ঞান এখন 'অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্'এর গবেষণায় নিমগ্ন আছে। ইহার অণু হইতে অণুতম প্রোটন, ইলেকট্রন; মহৎ হইতে মহীয়ান্ লক্ষ লক্ষ যোজনব্যাপী নীহারিকাপুঞ্জ। জ্ঞানোন্নতির চরম লক্ষ্য, জড়বিজ্ঞানের অণুতম ও মহত্তমকে উপনিষদের যিনি অণোরণীয়ান্ ও মহতো মহীয়ান্, তাঁহার মহিমায় উদ্ভাসিত করিয়া তাহাতে প্রাণ সঞ্চার করা—নতুবা জ্ঞান নিরর্থক। মানুষ শুধু জড় দেহ নয়; সে জ্ঞানজীবী বটে, কিন্তু কেবল জ্ঞান লইয়াই তৃপ্ত থাকিতে পারে না। সত্যানুসন্ধিৎসা যেমন তাহার পক্ষে স্বাভাবিক, তেমনি সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা, প্রেম, পুণ্য, অনন্ত উন্নতির পিপাসা, এগুলিও তাহার অন্তর্নিহিত। এডিংটনের ন্যায় বৈজ্ঞানিকেরাও স্বীকার করেন, যে 'প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (Physics) যে, শ্রেণীর জ্ঞান লাভ করিবার শ্রমে নিযুক্ত আছে, তাহা মানবাত্মার আবেষ্টন সম্যক্ বুঝাইবার পক্ষে যথেষ্ট নহে।' অপিচ 'সত্য বস্তু

আধ্যাত্মিক, জড়ীয় নয়।' বিগত বিজ্ঞান সম্মেলনের সভাপতি স্যর জেম্‌স্ জীন্‌স্ নূতনতম বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আলোচনাপূর্ব্বক এই মতে উপনীত হইয়াছেন যে, জগতের মূলে এক দেশাতীত ও কালাতীত সত্তা দ্রষ্টা নিয়ন্তারূপে বর্ত্তমান। ভারতীয় ব্রহ্মবাদ চিরকাল ইহাই বলিয়া আসিতেছে। কিন্তু প্রাচ্য ব্রহ্মবাদ ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহযোগিতা আবশ্যক। ব্রহ্মবাদের নব প্রতিষ্ঠা হইবে প্রাচীর সাধন ও প্রতীচীর নূতনতম বৈজ্ঞানিক সত্য—এই উভয়ের সামঞ্জস্যের ভিত্তিতে। যে বৈজ্ঞানিক দেহ ব্যবচ্ছেদ করিতে করিতে আত্মা খুঁজিয়া পাইলেন না, তাঁহার নিকটে উপনিষদুক্ত সাধনতত্ত্ব—শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন, ধ্যান ধারণা সমাধি—ধরিতে হইবে। এবং বলিতে হইবে, আত্মা অণুবীক্ষণ দূরবীক্ষণে দেখা যায় না—ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য, ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্। আবার, যে প্রাচ্য সাধক অতি পুরাতন স্থূল ধারণা এখনও ছাড়িতে পারেন নাই, তাঁহাকে বৈজ্ঞানিকের শিষ্য হইতে হইবে। জড়-বিজ্ঞান বিশ্বপ্রপঞ্চের নিগূঢ় হইতে নিগূঢ়তর তত্ত্বে যত প্রবেশ করিবে, ব্রহ্মবাদ ততই বলিষ্ঠ ও পরিপুষ্ট হইবে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহিত প্রাচ্য ব্রহ্মবাদের মিলন অসাধ্য নয়, ইহা প্রতিপাদন করিবার ব্রতে জগদীশচন্দ্র জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এই দুরূহ কর্ম্মকে সফল করিবার জন্য কত জগদীশচন্দ্রের অভ্যুদয় হইবে—কালোহ্যয়ং নিরবধিঃ, বিপুলা চ পৃথ্বী।

জড়বিজ্ঞানে যেরূপ দ্রুতগতিতে সভ্যতাকে ধ্বংসের পথে অগ্রসর করিয়া দিতেছে, তাহাতে মনীষীদিগের চিত্ত স্বতঃই অধ্যাত্মবিজ্ঞানের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে। জড়বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগ যেমন পরস্পরের সহযোগী, সেইরূপ জড়বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানও সতীর্থ; একে অন্যকে ছাড়িয়া পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না। এজন্য দেখিতে পাই,

নাস্তিক বৈজ্ঞানিকদিগেরও একটা জীবনবিজ্ঞান বা দর্শন (Philosophy of Life) আছে। কিন্তু জড়ের বিশ্লেষণে তাঁহারা যতই সুদক্ষ হউন না কেন, জড়াতীত সত্তার তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে গেলেই তাঁহারা সপ্রমাণ করেন, যে শাশ্বতধর্ম্মপ্রবক্তাদিগের নিকটে তাঁহাদের উপদেশ গ্রহণ করিবার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে।

জ্ঞানানুশীলনের মূলতত্ত্ব

উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, যদ্দ্বারা এক অক্ষর ব্রহ্মকে অবগত হওয়া যায়, তাহাই পরা বিদ্যা, বেদবেদাঙ্গাদি আর সকলই অপরা বিদ্যা। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, জ্ঞানসাধনের লক্ষ্য, সারাৎসার পরাৎপর পরম পুরুষকে অবগত হওয়া। এই লক্ষ্য ভুলিয়া গিয়া জ্ঞানার্থী যদি বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্রও পাঠ করে, তবে তাহাও হীনতর বলিয়া গণ্য হয়। পক্ষান্তরে যাহা অপরা বিদ্যা বলিয়া পরিগণিত, তাহাও ব্রহ্মের স্বরূপ জানিবার সহায় হইতে পারে; যদি হয়, তবে তাহাও পরা বিদ্যা। সুতরাং বিমলচিত্ত বিদ্যার্থীর পক্ষে পরা ও অপরা বিদ্যার ভেদ ঘুচিয়া যায়। কাব্য, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, গণিত, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, রসায়ন, জ্যোতিষ, এমন পঠিতব্য বিষয় নাই, যাহা শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিকে ঈশ্বরের মহিমা উপলব্ধি করিতে শিক্ষা না দেয়। কেন না, সর্ব্ব বিদ্যার বীজ এই বিশ্বেই নিহিত আছে, এবং বিশ্বস্রষ্টাই মানবের আদি গুরু। জ্যোতির্বিৎ দূরবীক্ষণে পঞ্চাশ কোটি আলোকবর্ষ ব্যবধানে অবস্থিত নীহারিকাপুঞ্জের প্রতিবিম্ব পাইয়াছেন, এই সংবাদ শুনিয়া আমাদের বিস্ময়বিহ্বল চিত্ত স্বতঃই বলিয়া উঠে, "যতো বাচো নির্বন্ততে অপ্রাপ্য মনসা সহ"—বলে এই জন্য যে, ঐ দূরত্ব মন ধারণা করিতে পারে না, বাক্যও প্রকাশ করিতে অক্ষম। আরও বলে এই জন্য যে, নীহারিকা-

পূঞ্জ স্বয়ম্ভূ নহে ; উহা তদীয় অধিদেবতাত্মার অনির্ব্বচনীয় মহিমার অস্ফুট প্রকাশমাত্র।

জগত্তত্ত্ব নিরূপণের জন্য মানুষের এমন অপরাজেয় উৎসাহ কেন ? সত্যানুসন্ধানের বিমল আনন্দ কোথা হইতে আসিল ? সত্যপ্রচারে জীবন নিয়োগ করিতে তাহাকে কে প্রেরণা দিল ? ইতর জীবের দায়িত্ববোধ নাই, তাহাতে সত্যাসত্যবোধ সম্ভবে না। জড়ের অন্তরালে, অথবা জড়ে অনুস্যূত চৈতন্যকে ছাড়িয়া দিলে বিশ্বজগৎ দুর্ব্বোধ্য ; মনুষ্য, মনুষ্যের ধর্ম্ম, কর্ত্তব্য ও নিয়তি, সকলই সূচীভেদ্য অন্ধতমসাচ্ছন্ন প্রহেলিকা।

ব্রহ্মবাদ—জ্ঞানের দায়িত্ব

ভারতের ঋষিগণ তিমিরের পরপারে এক জ্যোতির্ম্ময় মহান্ পুরুষকে জানিয়াছিলেন। পূর্ব্ব ও পশ্চিমের কত শত বিশ্বাসী ও আকুলপ্রাণ নরনারী আমরণ তদেকনিষ্ঠ সাধনা দ্বারা ঐ সাক্ষ্যই দিয়া গিয়াছেন। আমরা যে-ধর্ম্মের আশ্রয় পাইয়াছি, তাহাতে সকল দেশের ও সকল যুগের সাধনাধারা মিলিত হইয়াছে। বিজ্ঞানের অপরিমেয় বিকাশেও এই ধর্ম্ম ক্ষুণ্ণ হইবে না। কেন না, যাঁহারা জড়ের মধ্যেই পরম সত্য (ultimate reality) খুঁজিতেছেন, তাঁহারাও স্বীকার করিতেছেন, জড়বিজ্ঞানে শেষ সিদ্ধান্ত বলিয়া কিছু নাই ; তাঁহাদিগকেও দুরবগাহ্য চরমতত্ত্ব নির্ণয়ের প্রয়াসে পরাহত প্রাচীন ব্রহ্মবাদীদিগের ন্যায় বলিতে হইতেছে—"নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ —"আমি ইহা উত্তমরূপে জানিয়াছি, এমন মনে করি না ; জানি না, এমত মনে করি না, জানি, এমতও মনে করি না।" আমরা যেন ভুলিয়া না যাই, জ্ঞানাহরণের একটা দায়িত্ব আছে। তত্ত্বের দিকে

জ্ঞানী জ্ঞানবিস্তারের জন্য দায়ী। ব্যবহারের দিকে প্রত্যেক মানুষ উপলব্ধ সত্য জীবনে পালন করিতে বাধ্য। বিদ্যা বিতরণের দ্বারা পরিপক্ক হয় ; নীতি ও ধর্ম্মে ভগবৎপ্রেরণা উপেক্ষিত হইলে নিস্তব্ধ হইয়া যায়। এদেশে শিক্ষার অবস্থা কি শোচনীয়, অজ্ঞানতার অন্ধকার কি ঘনীভূত! সে দিন কত দূরে, যে দিন ভারতের গৃহে গৃহে জ্ঞানের দীপ জ্বলিয়া উঠিবে। জ্ঞান-বিস্তারে সোপানের পর সোপানে কত অক্লান্ত কর্ম্মী, কত একনিষ্ঠ তপস্বীর বহু বহু বৎসরের আত্মাহুতি আবশ্যক। তৎপরে, অধুনা ধর্ম্মের গ্লানি বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ইহসর্ব্বস্ব সভ্যতার বিকার হইতে যে আবর্ত্তের উদ্ভব হইয়াছে, তাহা সমগ্র পৃথিবীকে গ্রাস করিতে চলিয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে বাহুবলদৃপ্ত, ঐশ্বর্য্যমত্ত, গর্ব্বোদ্ধত জাতিসমূহ সুন্দ উপসুন্দের মত পরস্পরকে সংহার করিবে, এই আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হইয়া পশ্চিমের মনস্বীরা ভারতের দিকে চাহিয়া আছেন, এবং আশা করিতেছেন যে, এ দেশের চিরাভ্যস্ত অন্তর্লীনতা ভোগলোলুপ সভ্যতার মুখ ফিরাইয়া দিতে সমর্থ হইবে। আমাদের পূর্ব্বাচার্য্যগণ জগতে যে উদার, সর্ব্বজনীন সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের আদর্শ মানসচক্ষুতে দর্শন করিয়া নিজ নিজ জীবনে তাহা প্রতিফলিত করিবার জন্য কায়মনোবাক্যে ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, এবং জগদ্বাসীকে যে আদর্শের দিকে আকৃষ্ট করিবার জীবনব্রতে আপনাদিগকে তিল তিল নিঃশেষে ক্ষয় করিয়া গিয়াছেন সেই আদর্শই মানবজাতির আসন্ন প্রলয় হইতে বাঁচিবার রক্ষাকবচ। সেই আদর্শ তাঁহাদের বংশধরদিগকে অধিকার করুক, আপ্লুত, করুক, কল্যাণকর্ম্মে আহ্বান করুক। ইহাদেরই যদি জ্ঞানানুসন্ধানে অপরাজেয় উৎসাহ, পুণ্যে ঐকান্তিক অনুরক্তি, যাহা কিছু মহৎ, যাহা কিছু অনিন্দ্য, যাহা কিছু

সত্যশিবসুন্দরের ছায়া, তৎপ্রতি অনাবিল প্রীতি না থাকে, তবে কাহারা ঐ মহান্ আদর্শের পতাকা দেশে দেশে তুলিয়া ধরিবে? "আপনি আচরি ধর্ম্ম অপরে শিখায়।" এই সেই ধর্ম্ম, যাহাতে ভারতের সনাতন নিষ্ক্রিয়তাসক্তি পশ্চিমের জলন্ত উদ্যমাগ্নিতে গলিয়া গিয়া যুগপৎ ভোগে নিঃস্পৃহতা ও অশ্রান্ত কর্ম্মকুশলতাতে রূপান্তরিত হইবে; যাহাতে পাশ্চাত্য উদ্দাম ভোগলালসা প্রাচ্য ধ্যানশীলতা দ্বারা শৃঙ্খলিত হইয়া চলিবে; যাহাতে পূর্ব্বের যোগরত অন্তঃসত্ত্ব পশ্চিমের অতর্পণীয় জ্ঞানাকাঙ্ক্ষার সহিত যুক্ত হইয়া জড় ও চৈতন্যকে একই পরম সত্তার দ্বিমুখ প্রকাশ বলিয়া জানিবে, এবং জড়-বিজ্ঞানে ব্রহ্মানুভূতি ও ব্রহ্মবিদ্যাতে বিশ্বতত্ত্বরতি সঞ্চারিত করিবে। এই সেই ধর্ম্ম, যাহার প্রভাবে ভারতবাসী জন্মগত, সংস্কারগত, অশিক্ষা-জনিত, সম্প্রদায়-স্বার্থান্ধ ভেদবুদ্ধির উর্দ্ধে উঠিয়া এক জ্ঞানগৌরবোজ্জ্বল, অনুপমকর্ম্মা, বীর্য্যবান্, ব্রহ্মার্পিতচিত্ত জাতিতে সংবদ্ধ হইবে। জ্ঞান ও কর্ম্ম—ব্রহ্মযোগযাত্রী জ্ঞান, ভক্তিপরিসিক্ত কর্ম্ম—এই ধর্ম্মের সাধ্য।

উভাভ্যামেব পক্ষাভ্যাম্ যথা খে পক্ষিণো গতিঃ।
তথৈব জ্ঞানকর্ম্মভ্যাম্ জায়তে ব্রহ্মণো পদম্॥

"পক্ষী যেমন দুইখানি পক্ষের সাহায্যে আকাশে গমন করে, সেইরূপ জ্ঞান ও কর্ম্মের দ্বারা ব্রহ্মকে অবগত হওয়া যায়।"

স্বাধীনতা—অন্তরে ও বাহিরে

স্বাধীনতা—অন্তরে ও বাহিরে

ভূমিকা

ভারতবর্ষে যাঁহারা জাতীয় স্বাধীনতার পক্ষপাতী, অথচ উচ্চাঙ্গের আধ্যাত্মিক সাধনের জন্য ব্যাকুল, একটী কঠিন সমস্যা তাঁহাদিগের সমক্ষে মীমাংসার অপেক্ষা করিতেছে। তাহা এই যে, জগতের তুইটী প্রধান ভক্তিধর্ম্ম তুই পরাধীন দেশে অভ্যুদিত হইল কেন? খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রকাশিত হইয়াছিল রোমক সাম্রাজ্যের পূর্ব্বপ্রান্তে বিজিত ও লাঞ্ছিত ইহুদী জাতির মধ্যে, উহার রাষ্ট্রীয় জীবনের সায়ংকালে; কেন না, ঈশার তিরোভাবের অল্পকাল পরেই, খৃষ্টীয় ৭০ সনে, রোমাণেরা ইহুদী ধর্ম্মের পীঠস্থান জেরসালেম নগর ধূলিসাৎ ও ইহুদীদিগকে দেশদেশান্তরে বিদূরিত ও নির্ব্বাসিত করে।

আবার দেখুন, ভক্তিসাধনের জীবন্তপ্রতীক প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবভূমি পরপদানত পাঠানরাজশাসিত এই বঙ্গদেশ। চৈতন্য বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক নহেন। তাঁহার প্রায় আঠার শত বৎসর পূর্ব্বে এই দেশে "ভাগবতধর্ম্ম" প্রচারিত হইয়াছিল, তাহারই আধুনিক নাম বৈষ্ণব ধর্ম্ম।

তুইটি ভক্তিধর্ম্ম

১৮৯৯ সনে বিদ্বজ্জনবরেণ্য অধ্যাপক ব্রজেন্দ্রনাথ শীল রোমনগরে প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদগণের সভায় Vaishnavism and Christianity নামক যে সন্দর্ভ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাতে ভক্তি, ভক্তির সাধন, অবতারবাদ, মুক্তিবাদ, মুক্তাত্মার লক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ে উভয়

ধর্ম্মের নিগূঢ় সাদৃশ্য প্রদর্শিত হইয়াছে। আমি সহজ কথায় ঈশা ও চৈতন্যের অন্তরঙ্গ সাধনসম্পর্কে যৎকিঞ্চিৎ উপস্থিত করিতেছি।

ঈশা-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের লক্ষণ নম্রতা, কোমলতা, সহিষ্ণুতা, বিনয়, বিশ্বাস এবং প্রেম। এ সমস্তই ভাগবত বা বৈষ্ণবের গুণ। ঈশা শৈলোপরি উপদেশে ঘোষণা করিলেন,—"দীনাত্মারা ধন্য, মৃদুস্বভাবেরা ধন্য, পবিত্রচিত্তেরা ধন্য।"

চৈতন্য প্রচার করিলেন,

"তৃণাদপি সুনীচেন, তরোরিব সহিষ্ণুনা
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

"তৃণ অপেক্ষাও নীচ ও বৃক্ষের ন্যায় সহিষ্ণু হইয়া এবং আপনার জ ন্য মান না চাহিয়া অপরকে মান দান করিয়া হরিনাম কীর্ত্তন করিবে।"

ঈশা বলিলেন,

"যদি কেহ তোমার এক গণ্ডে আঘাত করে, তাহাকে অপর গণ্ড ফিরাইয়া দাও!"

চৈতন্য নিত্যানন্দ কর্ত্তৃক দুর্ব্বৃত্ত জগাই মাধাইকে নবজীবন দান এই নীতির অত্যুজ্জ্বল উদাহরণ। "কল্যকার জন্য চিন্তা করিও না," তাঁহার এই উপদেশটী বৈষ্ণবের অবশ্যপালনীয় বিধি।

"তুমি সমগ্র প্রাণ, সমগ্র মন, সমগ্র হৃদয় দিয়া প্রভু পরমেশ্বরকে প্রীতি করিবে"—ঈশার এই অমূল্য উপদেশটীতে আমরা ভক্তিতত্ত্বের মূল সুত্র প্রাপ্ত হইতেছি। শাণ্ডিল্যসূত্রে ভক্তির সংজ্ঞা—"সা পরানুরক্তি ঈশ্বরে"—"ঈশ্বরে পরম অনুরক্তির নাম ভক্তি।"

"অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা—" "দেহাদি অন্য কোন বিষয়ে মমতা নাই, প্রেমানুগত মমতা আছে কেবল ভগবানে—ইহারই নাম ভক্তি"—চৈতন্য এই অর্থেই সনাতনের নিকটে ভক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যা

করিয়াছেন। (চৈ, চঃতামৃত, মধ্য ৫৭৬ পৃঃ) তাঁহার নিজের প্রার্থনাতে এই ভাবটী উজ্জ্বলরূপে প্রতিফলিত হইয়াছে—

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরী কবিতাম্বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥

"হে জগদীশ, আমি ধন, জন, সুন্দরী স্ত্রী, কবিত্ব শক্তি (এ সকলের কিছুই) কামনা করি না। আমার জন্মে জন্মে ঈশ্বর তোমাতে অহৈতুকী ভক্তি হউক।"

পরিশেষে ইহাও উল্লেখযোগ্য, যে চৈতন্যের পরম আদরণীয় "শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য্য," এই পঞ্চ ভক্তিতত্ত্ব খৃষ্টীয় সমাজের অনেক ভাগবতপন্থী নরনারী সাধন করিয়াছিলেন।

ঈশা ও জাতীয় স্বাধীনতা

ইহুদীগণ জাতীয় স্বাধীনতা হারাইয়া শতাব্দীর পর শতাব্দী আশা ও প্রার্থনা করিয়া আসিতেছিল যে, তাহাদিগের মধ্যে Messiah বা Christ অর্থাৎ অভিষিক্ত রাজা অবতীর্ণ হইয়া পুনরায় স্বাধীন রাজ্য—স্থাপন করিবেন। যদিচ পিটার প্রভৃতি কতিপয় শিষ্য ঈশাকে Christ বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি স্বয়ং রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভের দিকে মুহূর্ত্তের তরেও মনোনিয়োগ করেন নাই ; বরং তিনি যে Christ, শিষ্যদিগকে তাহা গোপন রাখিতে আদেশ করিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে। বিরোধীরা ঈশাকে রাজদ্রোহের অভিযোগে জড়িত করিবার অভিপ্রায়ে একদা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি বলেন? রোমের সম্রাটকে কর দেওয়া কি অবৈধ?" ঈশা তাহাদিগের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "কর প্রদানের একটা মুদ্রা লইয়া আইস।" একজন একটা পয়সা আনিয়া তাঁহার হাতে দিল। তিনি

তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই মুদ্রার পৃষ্ঠে নাম ও ছবি কাহার?" তাহারা উত্তর দিল, "রোমক সম্রাটের।" তখন ঈশা বলিলেন, "তবে যাহা সম্রাটের প্রাপ্য তাহা সম্রাটকে দাও, যাহা ঈশ্বরের প্রাপ্য তাহা ঈশ্বরকে দাও।"

উত্তরটীর তাৎপর্য্য এই যে, ধর্ম্ম ও রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্র বিভিন্ন, একের সহিত অন্যকে মিশ্রিত করিবে না। ঈশা ভগবদ্‌রাজ্য সংস্থাপন করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, পার্থিব রাজ্য জয়ের জন্য নহে।

চৈতন্য ও জাতীয় স্বাধীনতা

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দশকে হুসেন সাহ গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। অচিরে ভবিষ্যদ্‌বাণী শ্রুত হইল, যে নবদ্বীপের এক ব্রাহ্মণ বঙ্গের রাজা হইবে। অমনি নবাবের আদেশে মুসলমানেরা নবদ্বীপে বিষম অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল।

"কপালে তিলক দেখে, যজ্ঞসূত্র কাঁধে।
ঘরদ্বার লোটে আর লৌহপার্শ্বে বাঁধে।"

ব্রাহ্মণের গঙ্গাস্নান নিষিদ্ধ হইল, দেবালয়গুলি চূর্ণ হইতে লাগিল। অশ্বত্থ, মনসা গাছের মূলচ্ছেদ এবং তুলসী সমূলে উৎপাটিত হইল। পণ্ডিতগণের অনেককে অত্যাচারীর দল জোর করিয়া মুসলমান করিল, বহু অধ্যাপক দেশত্যাগী হইলেন।

কিছুকাল পরে হুসেন সাহ উপলব্ধি করিলেন, ভবিষ্যদ্‌বাণীর কোনও মূল্য নাই; তখন অত্যাচার বন্ধ করিয়া দিলেন।

এই সময়ে নবদ্বীপবাসী জগন্নাথ মিশ্রের দ্বিতীয় পুত্র বিশ্বম্ভরের বয়স ছয় সাত বৎসর। তিনি যথাকালে পাঠ সমাপ্ত করিয়া পাণ্ডিত্যের জন্য 'বিদ্যাসাগর' উপাধি পাইলেন। তৎপরে দিগ্‌বিজয়ীকে তর্কযুদ্ধে

পরাস্ত করিয়া "বাদিসিংহ" উপাধি লাভ করিলেন; সুতরাং তাঁহার পূর্ণ নাম হইল শ্রীবিশ্বম্ভর মিশ্র বিদ্যাসাগর বাদিসিংহ। কেশবভারতীর নিকটে দীক্ষা গ্রহণের পরে তিনি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

লোকনায়ক শ্রীচৈতন্য

যদি তৎকালে বঙ্গভূমিতে রাজপদের যোগ্য কেহ থাকিয়া থাকে, তবে তিনি শ্রীচৈতন্য। অনুপম রূপ, অনন্যসাধারণ মনস্বিতা, অমিত বীর্য্য, জনমনোমোহিনী ভাবোন্মত্ততা, অনায়াসলব্ধ সংগঠনপটুতা, সর্ব্বোপরি বজ্রাপেক্ষাও কঠোর এবং কুসুম অপেক্ষাও সুকোমল হৃদয়—একাধারে পরস্পর বিরোধী গুণাবলীর অপূর্ব্ব সমাবেশ চৈতন্যকে স্বয়ংসিদ্ধ লোকনায়কের যোগ্যতা দান করিয়াছিল। প্রথম যৌবনে, সংসারত্যাগের পূর্ব্বে, ধর্ম্মাচরণের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য রাজপুরুষের আদেশের বিরুদ্ধে তিনি যে অভিযান পরিচালনা করিয়াছিলেন, তাহা এই বিংশ শতাব্দীতে, ভারতের নবজাগরণের দিনেও পুনঃ পুনঃ স্মরণীয়।

চৈতন্যের অন্তরে যখন ভগবৎপ্রেমের অঙ্কুর উদ্গত হইল, তখন তিনি নামকীর্ত্তনে মাতিয়া গেলেন। তাঁহার ইচ্ছানুসারে "নগরীয়া লোকে ঘরে ঘরে সঙ্কীর্ত্তন" করিতে লাগিল। "মৃদঙ্গ, করতাল, সঙ্কীর্ত্তন মহাধ্বনি" শুনিয়া সকল যবন ক্রুদ্ধ হইল। তাহারা কাজীর কাছে যাইয়া নালিশ করিল।

"ক্রোধে সন্ধ্যাকালে কাজী এক ঘরে আইলা,
মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া লোকে কহিতে লাগিলা।"

"এতকাল কেহ প্রকাশ্যে হিন্দুয়ানী করে নাই। এখন কাহার বলে উদ্যম চালাইতেছ?"

"আর যদি কীর্ত্তন করিতে লাগ পাইমু।
সর্ব্বস্ব দণ্ডিয়া তার জাতি যে লইমু।"

এই প্রকার শাসাইয়া কাজী গৃহে ফিরিয়া গেলেন। নগরীয়া লোকেরা "বড় শোক পাইয়া" চৈতন্যের নিকটে যাইয়া সমস্ত নিবেদন করিল। তিনি আজ্ঞা দিলেন, "যাও কীর্ত্তন কর।" তাহারা ঘরে যাইয়া আবার কীর্ত্তন আরম্ভ করিল; কিন্তু কাজীর ভয়ে কাহারও মন সুস্থ নয়, কীর্ত্তন ভাল হইল না। চৈতন্য তাহা জানিতে পারিয়া সকলকে ডাকাইয়া ঘোষণা করিলেন—

"নগরে নগরে আজি করিব কীর্ত্তন।
সন্ধ্যাকালে কর সবে নগর মণ্ডন।
সন্ধ্যাতে দেউটি সবে জ্বাল ঘরে ঘরে।
দেখি কোন্ কাজি আসি মোরে মানা করে।"

চৈতন্য কীর্ত্তনের তিনটী সম্প্রদায় করিলেন। প্রথমটীতে হরিদাস, দ্বিতীয়টিতে আচার্য্য গোঁসাই এবং তৃতীয়টিতে চৈতন্য ও নিতানন্দ নৃত্য করিতে লাগিলেন। এইরূপে কীর্ত্তনের দল নগর ভ্রমণ করিতে করিতে কাজীর বাটীর দ্বারে উপস্থিত হইল। কাজী কীর্ত্তনের ধ্বনি শুনিয়া ঘরে লুকাইলেন। গৌরাঙ্গের সাহসের প্রশ্রয় পাইয়া লোকগুলি পাগল হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে, উদ্ধত পুরুষেরা 'পুষ্পবন' ভাঙ্গিতেছে, কাজি তথাপি ঘর হইতে বাহির হইতেছেন না। তখন 'মহাপ্রভু" তাহার দ্বারে বসিয়া এক ভব্য লোক পাঠাইয়া কাজীকে আহ্বান করিলেন। তৎপরে উভয়ের মধ্যে বিস্তর সদালাপ হইল।

চৈতন্য যে প্রণালীতে রাজশক্তিকে challenge অর্থাৎ যুদ্ধে আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহাকে passive resistance বা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ অথবা 'সত্যাগ্রহ' বলা চলে না। তাহা সক্রিয় প্রতিবাদ।

সন্ন্যাসগ্রহণের পরে ধর্ম্মপ্রচারে আত্মনিয়োগ করিয়া চৈতন্য যখন আসমুদ্র হিমাচল এই মহাদেশ ভক্তির তরঙ্গে প্লাবিত করিয়াছিলেন, তখনও নিজের স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দেন নাই।

এক বৎসর রথযাত্রার প্রাক্কালে চৈতন্য পুরীতে গমন করিলেন। উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্র তাঁহাকে দর্শন করিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিলেন। চৈতন্য সে আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিবার জন্য রাজসদনে যাইতে সম্মত হইলেন না। প্রতাপরুদ্র তখন বাসুদেব সার্ব্বভৌমকে চৈতন্যের নিকটে পাঠাইলেন, কিন্তু তাহাতেও কোনও ফল হইল না। অগত্যা রাজা স্বয়ং চৈতন্যকে দর্শন করিতে যাত্রা করিলেন এবং অভীষ্ট স্থানের নিকটবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে নিমীলিত নেত্রে ধ্যানস্থ দেখিতে পাইলেন। তখন প্রতাপরুদ্র—

"পরিঘ দীঘল দুই বাহু পসারিঞা।
দৃঢ় করি পাদপদ্ম ধরিল ধাইঞা॥"

চৈতন্যও মুদিতনয়নে ধ্যানস্থ থাকিয়াই রাজাকে দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়া রহিলেন। (বঙ্গ সাঃ পঃ, পৃঃ ১২৭৬)

আর একবার দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ করিতে করিতে চৈতন্য ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে উপনীত হইয়া এক বৃক্ষতলে রজনী যাপন করিলেন। ত্রিবাঙ্কুরের রাজা পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। তিনি লোকমুখে চৈতন্যের মহিমা শুনিয়া পরদিন "কত আগ্রহ করিয়া প্রভুকে লইতে দিলা লোক পাঠাইয়া।" চৈতন্য রাজদূতকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। তৎপরে রাজা স্বয়ং আসিলেন।

"হস্তী অশ্ব তেয়াগিয়া অতি দূরদেশে।
সন্ন্যাসীর কাছে আসে অতি দীন বেশে॥"

ভক্তের সহিত ভক্তের সম্মিলনে তথায় অপূর্ব্ব প্রেমাভিনয় হইল।

"লোকজন রাখি রাজা প্রভুর সেবায়।
প্রফুল্ল অন্তরে রাজধানী চলি যায়॥"

(বঃ সাঃ পঃ, পৃঃ ১৯৪৭—৫১)

চৈতন্যের তীর্থভ্রমণবৃত্তান্ত পড়িতে পড়িতে অন্তরে অখণ্ড ভারতের ছবি প্রতিফলিত হয়।

যিনি কীর্ত্তনানন্দে ক্ষণে ক্ষণে অচৈতন্য হইতেন, যাঁহার হৃদয় নিরন্তর প্রেমরসে পরিসিক্ত থাকিত, তিনিই আবার সুনীতির অণু-পরিমাণ গ্লানি দেখিলে রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিতেন। একদা ভগবান আচার্য্যের গৃহে সপরিষদ চৈতন্য ভোজনের জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। আচার্য্যের অনুরোধে ছোট হরিদাস শিখী মাহিতীর ভগিনী "বৃদ্ধা তপস্বিনী আর পরম বৈষ্ণবী" মাধবী দেবীর নিকট হইতে "এক মোণ উত্তম চাউল মাগিয়া আনিলেন।" চৈতন্য আহার করিবার সময় উত্তম তণ্ডুল দেখিয়া আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন, ছোট হরিদাস মাধবীর নিকট হইতে চাউল আনিয়াছেন। আহারান্তে গৃহে আসিয়া তিনি গোবিন্দকে আজ্ঞা দিলেন, "আজি হইতে ছোট হরিদাসকে এখানে আসিতে দিও না।" দণ্ড শুনিয়া হরিদাস তিন দিন উপবাস করিলেন। স্বরূপাদি চৈতন্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হরিদাস কোন্ অপরাধ করিল, যে জন্য তাহার দ্বার মানা হইয়াছে ?"

"প্রভু কহে, 'বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন'॥"

ভক্তগণ সকলে মিলিয়া দিনের পর দিন মহাপ্রভুকে কত অনুনয় করিলেন, কিছুতেই তিনি হরিদাসের প্রতি প্রসন্ন হইলেন না। তিন বৎসর পরে হরিদাস প্রয়াগে যাইয়া ত্রিবেণীতে প্রবেশ করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন।

ভক্তিধর্ম্ম সাধনের চিরবরেণ্য আদর্শ শ্রীচৈতন্য তাঁহার নিজের প্রতি অনুরক্তজনের ভক্তির আতিশয্য দেখিলে তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না। এক গৌড়ীয় জগন্নাথের মন্দিরে তাঁহার পদধৌত করিয়া সেই জল পান করিয়াছিল, ইহাতে তিনি এত বিরক্ত হইয়াছিলেন যে, অনুযাত্রিগণ তাহাকে মন্দির হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিল।

চৈতন্যেও অসাধারণ সমাজসংগঠন প্রতিভা ছিল। তিনি পুরীতে সঙ্গোপনে নিত্যানন্দকে সমাজসংস্কার এবং সামাজিক বিধিব্যবস্থা বিষয়ে উপদেশ দিলেন। জাতিভেদ দূরীকরণ এবং জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে নরনারীকে বৈষ্ণবধর্ম্মে আহ্বান উহার মুখ্য বিষয় ছিল। নিত্যানন্দ বঙ্গদেশে ফিরিয়া আসিয়া সহস্র সহস্র 'নেড়ানেড়ীকে' বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষা দিলেন। বিবাহবিধিবিহীন দুর্নীতিমগ্ন পুরুষ রমণীর মধ্যে বিবাহপ্রথা প্রবর্ত্তিত করিলেন। তিনি সমস্ত নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুর গৃহে বৈষ্ণব গোস্বামীদিগের পূজাদি করিবার ব্যবস্থা চালাইলেন। "চৈতন্যের অনুজ্ঞাক্রমে সমস্ত নীচ জাতির নিকটে বৈষ্ণব সমাজে প্রবেশের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া নিত্যানন্দ তাহাদিগকে অশেষ দুর্গতি হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন।" (বৃহৎ বঙ্গ)

তৎপরে চৈতন্য সনাতনের উপরে বৈষ্ণবস্মৃতি প্রণয়ন করিবার ভার অর্পণ করিলেন, এবং তাঁহাকে মুখে মুখে উহার সূত্রগুলি বলিয়া দিলেন।

ভক্তি ও স্বাধীনতার সংগ্রাম—ভক্তির স্বরূপ

এই মহামনা পুরুষ যদি ভক্তির পথে না যাইয়া স্বাধীনতার সংগ্রামে জীবন অর্পণ করিতেন, তবে হয়তো বঙ্গের তথা ভারতের ইতিহাসে এক অভিনব অধ্যায় লিখিত হইত। কিন্তু যিনি ভক্তিরাজ্য বিস্তারের জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন, স্বরাজ্যের আকাঙ্ক্ষা তাঁহার মনে স্থান পাইবে কেন?

পৃথিবীর ইতিহাসে আজ পর্য্যন্ত কোনও জাতি বিনাযুদ্ধে স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে পারে নাই, স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারে নাই। যুদ্ধের প্রকট স্বরূপ হিংসা। হিংসা এবং ভক্তি আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় পরস্পর বিরোধী। নারদ বলেন, ভক্তিসাধকের পক্ষে 'অহিংসা, সত্য, কায়মনের শুদ্ধতা, দয়া, ঈশ্বরে বিশ্বাস ইত্যাদি সুনীতি পালনীয়।' (Scal, p, 98)

যুদ্ধের দার্শনিক ভিত্তি

এই জন্যই ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধকে হিংসাদোষ হইতে নির্ম্মল রাখিবার উদ্দেশ্যে উহাকে দার্শনিক ভিত্তির উপরে স্থাপন করিয়াছেন। যখন অর্জ্জুন কুরুক্ষেত্রে উভয় সেনার মধ্যে রথ হইতে ভীষ্মদ্রোণাদি গুরুজন এবং দুর্য্যোধনাদি জ্ঞাতিকুটুম্ব দেখিয়া কাতরকণ্ঠে বলিলেন, "ইহাদিগকে বধ করিয়া

ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ—

হে কৃষ্ণ, আমি জয় এবং রাজ্য ও রাজ্যসুখ আকাঙ্ক্ষা করি না," তখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বুঝাইয়া দিলেন

অন্তবন্ত ইমে নিত্যস্যোক্তা শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুদ্ধস্ব ভারত। ২।১৮

"এই সকল দেহ অন্তবৎ অর্থাৎ বিনাশশীল, দেহাদিকারী আত্মা নিত্য, অবিনাশী ও অপ্রমেয়। অতএব হে ভারত, যুদ্ধ কর!"

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ংহন্তি ন হন্যতে॥ ১৯॥

"যে ব্যক্তি মনে করে, এই আত্মা অপরকে হনন করে, অপিচ যে ব্যক্তি ভাবে, অপর এই আত্মাকে হনন করে, তাহারা উভয়েই অজ্ঞ।

বস্তুতঃ আত্মা কাহাকেও বিনাশ করে না, আত্মাকেও কেহ বিনাশ করিতে পারে না।"

ইয়ুরোপে Inquisition অর্থাৎ ধর্ম্মাধিকরণের সদস্যেরা যে পাষণ্ডদিগকে অগ্নিকুণ্ডে দাহ করিতেন, তাঁহাদের যুক্তিও কতকটা এইরূপ ছিল। তাঁহারা বলিতেন, দেহ মরণাধীন, আত্মা অমর। যে ব্যক্তি কুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে তাহার আত্মা অনন্ত নরকে দগ্ধ হইবে। ক্ষণবিধ্বংসী দেহকে দগ্ধ করিয়া যদি আত্মাকে অন্তহীন নরকযন্ত্রণা হইতে রক্ষা করা যায়, তবে তাহা তো প্রেমের কার্য্য! মানুষের দেহ অনিত্য, আত্মাই নিত্যবস্তু। আত্মার পরিত্রাণই সর্ব্বাগ্রে সাধনীয়, দৈহিক দুঃখ তাহার তুলনায় অতি অকিঞ্চিৎকর।

ভক্তি ও রাষ্ট্র

ফলতঃ ভক্তিধর্ম্ম রাষ্ট্রের অঙ্গীভূত হইলে বিকারগ্রস্ত না হইয়াই পারে না। ইহার দৃষ্টান্ত পূর্ব্ব ও পশ্চিম ভূখণ্ডে জাজ্বল্যমান ও বিদ্যমান। প্রথমে ভারতবর্ষের কথা বলি।

(১) ভাগবত ধর্ম্ম

কিঞ্চিদধিক ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে মালবের অন্তর্গত প্রাচীন বিদিশা-নগরে একটী শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহা খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। উহার সংক্ষিপ্ত সার এই যে, তক্ষশীলা-নিবাসী যবনদূত ভাগবত হেলিওডোরস দেবদেব বাসুদেবের নামে একটী গরুড়ধ্বজ উৎসর্গ করিলেন। লিপির দ্বিতীয়াংশে একটী শ্লোক আছে—

ত্রিণি অমতপদানি (সু) অনুঠিতানি
নয়ংতি স্বগ দম চাগ অপ্রমাদ॥

"তিনটী অমৃতের পথ সম্যক্ অনুষ্ঠিত হইলে (মানুষকে) স্বর্গে লইয়া যায়—

দম, ত্যাগ ও অপ্রমাদ।" দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ঐ তিনটী ভাগবতধর্ম্মের বিশেষ লক্ষণ ছিল। কিন্তু চারি পাঁচ শত বৎসর পরে, খৃষ্টীয় চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে, গুপ্ত সম্রাট্‌গণের সৌভাগ্যসূর্য্য যখন মধ্যাহ্নগগনে আরোহণ করিয়াছে, তখন উহার অন্তঃপ্রকৃতি কতখানি বিশুদ্ধ ছিল? গুপ্তসম্রাট্‌গণ আপনাদিগকে "পরম ভাগবত" বলিয়া আখ্যাত করিতেন। কিন্তু তাঁহারা কি অহিংসার পথ একেবারে ত্যাগ করিয়াছিলেন? গুপ্তকুলের দ্বিতীয় নৃপতি দিগ্‌বিজয়ী সমুদ্রগুপ্ত বাহুবলে প্রায় সমগ্র ভারতের সার্ব্বভৌম সম্রাট্ হইয়াছিলেন। তৎপুত্র, বিক্রমাদিত্য নামে ভারতের ইতিহাসে চিরঞ্জীব দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামগুপ্তকে নিহত বা সিংহাসনচ্যুত করিয়া তৎপত্নী ধ্রুব দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সম্রাট্ স্কন্দগুপ্ত, ভ্রাতা বা ভ্রাতুষ্পুত্র পুরগুপ্তের বিশ্বাস-ঘাতকতায় হুণদিগের সহিত যুদ্ধে প্রাণ হারাইয়াছিলেন। ইহাদের সময় হইতেই ভাগবতধর্ম্ম বৈষ্ণবধর্ম্ম নামে অভিহিত হইতে আরম্ভ করে।

(২) খৃষ্টধর্ম্ম

এখন ঈশা-প্রচারিত ভাগবত ধর্ম্মের জীবনকথা একটু আলোচনা করিয়া দেখি। জনবল, ধনৈশ্বর্য ও পার্থিব আধিপত্য দ্বারা বিচার করিলে আপাততঃ বোধ হইবে, যে খৃষ্টধর্ম্ম জগতে অত্যাশ্চর্যরূপে জয়যুক্ত হইয়াছে। কিন্তু যে-খৃষ্টধর্ম্ম চতুর্থ শতাব্দীতে রোমক সাম্রাজ্যকে জয় করিয়াছিল এবং যাহা বিংশ শতাব্দীতে সমগ্র ধরণীকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে, তাহা কি খৃষ্টের ধর্ম্ম?

খৃষ্টের তিরোভাবের কালে তৎপ্রচারিত ধর্ম্ম মুষ্টিমেয় ইহুদীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল। তাঁহার নাম বিদ্বান্ ও পদস্থ রোমকদিগের নিকটে এতই অল্প জ্ঞাত ছিল, যে ঈশাহী শকের দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম যামে সুবিখ্যাত রোমাণ ঐতিহাসিক টাসীটাস তদীয় "বর্ষপঞ্জী" (Annalas) নামক

পুস্তকে তাঁহার পরিচয় সমাপ্ত করিয়াছেন। "খৃষ্টীয়ান" নামটীর ব্যুৎপত্তি ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া তিনি বলিতেছেন—

"Auctor nominis ejus Christus Tiberio imperitante per procuratorem Pontirum Pilataum supplicio adfectums erat" (B. 45. 10.)

"ঐ নামের জনক খৃষ্ট সম্রাট্ টাইবেরিয়াসের রাজত্বকালে রাজপ্রতিনিধি পণ্টীয়াস পাইলেট কর্ত্তৃক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন।"

সেণ্ট পল খৃষ্টধর্ম্মকে সঙ্কীর্ণ জাতীয়তার গণ্ডী হইতে মুক্ত করিয়া গ্রীক ও রোমকদিগের মধ্যে ইহা প্রচার করেন। নবধর্ম্ম প্রথমে নগরে নগরে প্রচারিত ও গৃহীত হইয়াছিল এবং সুদীর্ঘকাল উহা প্রধানতঃ অজ্ঞ, অবজ্ঞাত ও দরিদ্র নরনারীর মধ্যেই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই যে, সে যুগে যাহারা নব ধর্ম্মের আশ্রয় লইত, ঈশ্বরের কৃপা অবতীর্ণ হইয়া তাহাদিগের সমগ্র প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত করিয়া দিত, এবং ব্যবহারিক জীবনে তাহাদিগের বৈশিষ্ট্য দেখিয়া প্রাচীন সমাজের পাপীতাপী দুঃখীজনেরা তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইত। এইরূপেই রাজপুরুষদিগের অগোচরে খৃষ্টধর্ম্ম রোমকসাম্রাজ্যে ব্যাপ্ত হইতেছিল। কিন্তু ইহাই শেষ কথা নয়। ইহার জয়যাত্রার আর একটা দিক্ আছে। ঐতিহাসিক টয়েন্‌বীর সাহায্যে অল্প কথায় সেই দিক্‌টা উদ্‌ঘাটিত হইতেছে।

খৃষ্টধর্ম্ম যে রোমক সাম্রাজ্যের উপরে জয়লাভ করিল, তাহার মূলে খৃষ্টীয়মণ্ডলীর পিতৃগণের অর্থাৎ পরিচালক পুরোহিতবর্গের (The Fathers of the Christian Church), কঠিন সাধন বিদ্যমান ছিল।

প্রথমতঃ, তাঁহারা চারি পাঁচশত বৎসর ধরিয়া অপরাজেয় প্রযত্ন-সহকারে খৃষ্টীয় মত ও বিশ্বাসকে (doctrine) গ্রীক দর্শনের ভাষায় নূতন আকার দান করিলেন।

(২) তাঁহারা ধর্ম্মমণ্ডলীর পরিচালন প্রণালীটি রোমক সাম্রাজ্যের শাসন পদ্ধতির আদর্শে গড়িয়া তুলিলেন।

(৩) গ্রীস দেশে অর্ফেয়ুস একটা নূতন তন্ত্র প্রচার করেন। তিনি ভাবপ্রধান অথচ শান্তপ্রকৃতি ও স্বপ্রতিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। তিনি এই তত্ত্ব প্রচার করেন যে, মানুষ দেবত্বের অধিকারী। মানবাত্মা অমর। আত্মানন্দ সাধনের লক্ষ্য; সংযম ও শুদ্ধতা তাহার উপায়। ধর্ম্মাধ্যক্ষ পুরোহিতেরা খৃষ্টকে অর্ফেয়ুসের রূপ দিয়া জনসমাজে উপস্থিত করিলেন।

(৪) সম্রাট্ কন্‌ষ্টান্টাইন (Constantine the Great) ৩১২ সনে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া রোমের সন্নিকটে উপনীত হইলে একদিন মধ্যাহ্নের কিঞ্চিৎ পরেই সূর্য্যের পুরোভাগে এক ক্রুশ দেখিতে পাইলেন, তাহাতে এই বাক্যটী মুদ্রিত ছিল—"এতদ্দ্বারা জয় কর।" পরবর্ত্তী যুদ্ধে তিনি শত্রুকে বিধ্বস্ত করিয়া পরিপূর্ণ বিজয়শ্রী এবং রোমকসাম্রাজ্যের অপ্রতিহত একাধিপত্য লাভ করিলেন। এই অতুলনীয় সাফল্য তাঁহাকে নবধর্ম্মে শ্রদ্ধাবান্ করিল, এবং তিনি আপনাকে খৃষ্টীয়ান বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তদবধি খৃষ্টীয়ধর্ম্ম রোমক সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় ধর্ম্মে পরিণত হইল।

টয়ন্‌বী ইঙ্গিত করিয়াছেন, ধর্ম্মযাজকেরা যে সূর্য্যমণ্ডলের এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ একটা ক্রুশ অধিকার করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাদের কৃতিত্ব ছিল।

(৫) তৎপরে তাঁহারা মণ্ডলীর পূজার্চ্চনা ক্রিয়াকলাপ গ্রীসের এলেয়ুসিস প্রভৃতি স্থানের গুপ্তপূজার আদর্শে বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

(৬) এমন কি, তাঁহারা পৌত্তলিক পূজা পার্ব্বণ উৎসবগুলিকে রূপান্তরিত করিয়া খৃষ্টীয় সমাজে স্থান দিয়াছিলেন।

পরিশেষে, সপ্তমত গ্রীস ও রোমের বীরপূজার প্রথাটীকে ধর্ম্মাচার্য্যেরা খৃষ্টীয় সাধুদিগের (saints) পূজারূপে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন।

সম্রাট্ কন্‌ষ্টান্টাইন নামমাত্র খৃষ্টীয়ান ছিলেন; তিনি মৃত্যুর অল্পকাল পূর্ব্বে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি যে-ধর্ম্মকে সাম্রাজ্য গৌরবে মণ্ডিত করিলেন, তাহা এবং ঈশা প্রচারিত ভক্তিধর্ম্ম, উভয়ের মধ্যে দূরত্ব প্রায় অপরিমেয়। রাষ্ট্রাশ্রিত ঈশাহীধর্ম্ম কালক্রমে কোন্ রূপ ধারণ করিয়াছে, তাহা আজ জগদ্বাসী প্রত্যক্ষ করিতেছে।

অহিংসনীতি ও অশোক

মানবজাতির ইতিহাসে অহিংসনীতিতে সাম্রাজ্য পালনের একটিমাত্র দৃষ্টান্ত আছে। সেই দৃষ্টান্ত চিরোজ্জ্বল, মহিমামণ্ডিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন মগধের সম্রাট দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী অশোক। ত্রয়োদশ অনুশাসনে তিনি বলিতেছেন, রাজা "প্রিয়দর্শী অভিষেকের অষ্টম বৎসরে কলিঙ্গদেশ জয় করেন। তাহাতে এক লক্ষ লোক আহত, দেড় লক্ষ বন্দী ও তাহার অনেকগুণ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কলিঙ্গ-বিজয়ের পর তাঁহার অনুশোচনা হইয়াছে। দেবপ্রিয় ইচ্ছা করেন, সকল জীব নিরাপদ ও সংযমী হউক। ধর্ম্মবিজয়কেই প্রিয়দর্শী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিবেচনা করেন।… এই উদ্দেশ্যে এই ধর্ম্মলিপি উৎকীর্ণ হইল—কি উদ্দেশ্যে?—আমার পুত্রপৌত্রগণ নূতন দেশ জয় বাঞ্ছনীয় মনে করিবে না।…তাহারা ধর্ম্মবিজয়কেই যথার্থ বিজয় মনে করিবে।" ঐতিহাসিকগণের মতে অশোকের অহিংসনীতির ফলে তাঁহার তিরোভাবের পরে মৌর্য্য সাম্রাজ্যের পতনদশা আসন্ন হইয়াছিল।

স্বাধীনতা

প্রাচী ও প্রতীচী এ-উভয়ত্রই ভক্তিধর্ম্মের আদর্শ, আরাধ্য দেবতার নিকটে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ। ভক্তের চিত্তে বাহিরের স্বাধীনতার

চিন্তা উদিত হইবার অবকাশ পায় না; অন্তরের স্বাধীনতাকেও তিনি সাধনের পরিপন্থী জানিয়া বিষবৎ পরিহার করেন। কিন্তু সমগ্র মানবজাতি যুগপৎ ভক্তিপথের পথিক হইবে, ইহা লক্ষ বৎসরেও সম্ভবপর কিনা, সন্দেহ। অপিচ, ধর্ম্মজীবনের চরম লক্ষ্য যে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ, তাহাতে উপনীত হইতে হইলে মানুষকে পরিপূর্ণ আত্মবিকাশের পথে অবিরত অবিচ্ছেদে অগ্রসর হইতে হইবে। অন্তরের ও বাহিরের স্বাধীনতা ব্যতিরেকে ব্যক্তির, সমাজের ও জাতির সুস্থ ও স্বাভাবিক বিকাশ অসম্ভব। ইহা বলিলে অসঙ্গত হইবে না, যে যাবৎ জগদ্বাসী প্রত্যেক ব্যক্তি অন্তরে ও বাহিরে অবাধ স্বাধীনতা না পাইবে, তাবৎ ভক্তিধর্ম্মের উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত হইবে না।

স্বাধীনতার ভাবটী অত্যন্ত আধুনিক। প্রাচীন সমাজ ছিল society of status, অর্থাৎ ইহার অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক নর নারী এক একটী নির্দ্দিষ্ট স্থান অধিকার করিত। স্বামী স্ত্রী, পিতা পুত্র, প্রভু ভৃত্য, রাজা প্রজা —যাহার যে স্থান, যে কর্ম্ম, যে অধিকার তাহা পরিবর্ত্তন করিবার স্বাধীনতা কাহারও ছিল না। অনেক দেশে --ভারতবর্ষেও-- এই ব্যবস্থা এখনও আছে। ফরাসী বিপ্লবের সময় হইতে মানুষ কতকগুলি নৈসর্গিক স্বত্বের দাবি করিয়া আসিতেছে। তন্মধ্যে, স্বাধীনতার স্বত্ব, চিন্তা ও বাক্যের স্বাধীনতা ও জাতীয় স্বাধীনতা—এই তিনটীর কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে চাই।

(১) ব্যক্তিগত স্বাধীনতা

স্বাধীনতার স্বপ্ন বলিতে মোটামুটি বুঝিতে হইবে সুশাসিত সমাজের কর্ত্তব্য, উহার অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিকে এমন সুযোগ প্রদান

করিবে, যাহাতে তাহারা পরস্পরের বা সমগ্র সমাজের কল্যাণের হানি না করিয়া স্বীয় স্বীয় বিভিন্ন গুণ ও শক্তির বিকাশ সাধন করিতে পারে।

যে-সকল সমাজে বর্ণগত ও ধর্ম্মগত বৈষম্য আছে তথায় তত্রস্থ প্রত্যেক ব্যক্তি পূর্ণরূপে ফুটিয়া উঠিবার সুযোগ ও সুবিধা পায় না। যে-দেশের ব্যবস্থা অনুসারে নারীগণ status-এর যুগে বাস করিতেছে, অর্থাৎ তাহারা বাল্যে পিতার, যৌবনে ভর্ত্তার ও বার্দ্ধক্যে পুত্রের অধীন, সে দেশে তাহাদিগের স্বচ্ছন্দ বিকাশের পথ অবরুদ্ধ।

অধিকন্তু, যে দেশের অধিবাসীরা উহার রাষ্ট্রীয় নীতি নিয়ন্ত্রিত করে না, তাহাদিগের পক্ষে দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির যথোচিত বিকাশসাধন করিবার উপায় দুর্লভ বা ব্যাহত হইতে পারে।

একথাও বলা উচিত যে, স্বাধীন অর্থাৎ বৈদেশিক শাসন হইতে মুক্ত প্রত্যেক দেশেই যে সমস্ত নরনারী পূর্ণ বিকাশের সুযোগ ও সাহায্য পায়, ইতিহাসে এমত প্রমাণ নাই।

(২) চিন্তা ও বাক্যের স্বাধীনতা

দ্বিতীয়, চিন্তা ও বাক্যের স্বাধীনতা। চিন্তার উপরে সরকারের বা সমাজের কোনও হাত নাই বটে, কিন্তু চিন্তার গুণাগুণ মনোবৃত্তির বিকাশ অর্থাৎ শিক্ষার উপরে নির্ভর করে। আবার চিন্তা প্রকাশ করিবার অধিকার না থাকিলে চিন্তার ধারা ক্ষীণ ও শুষ্ক হইয়া যায়। অতএব, চিন্তা ও বাক্যের স্বাধীনতা এক সূত্রে গাঁথা। এজন্য চাই, অনুকূল ও উদ্দীপক আবেষ্টন (a stimulating atmosphere)। অনুকূল আবেষ্টনের জন্য তিনটী ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক—(১) সুশিক্ষার ব্যবস্থা। (২) সমাজে অধিক হইতে অধিকতর লোকের মধ্যে উচ্চ শিক্ষার প্রসার-বৃদ্ধি। (৩) শিক্ষিত ব্যক্তিগণের উপযুক্ত কর্ম্মক্ষেত্র।

গণতন্ত্র ও স্বরাজ্য যে সর্ব্বত্রই এই তিনটীর অনুকূল, এমত বলা যায় না। পরাধীন দেশে যে প্রত্যেকটীই সুদুষ্কর, তাহা না বলিলেও চলে।

আবার দেখুন, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ও ধর্ম্মাচরণের স্বাধীনতাও নিত্যসঙ্গী নয়। ভারতবর্ষের ইতিহাসেও তাহার দৃষ্টান্ত আছে। ইয়ুরোপে ভুরিভুরি বিদ্যমান।

পরিশেষে, চিন্তা ও বাক্যের স্বাধীনতা অপর সকল স্বাধীনতার ভিত্তি বটে, কিন্তু কোথায় ইহার আরম্ভ, কোথায় শেষ, তাহা সুসভ্যতম দেশেও আজ পর্য্যন্ত কেহ নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। প্রলয়কালে এই স্বাধীনতা সুষুপ্ত থাকে।

(৩) জাতীয় স্বাধীনতা

তৃতীয়, জাতীয় স্বাধীনতা। এ বিষয়টীর আলোচনায় প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে মুখবন্ধস্বরূপ একটী ভ্রম নিরসন করা আবশ্যক। অনেকের ধারণা আছে যে, কোনও দেশের রাজা ও প্রজা এক জাতের অন্তর্ভুক্ত হইলেই সেই দেশকে স্বাধীন বলা যাইতে পারে। এই অর্থে হিন্দুরাজগণের রাজত্বকালে ভারতবর্ষ স্বাধীন ছিল ; কিন্তু জাতীয় স্বাধীনতার মাপকাঠি অন্যপ্রকার। স্বজাতি সমস্বাথী ও সমধর্ম্মযাজী রাজাও প্রজাপুঞ্জকে দাসত্বের পাষাণভারে নিষ্পেষিত করিতে পারেন। অষ্টম হেনরী যদিচ খাঁটি ইংরেজ ছিলেন, তথাপি তাঁহার রাজত্বকালে ইংরেজ জাতির স্বাধীনতা বিলক্ষণ খর্ব্ব হইয়াছিল। আবার, বর্ত্তমান রাজা ষষ্ঠ জর্জের পূর্ব্বপুরুষ প্রথম জর্জ খাঁটি জর্ম্মন ছিলেন ; তিনি এক বর্ণ ইংরেজী বলিতে ও বুঝিতে পারিতেন না ; কিন্তু তিনি ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহন করিলে ঐ দেশের স্বাধীনতা এক তিলও ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

জাতীয় স্বাধীনতা (National Freedom) বর্ত্তমান যুগে পৃথিবীর সকল দেশেই সমাদর লাভ করিতেছে। স্বাধীন জাতিগুলি উহা রক্ষার জন্য অকাতরে প্রাণ দিতেছে ; পরাধীন জাতিসকলও উহাকে পরম শ্রেয়ঃরূপে বরণ করিয়া ঔৎসুক্যের সহিত সুদিনের প্রতীক্ষা করিতেছে।

জাতীয় স্বাধীনতার অন্তরায়

জাতীয় স্বাধীনতা মানুষের একটা নৈসর্গিক অধিকার বলিয়া গণ্য হইলেও, সকল জাতিই যে ইহার যোগ্য, এ কথা অনেকে স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে দুই স্থলে এই সাধারণ নিয়মের প্রতিষেধ আছে। প্রথমতঃ, এক দেশে যদি অরাজকতা উপস্থিত হয়, এবং তদ্দেশবাসীরা উহা দমন করিতে না পারে, তবে উহার সহিত যাহার স্বার্থের সম্বন্ধ আছে, এমন নিকটস্থ বা দূরবর্ত্তী জাতির ঐ দেশ আক্রমণ ও আত্মসাৎ করিবার অধিকার আছে।

দ্বিতীয়তঃ, যে দেশের অধিবাসীরা স্বভাবদত্ত ধনের—যেমন কয়লা, লৌহ, ভূগর্ভস্থ তৈল—প্রভৃতি আবিষ্কার করিতে ও কাজে লাগাইতে জানে না, সে দেশ সুসভ্য ও সুকৌশলী জাতির অধিকারে থাকিবে, ইহাই স্বাভাবিক ও নীতিসঙ্গত নিয়ম বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত।

ভারতবর্ষের কথা

ভারতবর্ষ আভ্যন্তরীণ অরাজকতা ও বৈদেশিক শত্রু হইতে আত্মরক্ষা করিতে অক্ষম, এই যুক্তি নিরন্তন শুনা যাইতেছে। অজ্ঞাত ধন-সম্পদের আবিষ্কার ও কাজে খাটাইবার পথ বৈদেশিকেরাই প্রদর্শন করিয়াছেন,—ইহা একান্ত স্বদেশভক্ত ব্যক্তিও অস্বীকার করিতে পারেন না।

কিন্তু পরাধীনতার সপক্ষে এই দুইটী বলবতী যুক্তি অনড় ও অকাট্য হইয়া চিরবর্ত্তমান থাকিলেও ভারতবর্ষে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে।

আকাঙ্ক্ষাটী যে আকস্মিক কিংবা বিংশ শতাব্দীর একটা নব উপদ্রব, তাহাও নহে। শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে, ১৮২৭ সনে, রামমোহন রায় মানস চক্ষুতে ভবিষ্যতের অঙ্কে স্বাধীন ভারতের চিত্তহারিণী ছবি দর্শন করিয়াছিলেন। পরে, ভারতের জাতীয় মহাসমিতি ১৮৮৫ সন হইতে যাত্রা করিয়া উচ্চতর রাজকার্য্যে নিয়োগের অধিকার, ১৯০৬ সনে স্বরাজ, তদনন্তর Dominion status. এবং পরিশেষে ১৯৩০ সনে পূর্ণ স্বাধীনতা ভারতবাসীর নৈসর্গিক স্বত্ব বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

কিন্তু জাতীয় স্বাধীনতা একটা দানসামগ্রী নহে, উহা অর্জ্জন করিতে হয়। ভারতবর্ষ যে প্রায় দুই শতাব্দীকাল ইংরেজ জাতির শাসনাধীন থাকিয়াও স্বাধীনতার যোগ্যতা লাভ করে নাই, কর্ত্তৃপক্ষ তাহার প্রমাণ আমাদিগকে চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিতেছেন। প্রতিপক্ষের দুইটি যুক্তি বিচার্য্য।

প্রতিপক্ষের যুক্তি

(১) ভারতে জাতীয় একত্ব (Racial Unity) নাই।

(২ ধর্ম্মের একতা নাই।

প্রথম আপত্তির উত্তরে আমরা বলিতে চাই, racial unity বিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর কোন দেশেই নাই। এ দেশে জাতীয় স্বাধীনতার প্রবল পরিপন্থী ধর্ম্মের একতার অভাব। Racially সমগ্র হিন্দুসমাজ এক নয়, সমগ্র মুসলমান সমাজও এক নয়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও মুসলমান সমাজ এক। হিন্দুসমাজে একটা ভাবগত ঐক্যবোধ আছে।

জাতীয়তার সংজ্ঞা

জাতীয়তা (Nationalism or Nationality) জিনিসটী কি?

জিমার্ণ (Zimmern) বলেন, "জাতীয়তা (Nationality) একটা মনোভাব; একটা আধ্যাত্মিক সম্পদ; অনুভূতি, মনন এবং জীবন-যাত্রার একটা ধারা।"

গুচ্ (Gooch) লিখিয়াছেন, "যখন একদল লোক সংকল্প করে, তাহারা একত্র পরস্পরের সুখ দুঃখ সম্পদ-বিপদের অংশভাক্ হইবে, এবং আপনাদিগের কর্ম্মের উপরে অন্যনিরপেক্ষ কর্ত্তৃত্ব পরিচালন করিবে, তখন সেই সংকল্প জাতীয়তা (Nationalism) নামে অভিহিত হইয়া থাকে।"

ভারতবর্ষে উপর্য্যুক্ত দুই অর্থে জাতীয়তার ভাব আছে বটে, কিন্তু তাহা এমন ব্যাপক, গভীর, বেগবান ও দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠে নাই, যে ধর্ম্মগত ও জাতিগত বিভেদবৈষম্যকে সিক্ত, কোমল ও নমনীয় করিয়া জাতীয় ঐক্য গড়িয়া তুলিবে। ভারতের ভাগ্যবিধাতারা বারংবার স্পষ্ট করিয়া ঘোষণা করিতেছেন, যে-মুহূর্ত্তে হিন্দু-মুসলমান, শিখ-পার্সী, উন্নত-অনুন্নত সকলে মিলিয়া ঐকমত্যে উপনীত হইবে, সেই মুহূর্ত্তে জননী জন্মভূমির মলিন ভাগে স্বাধীনতার নবারুণচ্ছটা ফুটিয়া উঠিবে।

বর্ত্তমান জাতীয় সমস্যা

ভারতের বর্ত্তমান দুরূহতম জাতীয় সমস্যা, হিন্দুমুসলমানে সম্মিলন। চুয়ান্ন বৎসর পূর্ব্বে এই বিষয়ে একটা প্রতিযোগিতার পরীক্ষায় রচনা লিখিয়া পুরস্কার পাইয়াছিলাম। কিন্তু তাহার পরে দিন দিন সমস্যাটা অধিকতর জটিল ও দুঃসাধ্য হইয়া উঠিতেছে। এই এক স্থানে আর্য্যগণের বহিঃস্থ উপাদান স্বীয় দেহের অন্তর্ভুক্ত করিবার কালক্রমাগত শক্তি পরান্মুখ হইয়াছে।

খৃষ্টীয় শকারম্ভের পূর্ব্বে প্রায় দুই শত বৎসর ভারতবর্ষে কতকগুলি

যবন (গ্রীক) রাষ্ট্র ছিল। গ্রীকেরা অপর সকল জাতিকেই বর্ব্বর বলিয়া ঘৃণা করিত, কিন্তু ভারতবাসীদিগকে তাহারা শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিত। যবনেরা অনেকে বৌদ্ধ এবং অনেকে ভাগবত বা শৈবধর্ম্ম গ্রহণ করে। শকগণ কর্তৃক যবনরাজ্য বিলুপ্ত হইবার পরে গ্রীকেরা ভারতের দেহে লীন হইয়া গিয়াছিল।

তার পরে শক, হূন প্রভৃতি জাতি কিরূপে ক্ষত্রিয় হইল, বীর-কুলচূড়ামণি রাজপুতগণের পূর্ব্বপুরুষেরা কোন্ দেশ হইতে আসিয়া সূর্য্য-চন্দ্র-অগ্নিকুলে স্থান পাইল, সে কাহিনী পুরাণে ইতিহাসে প্রকট আছে।

কিন্তু যে আর্য্যজাতি প্রায় দুই সহস্র বৎসর ধরিয়া বহিঃশত্রুকে হয় বাহুবলে পরাস্ত করিয়া স্বদেশের বাহিরে দূর করিয়া দিয়াছে, অথবা পরাজিত হইয়াও জ্ঞানধর্ম্মে জেতাকে জয় করিয়া আত্মস্থ করিয়াছে, তাহারা একাদশ শতাব্দীতে ও তৎপরে মুসলমানদিগকে প্রতিরোধও করিতে পারিল না, আপনার করিয়া লইতেও পারিল না।

পরাধীনতার কারণ

ইসলামের উপদ্রব হইতে ভারতবর্ষ যে আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই, তাহার কারণ বাহুবলের অভাব নয়, অভাব ঐক্যের। ঐক্যের অভাব এ দেশের চিরন্তন বিশেষত্ব।

খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে সেকেন্দর সাহ (Alexander the Great) দিগ্বিজয় করিতে করিতে যখন ভারতসীমান্তে উপস্থিত হইলেন, তখন পঞ্চনদের একতম নৃপতি পুরুরবা (Poros) তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন, আর তক্ষশীলার রাজা শত্রুর সহিত মৈত্রী স্থাপন করিলেন। সীমান্ত প্রদেশের সমস্ত রাষ্ট্র সমবেত হইলে মহাবীর সেকেন্দর ভারতে প্রবেশ করিতেই পারিতেন না।

ইসলামের প্রথম অভিযান আর্য্যাবর্ত্তের নৃপতিবৃন্দ সংঘবদ্ধ হইয়া প্রতিরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু পাঠান আক্রমণকালে পৃথ্বীরাজের বিরুদ্ধে স্বদেশদ্রোহী জয়চাঁদ আবির্ভূত হইলেন।

কথিত আছে, ইব্রাহিম লোদীকে জব্দ করিবার মানসে রাণা সংগ্রাম সিংহ মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা বাবরকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন। বস্তুতঃ কুরুপাণ্ডবের যুগ হইতে বিগত শতাব্দীতে শিখ-মারাঠাশক্তিপুঞ্জের অধঃপতন পর্য্যন্ত অনৈক্য, স্বার্থপরতা এবং অদূরদর্শিতা হিন্দুগণের শৌর্য্যবীর্য্যকে বারংবার নিষ্ফল করিয়া দিয়াছিল।

পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদ

হিন্দুমুসলমান এতকাল পরস্পরের প্রতিবেশী হইয়াও যে এক রাষ্ট্রীয় জাতি (nation) গঠন করিতে পারে নাই, তাহার কারণ দুইটী—প্রথম পৌত্তলিকতা, দ্বিতীয় জাতিভেদ। দুইটীই ইসলামের অন্তঃসত্তার বিরোধী।

পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদ বহুল পরিমাণে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিক্রিয়ার ফল। মহাযানের চিত্তাকর্ষণশক্তি আয়ত্ত করিবার উদ্দেশ্যে সমাজপতি ব্রাহ্মণগণ বৈদিক নিরাকারবাদের স্থলে প্রতিমা পূজা প্রবর্ত্তন করিলেন। এবং বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে প্রাচীন সমাজে যে ভাঙ্গন ধরিয়াছিল তাহা নিবারণ করিবার জন্য বর্ণাশ্রম ধর্ম্মকে বলিষ্ঠ করিয়া তুলিলেন। উহার প্রশংসা করিবার কালে সুধীগণ এ কথাটা বলিতে ভুলিয়া যান যে, সুদূর অতীতের বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচণ্ড আঘাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার প্রয়োজনে উহার উপযোগিতা যতই থাকুক না কেন, বর্ত্তমান যুগে আশ্রম-চতুষ্টয়ের তিনটী অপ্রচলিত এবং চাতুর্বর্ণ্য আদিতে যদি গুণ-কর্ম্ম-বিভাগের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াও থাকে—বহু শতাব্দী যাবৎ উহা জন্মগত হইয়া পড়িয়াছে। সত্ত্বাদি গুণ এবং ধর্ম্মচর্চ্চাযুদ্ধাদি কর্ম্মশক্তি বংশানুক্রমে

সংক্রামিত হয় না, ইহা শুধু একটা বৈজ্ঞানিক মত নয়, চক্ষুর সম্মুখে তাহা আমরা অহরহ দেখিতেই পাইতেছি। সুতরাং জন্মগত জাতিভেদ অবৈজ্ঞানিক, অনুপযোগী এবং অন্যায়। আদিম যুগে, যখন দলবদ্ধ মানুষকে নিরন্তর অপর দলের সহিত যুদ্ধ করিতে হইত, যখন "মার, নতুবা মর"—ইহাই সমাজনীতির প্রথম সূত্র ছিল, তখন জাতিবিভাগের সৃষ্টি হয়। তখন সমাজে দৃঢ়িষ্ঠতা এবং বৈচিত্র্য সঞ্চার করিয়া জাতিভেদ উহার জীবনরক্ষার সহায় হইয়াছিল। কিন্তু অভিব্যক্তির প্রথম সোপানে যাহা পথ্য, দ্বিতীয় সোপানে তাহাই বিষের ক্রিয়া করে। তাহার প্রমাণ, যে সকল নেশনে জাতিভেদ নাই, সেগুলি অবিচ্ছেদে উন্নতিপথে অগ্রসর হইতেছে, পক্ষান্তরে জাতিবিভাগগ্রস্ত নেশনের উন্নতি থামিয়া গিয়াছে! (Bagehot, Physics & Politics)।

বর্ণধর্ম্ম সম্বন্ধে আরও একটী কথা বলিবার আছে। জাতীয় গর্ব্ব, অর্থাৎ "আমরা ভূতলে অতুল"—এই প্রকার অহমিকা প্রাচীনকালে ইহুদী, গ্রীক প্রভৃতি অনেক জাতিরই ছিল, এবং বর্ত্তমান কালে পশ্চিম ভূখণ্ডে উগ্রমূর্ত্তি ধরিয়াই আছে। কিন্তু একই ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত মানুষের মধ্যে জন্মগত জাতিবৈষম্য ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোথায়ও নাই। অধিকন্তু সমধর্ম্মী সমাজে মানুষ মানুষের অস্পৃশ্য হইতে পারে, ইহা অন্য দেশে কল্পনার অগোচর। এই জন্যই ইংরেজী অভিধানে Untouchability শব্দটী নাই।

জাতীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত

কি ব্যক্তিগত জীবনে, কী জাতির জীবনে, পাপের প্রায়শ্চিত্ত অবশ্যম্ভাবী। জাতিগত অপরাধের দণ্ড বংশের পর বংশকে আক্রমণ করে। The fathers have eaten sour grapes and the children's teeth are set on edge" (Ezek 18.2) "পিতৃপুরুষেরা টক আঙ্গুর

খাইয়াছে, তাহাতে সন্তানসন্ততির দাঁত টকিয়া গিয়াছে।" বঙ্গে সেন-রাজত্বকালে নব-ব্রাহ্মণ্যের দ্বারা জাতিভেদ লৌহগণ্ডীতে আবদ্ধ হইল; তাহার ফলে ডোম, নমঃশূদ্র প্রভৃতি যাহারা বাহুবলে অগ্রগণ্য ছিল, তাহারা অস্পৃশ্য বলিয়া গণ্য হইয়া সমাজের নিম্নতর স্তরে স্থান পাইল। ব্রাহ্মণেরা বৌদ্ধদিগের উপরে এমন দুঃসহ অত্যাচার করিয়াছিলেন যে তাহাদিগের শূন্যপুরাণে বর্ণিত আছে, এই পাপের দণ্ড বিধান করিবার উদ্দেশ্যে দেবগণ মুসলমানরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন—

"ব্রহ্মা হৈলা মহামদ বিষ্ণু হৈলা পেকম্বর আদম্ফ হৈল শূলপানি;
গণেশ হইল গাজী কার্ত্তিক হইল কাজি ফকির হইল যত মুনি।"
(ব-সাঃ পরিচয়, ২৪ পৃঃ)

উত্তর ও পূর্ব্ব বঙ্গে বৌদ্ধের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক ছিল; উৎপীড়িত বৌদ্ধগণ দলে দলে ইসলামের আশ্রয় লইল। বিংশ শতাব্দীর Communal Award-রূপ বিষবৃক্ষের বীজ বঙ্গদেশে এইরূপে উপ্ত হইয়াছিল প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে।

বঙ্গে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ আধুনিক

বঙ্গদেশে সাম্প্রদায়িকতার বিষোদ্গার অত্যন্ত আধুনিক। পাঠান-রাজগণ বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের উৎসাহদাতা ছিলেন। তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষা বলিতেন; তাঁহাদেরই আনুকূল্যে মহাভারত ও ভাগবত প্রথম বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হয়। মুসলমান কবিগণের কাব্য, বৈষ্ণব পদাবলি, গীতিকা বঙ্গসাহিত্যে চিরজীবি হইয়া রহিয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিরচিত সমসের গাজির গানে উক্ত হইয়াছে—

"তাহার নিকটে জান সকলি সমান।
নাহিক প্রভেদ কিছু হিন্দু মুসলমান॥"
(ব-সাঃ প। ১৮৫১ পৃঃ)

শতবর্ষ হয় নাই, নিরক্ষর মুসলমান কৃষক পাগলা কানাই গাহিয়াছেন—

"এক বাপের দুই বেটা তাজা মরা কেহ নয়!
সকলেরি এক রক্ত এক ঘরে আশ্রয়॥
এক মায়ের দুধ খেয়ে এক দরিয়ায় যায়!"

(ঐ ১৮৯৫ পৃঃ)

এ সেই প্রেমের সুর, সেই মিলনের সুর, যাহা মধ্যযুগে ভক্তির সাধক কবীর, দাদু, নানকের কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হইয়া জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে তৃষিত নরনারীর চিত্তকে স্নিগ্ধ করিয়াছিল।

অন্তরের ও বাহিরের স্বাধীনতা

আমরা ভক্তিধর্ম্মের প্রসঙ্গ হইতে যাত্রা করিয়াছিলাম, আবার সেখানেই ফিরিয়া আসিলাম। জাতীয় স্বাধীনতা বাঞ্ছনীয় বস্তু, কেন না, পরাধীন জাতি সকল দিকে বিকশিত হইবার সুযোগ পায় না। কিন্তু উহাও বাহ্য, এবং অন্তরের স্বাধীনতার তুলনায় দ্বিতীয় স্থানীয়। যে ব্যক্তি পূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার অধিকারী, কিন্তু আপনাকে ষড় রিপুর আধিপত্য হইতে মুক্ত করিতে পারে নাই, সে যথার্থই পরাধীন। আবার দাসের দাস এপিকটীটস্ বলিতে পারিয়াছেন, "আমার উপর মানুষের কোনও ক্ষমতা নাই। ঈশ্বর আমাকে স্বাধীন করিয়া দিয়াছেন।"

ধর্ম্ম ও স্বাধীনতার সংগ্রাম

ভারতের চিরন্তন সাধনধারা আত্মার স্বাধীনতাকেই লক্ষ্য করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান যুগ জাতীয় স্বাধীনতার যুগ। মহাসাগরের পশ্চিম পার হইতে বিপ্লবের তরঙ্গ আসিয়া এদেশে জনগণের হৃদয়-মনকে আন্দোলিত করিতেছে। এখন ভারতবাসীকে তাহার চিরাগত অধ্যাত্ম সম্পদটী সযত্নে রক্ষা করিতে হইবে। স্বাধীনতাগর্ব্বী,

মদোন্মত্ত পাশ্চাত্য সভ্যতার তাণ্ডবলীলা আমাদিগকে জাতীয় সংগ্রামের ভয়াবহ উন্মাদনা দেখাইয়া দিতেছে। বর্ত্তমান যুদ্ধারম্ভের কয়েক মাস পূর্ব্বে আসন্ন মহাপ্রলয়ের দুর্লক্ষণ দেখিয়া টয়ন্‌বী বলিতেছেন :—

"বর্ত্তমান কালে ইয়ুরোপে রাষ্ট্রীয় জাতিস্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা (Political Nationalism) ধর্ম্মের উপরে জয় লাভ করিয়াছে। পাশ্চাত্য গণতন্ত্র, এবং সঙ্কীর্ণ আত্মসর্ব্বস্ব রাষ্ট্র, এই দুইটীর সংঘাত হইতে ঐ কুফল উৎপন্ন হইয়াছে।"

"গণতন্ত্রের স্বাভাবিক কর্ম্মক্ষেত্র সমগ্র মানবমণ্ডলী। কিন্তু এই প্রবল আধ্যাত্মিক পরিচালনী শক্তি যখন বিপথে যাইয়া সঙ্কীর্ণ আত্মসর্বস্ব রাষ্ট্রের সংরক্ষণে নিয়োজিত হয়, তখন উহা বিশ্বমানবের পক্ষে কল্যাণপ্রসূ না হইয়া ভয়ঙ্কর ধ্বংসের কারণ হইয়া উঠে।"

পূর্ব্বোক্ত ঐতিহাসিকের মতে, গণতন্ত্র এবং শিল্পবাণিজ্যের যুগান্তরকারী বিপ্লব, এই দুইটী একত্র হইয়া পশ্চিম মহাদেশকে মৃত্যুমুখে আনয়ন করিয়াছে। অধিকন্তু "পাশ্চাত্য জগতে পাপবোধ বিলুপ্ত হইয়াছে।" —vol. V, p. 438.

যে-প্রকার জাতীয়, স্বাধীনতা, দুর্দ্দমনীয় জাতীয় স্বার্থপরতা সৃষ্টি করে, তারা মানুষের পরম শ্রেয় বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। ধর্ম্মই সর্ব্বাগ্রে সন্তর্জনীয়; তৎপশ্চাৎ স্বদেশানুরাগ। অথবা ভগবৎপ্রীতি-প্রণোদিত স্বদেশ প্রীতিই আমাদিগের কাম্য বস্তু। আমরা যেন মুহূর্ত্তের তরেও ভুলিয়া না যাই যে, ধর্ম্মবিমুখ স্বদেশভক্তি নিদারুণ দুর্গতির প্রসূতি। যে মরণজয়ী দেশাত্মবোধ দুই বিভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত জাতির অসম প্রকৃতিকে দ্রবীভূত করিয়া একটী বিপুল সংহতিশক্তিতে পরিণত করিতে পারে, ধর্ম্মবিরোধী আবেষ্টনে কিংবা ধর্ম্মান্ধতার ঊষর ভূমিতে সে প্রীতি অঙ্কুরিত হয় না; তাহার জনয়িত্রী ভগবদ্‌ভক্তি।

জাতীয় ঐক্য বিধায়ক সংস্কার

স্বাধীনতাকামী স্বদেশসেবকদিগকে দেহমনের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিবার জন্য আহ্বান করিতেছে হিন্দুমুসলমানের মিলনকে সহজসাধ্য করিয়া তুলিবার জন্য। আভ্যন্তরীণ সংস্কার বিনা এই সাধন সিদ্ধ হইবার নহে। হিন্দুসমাজ খণ্ডিত, বহুধাবিভক্ত, অনৈকাজর্জ্জর! হিন্দু জাতির স্পৃশ্য অস্পৃশ্য, আচরণীয় অনাচরণীয়, উচ্চবর্ণ নিম্নবর্ণ প্রভৃতি জন্মগত বিভেদ দূর হউক; হিন্দুজাতি একমতি, একপ্রাণ, সমকর্ম্মী, সমধর্ম্মী হউক; তখন হিন্দুগণ ঐক্যবলে দুর্নিবার মুসলমানসমাজকে সমকক্ষরূপে মৈত্রী বন্ধনের বৃহৎ ব্রতে আহ্বান করিতে পারিবে।

মহম্মদ মানুষের অন্তর্নিহিত ধর্ম্মের প্রবৃত্তি ও সাম্রাজ্যের প্রবৃত্তি, এই দুইটীকে এক সূত্রে গ্রথিত করিয়া গিয়াছেন। এই জন্যই ইস্লাম জগতে ধর্ম্ম ও রাষ্ট্রের মধ্যে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ বিদ্যমান। সাকারবাদের ঘোরতর বিরোধী মোস্লেম সমাজের সহিত রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে মিলিত হইতে চাহিলে, যে-জাতি যুগ যুগ ধরিয়া নিরাকার-ব্রহ্মোপাসনাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রচার করিয়া আসিতেছে, তাহের পথে তাহাদিগকেই অগ্রসর হইতে হইবে। এক অদ্বিতীয় নিরবয়ব পরমপুরুষ মানুষের একমাত্র আরাধ্য,—বেদান্ত এবং কোরাণ উভয়েই এই মহতী বাণী ঘোষণা করিতেছে। যাঁহারা বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাঁহারাও স্বীকার করিয়াছেন, বর্ণাশ্রমধর্ম্মের উপরে সমগ্র মানবজাতির এক সাধারণ ধর্ম্ম আছে। শান্তিপর্ব্বে পরাশর জনকের নিকটে বিশেষ ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিবার পরে বলিতেছেন—

আনৃশংস্যমহিংসা চাপ্রমাদঃ সংবিভাগিতা।
শ্রাদ্ধকর্ম্মাথিতেয়ঞ্চ সত্যমক্রোধ এব চ॥

স্বেষু দারেষু সন্তোষঃ শৌচং নিত্যানসূয়তা।
আত্মজ্ঞানং তিতিক্ষা চ ধর্ম্মাঃ সাধারণা নৃপ॥

২৯৬ ২৩।২৪

"অনৃশংসতা, অহিংসা, অপ্রমাদ, সম্যক্‌রূপে অর্থ বিভাগ শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া, অতিথিসেবা, সত্য, অক্রোধ, স্বভার্য্যায় সন্তোষ, শৌচ, অসূয়া-পরিহার, আত্মজ্ঞান এবং তিতিক্ষা,—এই সকল মনুষ্যের সাধারণ ধর্ম্ম।" শ্লোক দুইটিতে বারটী নৈতিক গুণ উল্লিখিত হইয়াছে, সেগুলি সেশ্বর ও নিরীশ্বর, উভয় প্রকার ধর্ম্মের লক্ষণ। তৎসঙ্গে আত্মজ্ঞান যুক্ত হইয়া এক সর্ব্বজনসেব্য সার্ব্বভৌম ধর্ম্মের স্বরূপকে পূর্ণতা দান করিয়াছে। আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মাকে না জানিলে মানুষ নৈতিক জীবনের ঊর্দ্ধে আধ্যাত্ম জীবনে প্রবেশ করিতে পারে না। এই উদার বিশ্বজনীন ধর্ম্মের সাধনক্ষেত্রে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে ভারতবাসী সকলে অবাধে মিলিত হইতে পারে। শিক্ষা, সাহিত্য, ব্যবসায় বাণিজ্য, এক দণ্ডনীতির অধিনে, এক শাসনচক্রের মধ্যে বাস, একত্র রাষ্ট্রীয় সুখদুঃখভোগ—জাতীয় ঐক্যবন্ধনের যতগুলি পন্থা আছে, সে সমুদয়ের মধ্যে সর্ব্বোত্তম পন্থা এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের সমবেত আরাধনা। এই দুর্ভাগ্য দেশে জাতিতে জাতিতে শিক্ষায় সভ্যতায় আকাঙ্ক্ষায় প্রচেষ্টায় ভেদের অন্ত নাই; তদুপরি নিত্য নব নব অভাবনীয় ভেদ অঙ্কুরিত ও প্রবৃদ্ধ হইতেছে। এগুলিকে নির্জ্জীব ও নির্ব্বিষ করিতে হইলে উভয় পক্ষকেই সাম্প্রদায়িক ও প্রাদেশিক স্বতন্ত্রতার উপরে জোর না দিয়া, যাহা সার্ব্বভৌমিক, সর্ব্বজনগ্রাহ্য ও সর্ব্বজনসেব্য, তাহাকেই মিলনের সূত্ররূপে গ্রহণ করিতে হইবে। এমন কোন্ ধর্ম্ম আছে, যাহাতে ঔদার্য্য, প্রেম ও ভক্তি ধর্ম্মের স্বরূপ বলিয়া গৃহীত হয় নাই?

শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে রামমোহন রায় ঐ ভিত্তির উপরেই, বিশ্ব-মানবের মিলনোপায়ের দিঙ্‌নির্দ্দেশ করিবার মানসে একটী সাধনমন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। মহামহীরুহের বীজ অতিক্ষুদ্র; উহা লোকচক্ষুর অন্তরালে অঙ্কুরিত হয়; ধীরে ধীরে ক্ষীণ তরুশিশু বাড়িতে থাকে, সুদীর্ঘকাল অন্তে বনস্পতি দূরবিস্তারী শাখা প্রশাখা প্রসারিত করিয়া পশুপক্ষী মনুষ্যকে আশ্রয় দান করে। ধর্ম্মের বিস্তারও এইরূপ মন্থরগতি; কেন না, নব তত্ত্ব মানুষকে তীব্র বেদনা দেয়। সে নিদ্রাজাগরণের সন্ধিক্ষণে একটা অস্বস্তি বোধ করে। মহাপুরুষেরা প্রতিকূল পরিবেষ্টনের মধ্যে আশার আলোকে সুদূর ভবিষ্যতে যে সাফল্য দেখিতে পান, প্রাকৃত জনের নয়নে তাহা দুরধিগম্য। রামমোহন অন্তরে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, শীঘ্র হউক বিলম্বে হউক, অগ্নিপরীক্ষার সহস্র কিংবা লক্ষ বৎসর পরে হইলেও মানব জাতি অন্তহীন দুঃখ সহিয়া মধ্য দিয়া বারংবার আত্মঘাত করিতে উদ্যত হইয়া পরিশেষে তমস-ঘনঘোরা গহন রজনীর পরপারে জ্যোতির্ময় মহামিলনের পুণ্য তীর্থে উপনীত হইবে; জগতে সংস্কারমুক্ত, জ্ঞানানুগত, প্রেমমধুর নির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম জয়লাভ করিবে। সে ধর্ম্মের উপদেষ্টা স্বয়ং ভগবান্।

যে-বৈ ভগবতা প্রোক্তা উপায়া হ্যাত্মলব্ধয়ে।
অঞ্জঃ পুংসামবিদুষাং বিদ্ধি ভাগবতান্ হিতান্॥

ভাগ। ১১।২,৩০

“ভগবানের মাহাত্ম্য বিষয়ে অজ্ঞ মানুষদিগকে ভগবান পরমাত্মপ্রাপ্তি সম্বন্ধে সাক্ষাৎভাবে যে-সকল উপায় বলিয়াছেন, তাহাকেই ভাগবত জানিবে।”

নবযুগের নীতি ও ধর্ম্ম

নবযুগের নীতি ও ধর্ম্ম

ভূমিকা

যুবকবিদ্রোহ

বিংশ শতাব্দী বিদ্রোহের যুগ। পৃথিবীময় যুবকদল প্রাচীনত্বের বিরুদ্ধে, কুলাগত আচার ব্যবহারের বিরুদ্ধে, সনাতন নিয়মনিষ্ঠার বিরুদ্ধে, পূর্ব্বপিতৃগণ-প্রদর্শিত পন্থার বিরুদ্ধে, সর্ব্বজনমান্য ধর্ম্ম ও নীতির বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিয়াছে। The Revolt of the Modern Youth, The Youth Movement ইত্যাদি অসংখ্য পুস্তক ইতোমধ্যেই বিপ্লববাদী সাহিত্যকে বিপুলায়তন করিয়া তুলিয়াছে।

কিন্তু প্রাচীনত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে হইলে যুবজনের উচিত ছিল, সর্ব্বাগ্রে বিদ্রোহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হওয়া; কেন না, বিদ্রোহ জিনিসটাই মানবজাতির ইতিহাসে সব চেয়ে পুরাতন। ইহা একটা সুপরিচিত তত্ত্ব যে, যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তক বুদ্ধ, ঈশা, মহম্মদ বিদ্রোহী ছিলেন। ঈশা শুধু বিদ্রোহী ছিলেন না; তিনি ছিলেন a political criminal, "দণ্ডিত রাজনৈতিক অপরাধী।" কিন্তু ইঁহারাও আধুনিক। লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে ধরাতলে জীবের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্রোহের সূচনা হইয়াছে। যে সকল ইতর জীব নৈসর্গিক শক্তির সহিত সংগ্রামে দাঁড়াইতে পারে নাই, তাহারা নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে; যাহারা টিঁকিয়া থাকিতে পারিয়াছে, তাহাদের মধ্য দিয়াই ক্রমবিকাশের মূল বিধি "যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন"

(survival of the fittest) মানবের অভিব্যক্তি সাধন করিয়াছে। সুতরাং যুবজনের বিদ্রোহে মৌলিকতা নাই; ইহাও গতানুগতিক, তবে, ইহাতে বিশেষত্ব আছে; সেইটাই আলোচ্য।

নীট্‌জ্‌শের বাণী

যুবকান্দোলনের আদিভূমি জর্ম্মনী এবং প্রধান প্রবক্তা নীট্‌জ্‌শে (Nietzsche)। বিগত শতাব্দীর শেষ যামে তিনি ঘোষণা করিলেন—

(১) ব্যক্তিত্বে ও ব্যক্তিত্বের বিকাশেই মানুষের পরিত্রাণ (Individualism is salvation, the culture of the individual)।

(২) প্রত্যেক মানুষ স্বতন্ত্র জীব; প্রত্যেকের অন্তঃস্থ বাণী তাহাকে বলিতেছে, "তুমি যাহা তাহাই হও" (Be thou thyself)।

(৩) স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, শ্রেষ্ঠ অর্থে স্বাধীনতাই শিক্ষার নিগূঢ় সঙ্কেত। (Liberty is the key to the problem of education)।

(৪) প্রচলিত নীতির খাতিরে আপনাকে বিসর্জ্জন দেওয়া অপেক্ষা খাঁটি থাকিয়া অন্যায় করাও ভাল; কেন না, যে-ব্যক্তি স্বাধীন, সে ভাল ও মন্দ, দুই-ই হইতে পারে।

(৫) কোন ধর্ম্মেই সত্য নাই; খৃষ্টধর্ম্ম অস্পৃশ্য!

(৬) শ্রেয়ঃ কি? যাহা কিছু শক্তির বোধ, শক্তির সাধন, শক্তিকেই উন্নত করে, তাহাই শ্রেয়ঃ বা কল্যাণ।

অশ্রেয়ঃ কি? অশক্তির ফলই অশ্রেয়ঃ বা অকল্যাণ। (*Life* by Mugge)

জীবনের অন্তিম এগার বৎসর উন্মাদাবস্থায় কাটাইয়া নীট্‌জ্‌শে ১৯০০ সনে দেহত্যাগ করেন। তাহার দশ বার বৎসর পরে জর্ম্মনীতে

"পরিব্রাজক" নামক যুবকসংঘ স্থাপিত হয়। এই প্রকার আরও কয়েকটী সমিতি যুব-জনকে মিলিত করিয়া শিক্ষা ও নীতির ক্ষেত্রে বিপ্লবের সূচনা করে। এক দল অবাধ ভোগলালসার পক্ষপাতী ছিল, তাহারা হীনবল ও নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে। দ্বিতীয় দলের এক শাখা ধর্ম্মের সহিত সংস্রব রাখে না, কিন্তু উন্মার্গগামিতার বিরোধী; দ্বিতীয় দল প্রচলিত রোমান কাথলিক ধর্ম্মের ভক্ত। প্রথম দলের মূল মন্ত্র তিনটী—

(১) নগরে নগরে ব্যভিচারের যে পৈশাচিক লীলা চলিতেছে তাহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

(২) দেহ ও সৌন্দর্য্যবোধকে বিসর্জ্জন দিয়া যে শিক্ষাপ্রণালী মস্তিষ্কের বিকাশকেই সারসর্ব্বস্ব করিয়াছে, তাহার প্রতিরোধ।

(৩) দেহের অনুশীলন ও আত্মার অনুশীলনের মধ্যে যে ঐকান্তিক বিভেদ রচিত হইয়াছে, তাহার অপসারণ।

এই দল লক্ষ লক্ষ যুবকযুবতীর অন্তরে আদর্শ ও ব্যবহারে শুদ্ধতার বোধ উদ্দীপ্ত করিয়া দেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছে।

পক্ষান্তরে আমেরিকায় যুবজনের বিদ্রোহ মহানদী মিসিসিপির সর্ব্বগ্রাসী প্লাবনের মত পাপাচারের বন্যায় সমাজকে রসাতলে লইয়া যাইতেছে।

এ দেশেও তরুণগণের মধ্যে নবজাগরণ দেখা দিয়াছে। স্বাধীনভাবে বিকশিত হইবার আকাঙ্ক্ষা, প্রাচীন সংস্কারের বন্ধন হইতে মুক্তির প্রচেষ্টা, রাষ্ট্রতন্ত্র ও শিক্ষামন্দিরে আত্মকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াস স্ফুটতর ও ব্যাপকতর হইয়া উঠিতেছে। হওয়াই উচিত; অলস, সুষুপ্ত, উদ্যমহীন, মহতীকামনাবিরহিত যৌবনকাল নিরর্থক, তরুলতামৃগ-পক্ষীর জীবনতুল্য।

তরুণ-প্রগতির দুই ধারা

অদ্যকার বক্তব্য, তরুণ-প্রগতির বিশ্লেষণ ও বিচার। আমরা দেখিতেছি, বিদ্রোহের স্রোতঃ দুই ধারায় প্রবাহিত হইতেছে—(১) এক দল ধর্ম্ম ও নীতির ধ্বংসকামী; (২) দ্বিতীয় দল ধর্ম্ম ও নীতির পুনর্গঠনপ্রয়াসী।

(১) যাহারা ধর্ম্ম ও নীতির ধ্বংস কামনা করে, তাহাদিগের সম্বন্ধে অধিক সময় অপহরণ করিবার প্রয়োজন নাই। এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ইহাদিগের দুশ্চেষ্টাতে পুরাতনের অনুকরণ আছে, নূতন কিছু গড়িবার মত বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। ভোগই মানব জীবনের চরম চরিতার্থতা, এই মত এবং এতদনুরূপ ব্যবহার মানবজাতির ন্যায়ই পুরাতন। কোটি কোটি পুরুষ নারী ইহার উর্দ্ধে আর কিছুই দেখিতে পায় না। যুগযুগান্তর ধরিয়া মোহান্ধ প্রাকৃতজন দৈহিক সুখের পশ্চাতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ইন্দ্রিয় তৃপ্তির সমর্থন করিবার জন্য দার্শনিকের অভাবও কোন কালে কোন দেশেই ছিল না, এখনও নাই। কত শতাব্দী হইল ভারতবর্ষে চার্ব্বাক প্রচার করিলেন, "যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ", যত দিন জীবিত থাকিবে, ততদিন সুখভোগ করিবে, কেন না, "ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ", দেহ একবার ভস্মীভূত হইলে কিরূপে পুনরায় আগমন করিবে? চার্ব্বাকের প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে, খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দে পশ্চিম ভূখণ্ডে সোক্রাটীসের শিষ্য আরিষ্টিপ্পস সুখবাদী কুরীনী-প্রস্থান প্রতিষ্ঠা করিয়া তত্ত্ব ও ব্যবহার দ্বারা শিক্ষা দিলেন, "যাহা আরামজনক, যাহা সুখকর, তাহাই ভাল, তাহাই শ্রেয়ঃ। যাহা আরামের প্রতিকূল, কিংবা যাহা ক্লেশকর, তাহাই মন্দ, অর্থাৎ অশ্রেয়ঃ।" সুতরাং যাহারা আত্মবিকাশের নামে আত্ম অর্থাৎ ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকেই বরণ করিয়াছে, তাহাদিগের মত ও আচরণ একেবারেই সেকেলে।

(২) স্বাধীনতা, ব্যক্তিত্বের অবাধ বিকাশ, অন্ধ নিয়মানুগত্যের পরিহার, শক্তির সাধন, বলহীনতার স্থলে বলোপার্জ্জন,—এগুলির সহিত নীতি ও ধর্ম্মের বিরোধ নাই; শুধু বিরোধ নাই, তাহা নহে; এগুলি বিশুদ্ধতম অর্থে ধর্ম্ম ও নীতির সাধ্যবস্তু। কিন্তু প্রাচীনপন্থীদিগের সহিত বিদ্রোহী দলের বিরোধ দাঁড়াইয়াছে প্রত্যেকটীর ভাষ্যে ও তাৎপর্য্যে। এজন্য একটু বিশদ আলোচনা আবশ্যক।

নীতি—প্রাচীন ও নবীন

জড় ও জীবজগতের ন্যায় নীতি ও ধর্ম্মেরও ক্রমবিকাশ চলিতেছে। সুতরাং এক যুগের সামাজিক বিধিব্যবস্থা পরবর্ত্তী যুগে অনুপযোগী হইয়া পড়িবে, ইহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। কিন্তু এ স্থলে দুইটী বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে। প্রথমতঃ, কতকগুলি নৈতিক তত্ত্ব সার্ব্বভৌম বলিয়া সকল দেশে ও সকল কালে স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। সত্য ও মিথ্যা, স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতা, ইন্দ্রিয়সংযম ও ইন্দ্রিয়পরবশতা—এতদনুরূপ নৈতিক প্রশ্নের বিচারে মতবৈষম্যের অবসর নাই। পিতামাতার প্রতি ভক্তি, দাম্পত্য প্রেম, অপত্যস্নেহ, সৌভ্রাত্র, অকপটতা, বিশ্বস্ততা, নিয়মানুগত্য প্রভৃতি যে-সকল গুণের উপরে পরিবার ও সমাজ প্রতিষ্ঠিত, সেগুলি সম্বন্ধেও শ্বেত ও কৃষ্ণ, পীত ও লোহিত ইত্যাদি জাতিসমূহের মধ্যে ঐকমত্য আছে। তবেই দ্বিতীয়তঃ প্রশ্ন উঠিতেছে—নীতি,

morality, ethicsএর পুনর্গঠন কোন্ ক্ষেত্রে অপরিহার্য্য, অনিবার্য্য, অধিকন্তু একান্ত আবশ্যক বলিয়া তরুণ সমাজে অনুভূত হইতেছে ? প্রশ্নটী বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে, সংস্কারের দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষার মূলে আছে, মানুষের আদিম বৃত্তি, elemental passion, অর্থাৎ প্রথম রিপু। পাতিব্রত্য ও একপত্নীত্ব এতকাল দাম্পত্য সম্বন্ধের আদর্শরূপে পরিকীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছিল। সীতা ও সাবিত্রী, আণ্ড্রমাখী ও আল্‌কেষ্টীস, রামচন্দ্র ও হেক্‌টোরের কাহিনী অতি পুরাতন। চারি পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে হিন্দু ও মুসলমান গ্রাম্য কবির গীতিকায় কি মহীয়সী সতীচিত্রই অঙ্কিত হইয়াছে। কিন্তু অধুনা বিদ্রোহীরা প্রচার করিতেছে, "বিবাহ একটা পবিত্র ধর্ম্মানুষ্ঠান (a sacrament), ইহা স্বীকার করি না ; ইহা একটা সামাজিক বিধি (a social institution), ইহাও অগ্রাহ্য ; বিবাহ-বন্ধন যাবজ্জীবনের জন্য, ইহা বাতুলের উক্তি। নরনারীর মিলনের মূলসূত্র প্রেম ও তদুদ্দীপ্ত ইন্দ্রিয়লালসা। প্রেম যদি পদ্মপত্রের জলের মত চঞ্চল হয়, তাহাতেও ক্ষতি নাই ; সুতরাং আমরা চাই ক্ষণিক, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত, যোগবিয়োগমূলক ভঙ্গুর বিবাহ (companionate marriage)।" পশ্চিমে লক্ষ লক্ষ যুবকযুবতী এই মত কার্য্যে অনুসরণ করিতেছে, এবং এই উন্মাদনার তরঙ্গ এ দেশেও বহুজনকে বিচলিত করিয়া ফেলিতেছে। ভারতীয় সৈনিকেরা ভুলিয়া গিয়াছে, যে ক্ষণিক বিবাহ ভারতবর্ষে কতকগুলি সম্প্রদায়ে বহুকাল যাবৎ প্রচলিত আছে ; সুতরাং বিংশ শতাব্দীতে পরিণয়পদ্ধতির উদ্দাম সংস্কারসাধনে উদ্ভাবিনী শক্তির পরিচয় দিবার প্রচেষ্টা নেহাৎ পণ্ডশ্রম।

কিন্তু সকল বিদ্রোহী স্পষ্ট কথায় ঠিক ঐ মত প্রচার করিতে প্রস্তুত নয়। তাহারা নীতির মূল তত্ত্বটী পরীক্ষা করিতে চাহে। তাহাদিগের

গুরু বলিতেছেন—"এক্ষণে নীতির ভিত্তি পরীক্ষা করিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছে। যুগ যুগ ধরিয়া মানবচরিত্রের কতকগুলি লক্ষণ সমাদৃত ও অপর কতকগুলি ধিক্কৃত হইয়া আসিতেছে। প্রাক্তন কালে সাহস, হঠকারিতা, প্রতিহিংসাপ্রবণতা, ধূর্ত্ততা, অর্থগৃধ্নুতা প্রভৃতি যে-সমুদায় বৃত্তি পুরুষকে ইতরজনের উপরে প্রভুত্ব লাভ করিতে সমর্থ করিত, সেগুলি অধুনা নীতিবিহর্গিত বলিয়া নিন্দিত হইতেছে। পক্ষান্তরে সহিষ্ণু, নম্র, বাধ্য ও শান্তস্বভাব এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষাবর্জ্জিত মানুষ নীতিমান্ বলিয়া সমাদর লাভ করিতেছে। খৃষ্টীয়, বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্ম্ম দাসত্বপ্রবণ মন সৃষ্টি করিয়া এইরূপে মানবের স্বাভাবিক বিকাশের পথে অর্গল দিয়াছে। ফলে লোকে অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক বৃত্তিগুলিকে হীনদৃষ্টিতে দেখিতে অভ্যস্ত হইয়াছে। তাহারা উপদেশ পাইতেছে, প্রবৃত্তিকুলের উচ্ছেদ সাধন কর। কিন্তু প্রবৃত্তিকে উৎপাটন করা, আর জীবনকে বিনাশ করা একই কথা। জীবনই জীবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ, আর সমস্তই তাহার নিম্নে। আত্মবিকাশই জীবনের চরম লক্ষ্য। জিজীবিষা অর্থাৎ বাঁচিয়া থাকিবার দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছা এবং শক্তিসঞ্চয়ের প্রবল আকাঙ্ক্ষা (the will to life, the will to power)—এই দুইটী জীবজগতের নিয়ম। অতএব বৃত্তিসমূহকে আধ্যাত্মিক রূপ প্রদান কর, সৌন্দর্য্যময় কর, দেবোপম কর, সমূলে বিনষ্ট করিও না।"

যাহারা ঈশ্বর মানে না, আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে না, তাহাদিগের মুখে শেষোক্ত বাক্যটী হেঁয়ালীর মত শুনাইতেছে। সে যাহা হউক, বিদ্রোহীরা প্রাচীন তন্ত্রের মূলে আঘাত করিয়া তাহাকে সচেতন করিয়াছে, প্রাচীনপন্থীদিগকে সমাজনীতিবিষয়ে পুনশ্চ নূতন ভাবে আলোচনা করিবার সুযোগ দিয়াছে, কিন্তু একটা

নবনীতি গড়িয়া তুলিতে পারে নাই। সকল দেশেই জেতা ও জিতের ব্যবহারিক নীতি স্বতন্ত্র; কিন্তু ইহার প্রতীকারের পথ পশুত্বের নব উদ্বোধন নয়। ধর্ম্মদ্রোহী নীতি নরকের পথ সুগম করিয়া দিতেছে, স্বর্গের সুগন্ধে প্রাণ আকুল করিতে পারে নাই।

যাহারা নাস্তিক ও অনাত্মবাদী, অতএব পরলোকে বিশ্বাসী নহে, তাহারা সকলেই নীতিহীন, এমন কথা কেহই বলিবে না। নাস্তিক ব্রাড্‌ল, ভারতবন্ধু ব্রাড্‌ল, বীর্যবান, সত্যব্রত, অক্লান্তকর্ম্মা, পরার্থপরায়ণ পুরুষ ছিলেন। অজ্ঞেয়তাবাদী হাক্‌স্‌লী ও স্পেন্‌সার মরণহীন জ্ঞানানুরাগ, ন্যায়ধর্ম্মে অটলনিষ্ঠা এবং নির্ম্মল চরিত্র মাধুর্য্যের গুণে যে-কোনও ধর্ম্মযাজকের মুখ উজ্জ্বল করিতে পারিতেন। ধর্ম্মাচার্য্য আর, জে, ক্যাম্বেল বিংশ শতাব্দীর ইংরেজ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, সকল সুসভ্য জাতি সম্বন্ধেই তাহা খাটে—"The typical man of to-day ……may be quite a good fellow, kind, upright and public spirited; but he is not by temperament religious…He is not opposed to religion, but it is not of his concern; all the force of his being falls into other channels." (Booth, Life of Eucken, p. 55)

"এখনকার আদর্শস্থানীয় ব্যক্তি হয়তো বেশ লোক—কোমলহৃদয়, ন্যায়বান্, জনহিতৈষী; কিন্তু সে স্বভাবতঃ ধর্ম্মপ্রবণ নয়; সে ধর্ম্মের বিরোধী নহে, কিন্তু ধর্ম্ম তাহার ভাবনার বাহিরে; তাহার জীবনের সমুদায় শক্তি অন্য ব্যাপারে নিয়োজিত রহিয়াছে।"

এই জাতীয় ধর্ম্মবিমুখ উন্নত নীতির পুরুষ অসংখ্য আছে। আবার অপর দিকে জীবনে পাপাচার ছায়ার ন্যায় ধর্ম্মচর্চ্চার অনুগমন করিতেছে, এ প্রকার লোক সকল সম্প্রদায়েই অগণিত।

প্রথমতঃ, এমন কতকগুলি মণ্ডলী আছে, যাহাতে আদি হইতেই নীতি-বিরোধী বা দুর্নীতিমূলক আচার ধর্ম্মের অঙ্গীভূত হইয়া রহিয়াছে। তৎপরে, সকল ধর্ম্মেই কালবশে মলিনতা সঞ্চিত হইয়াছে, এবং সময়োপযোগী সংস্কারের অভাবে দুর্নীতির পঙ্ক ঘনীভূত হইতেছে। সুতরাং ধর্ম্ম ও নীতি অচ্ছেদ্য যোগে যুক্ত হইলেও এই দুইটির আলোচনা পৃথক্‌ভাবে উত্থাপিত হইয়াছে।

নীতি-বিচার

কিন্তু কাজটী ইংরাজীতে সুসাধ্য, আমাদের ভাষায় একটু কঠিন। ইংরেজীতে ধর্ম্মের আধ্যাত্মিক দিক্ প্রকাশ করিবার জন্য religion, এবং নৈতিক দিক্ বুঝাইতে morality শব্দ ব্যবহৃত হয়। আমাদের ধর্ম্ম শব্দটীর অন্ততঃ পঞ্চাশ রকম অর্থ আছে। ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ২২শ সূক্তে উহার প্রথম উল্লেখ দৃষ্ট হয়—

ত্রীণি পদা বি চক্রমে বিষ্ণু র্গোপা অদাভ্যঃ।
অতো ধর্ম্মাণি ধারয়ন্॥ ১৮॥

"বিষ্ণু বিশ্বজগতের রক্ষক, তাঁহাকে কেহ হিংসা (বা আঘাত) করিতে পারে না; তিনি ধর্ম্মসমূহ ধারণ করিয়া পৃথিব্যাদি স্থানে তিন পদ পরিক্রম করিয়াছিলেন।" এখানে ধর্ম্মের অর্থ বিশ্বের নিয়ম। বৌদ্ধ সাহিত্যে "ধর্ম্ম" শব্দ বিধি (Law), স্বভাব (nature, what we are), শিষ্টজনোচিত ব্যবহার, শোভন ব্যবহার, ইত্যাদি নানা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে ধর্ম্ম ও নীতি ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত।

মনুসংহিতায় ধর্ম্মের দশটী লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—

ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্॥ ৬।৯২॥

"ধৃতি (সন্তোষ) ক্ষমা, দম (মনের দমন), অস্তেয় (অন্যায়পূর্ব্বক পরধন গ্রহণ না করা), শৌচ (দেহশুদ্ধি) ইন্দ্রিয়নিগ্রহ (চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহকে বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত করা), ধী (শাস্ত্রাদি তত্ত্বজ্ঞান), বিদ্যা (আত্মজ্ঞান) সত্য এবং অক্রোধ—এই দশটী ধর্ম্মের লক্ষণ।" এই সংজ্ঞায় কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, এই রিপুচতুষ্টয়ের জয়, দেহশুদ্ধি, মনঃসংযম, সত্য ও জ্ঞান, সাধ্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে; সুতরাং ধর্ম্মের লক্ষণ শম, দম, সত্য ও জ্ঞান, এই চারিটী নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। প্রথম দুইটী ধর্ম্মের আধ্যাত্মিক বিভাগের ও অপর দুইটী নৈতিক বিভাগের সাধন। কিন্তু এই বিভাগও কৃত্রিম, কেন না, উপাস্য-উপাসকের সম্বন্ধকে বিচ্ছিন্ন রাখিয়া কেহ নীতির সাধন করিতে পারে, বেদবেদান্ত সংহিতায় ইহা কুত্রাপি স্বীকৃত হয় নাই।

ভারতীয় জ্ঞানীদিগের চিরাগত চিন্তাধারার একমাত্র ব্যভিচার বৌদ্ধধর্ম্ম। শাক্য গৌতম স্বপ্রতিষ্ঠিত "মধ্যপথকে" "ধর্ম্ম" নামে অভিহিত করিয়াছেন। তিনি উহাতে অতীন্দ্রিয় সত্তার উপাসনা ও প্রার্থনার স্থান রাখেন নাই। উহা নিরবচ্ছিন্ন পুরুষকারের সাধন, সে সাধন "কৃপার" (graceএর) অপেক্ষা করে না। বুদ্ধ আত্মা সমন্ধে তৎকালপ্রচলিত মত খণ্ডন করিয়াছেন, কিন্তু আত্মা আছে কি না, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। "মৃত্যুর পরে কি সত্তা থাকিবে?" —এ প্রশ্নেরও "হাঁ" "না" কোনও উত্তর দেন নাই। কিন্তু তিনি অনাত্মবাদী ও নাস্তিক ছিলেন, তাঁহার উপদেশাবলি এ মতেরও সমর্থন করে না। তবে তৎপ্রবর্ত্তিত পন্থা নিছক নীতিমূলক ধর্ম্ম (a purely ethical religion), ইহা অবিসংবাদী সত্য।

পশ্চিমে শত শত মনীষীর প্রচলিত ধর্ম্মে আস্থা নাই। তাঁহারা religion এবং morality, এই দুইটীকে স্বতন্ত্র বলিয়া বিশ্বাস

করেন। এই মতের পক্ষে অসংখ্য গ্রন্থ আছে, এবং নিত্য নব প্রকাশিত হইতেছে। স্বধর্ম্মনিষ্ঠ দার্শনিকেরা অপর পক্ষে সপ্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইতেছেন যে, ধর্ম্ম হইতে বিযুক্ত হইলে নীতি অপূর্ণ থাকে ও প্রাণহীন হইয়া পড়ে। এ দেশেও নব্য সম্প্রদায়ে অজাত-শ্মশ্রু হইতে পলিতমুণ্ড কত সহস্র ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা প্রাচীন ধর্ম্মানুযায়ী পূজার্চ্চনা নিত্যকর্ম্মপদ্ধতিতে স্থান দেন নাই, নূতন উপাসনাপ্রণালীও গ্রহণ করিতেছেন না। জ্ঞানবিস্তার, রাষ্ট্রীয় আন্দোলন, দেশমাতৃকার সেবা, ব্যবসায়বাণিজ্য ইত্যাদি বিবিধ কর্ম্মায়তনে এই শ্রেণীর লোকের সংখ্যা নাই। ইঁহাদিগের মধ্যে উন্নত-নীতিবান্ পুরুষও যথেষ্ট বিদ্যমান। এজন্য মনে হয়, ধর্ম্মকে স্বতন্ত্র রাখিয়া আরও দুই চারিটী কথা বলিলে তাহা অসময়োচিত ও নিরর্থক হইবে না।

নীতির মূলতত্ত্ব

কঠোপনিষদের একটী প্রসিদ্ধ শ্রুতিতে নীতির মৌলিক তত্ত্ব নির্দ্দেশ করা হইয়াছে—

অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়
স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ। ২।১॥

"শ্রেয়ঃ (মঙ্গল) ও প্রেয়ঃ (সুখকর) পরস্পর বিভিন্ন। এই উভয় বিভিন্নরূপে পুরুষকে আবদ্ধ করে।"

মানুষের অন্তরে নিরন্তর শুভকর (the good) এবং সুখকর the pleasurable), এই দুইটীর মধ্যে সংগ্রাম চলিতেছে। সত্য ও ন্যায়ের জন্য প্রাণবিসর্জ্জন হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য কর্ত্তব্যের খাতিরে ক্ষুদ্র সুখলালসাজয় পর্য্যন্ত সমস্তই এই দুইটী প্রতিদ্বন্দ্বীর

সংগ্রামক্ষেত্র, এবং এই সংগ্রাম হইতেই নীতির উদ্ভব। শৈশব, যৌবন বার্দ্ধক্য - আমরণ কোন বয়স বা অবস্থাই শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ের সংঘাতের বহির্ভূত নহে। মানবচরিত্রের ভালমন্দ লক্ষণগুলি জয় পরাজয়ের ফল প্রদর্শন করে। আত্মোন্নতিসাধন, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অকল্যাণ দূরীকরণ, ধনাগমবৃদ্ধি, দারিদ্র্যহ্রাস, সংখ্যাভূয়িষ্ঠের গরিষ্ঠ সুখবিধান the greatest happiness of the greatest number), এক কথায় জনগন মধ্যে মাধুর্য্য ও আলোক (sweetness and light) বিকীরণ—ইত্যাকার কত বিভিন্ন মঙ্গলব্রত নৈতিক জীবনের লক্ষ্য। লক্ষ্যটী মহৎ ও বরণীয়, তদ্বিষয়ে দ্বিমত থাকিতে পারে না। শত উন্নতমনাঃ ত্যাগী পুরুষ ঐ লক্ষ্যসাধনে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন।

ধর্ম্মের সহিত নীতির সম্বন্ধ

কিন্তু বিশুদ্ধ নৈতিক জীবনযাপনের জন্য যে-শক্তির, যে গতিবেগের প্রয়োজন, তাহার উৎস কোথায়? সে উৎস এই অটল প্রত্যয় যে, যিনি 'শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা', সেই সত্যস্বরূপ, অনাদ্যনন্ত ব্রহ্মই বিধিবিধাতা, বুদ্ধিবৃত্তির প্রেরয়িতা, আলোকদাতা, পথপ্রদর্শক। এই বিশ্ব শুধু পরমাণু অথবা প্রোটন, ইলেকট্রনের ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার ফল নহে; জড়জগতের অন্তরালে কিংবা ইহার অণুপরমাণুতে অনুপ্রবিষ্ট এক জ্ঞানময় পরমসত্তা বিদ্যমান, এবং মানবাত্মার সহিত সেই পরমসত্তার সম্বন্ধ সাক্ষাৎ, অপরোক্ষ ও অব্যবহিত, এ বিশ্বাসে সুপ্রতিষ্ঠিত না হইলে কেহ নীতির পথে বহুদূর অগ্রসর হইতে পারে না। যাহার সম্মুখে অন্তহীন জীবনের আশা নাই, নিত্য নব সৌন্দর্য্যে মনোহর, অথচ পূর্ণরূপে অনধিগম্য আদর্শ নাই, সে কিসের জন্য নিয়ত সুখের

লালসা খর্ব্ব করিয়া অবিচ্ছেদে দুঃখ বহিতে অভ্যস্ত হইবে? কর্ত্তব্যবুদ্ধি মানুষকে অনেক দূরে লইয়া যাইতে পারে, কিন্তু চিত্তহারী পরিণতির পথ দেখাইয়া দিয়া হৃদয়কে প্রলুব্ধ ও নিবৃত্তির সাধনকে রসময় করিয়া দিতে পারে না।

মানুষ নিত্য ও অনিত্য, পরিবর্ত্তনশীল ও অপরিবর্ত্তনীয়, কালাধীন ও কালাতীত, মৃত্যু ও অমৃত, এই যুগলনিচয়ের ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে বাস করিতেছে। মানুষ জানে, সে এক দিকে বিকারপ্রবণ ও কালের বশীভূত, অপর দিকে চিরস্থির ও শাশ্বত; একাধারে সে 'মেঘবিতান-বিলাসিনী সৌদামিনীর ন্যায় চঞ্চল' এবং অবিনাশী, অমৃতের অধিকারী, 'ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।' তাহাকে ইহজীবনেই পরস্পর বিরোধীযুগলসমূহের সামঞ্জস্য সমাধান করিয়া চলিতে হইবে। জড়বাদী নীতিমার্গচারী সামঞ্জস্য সাধনের জপমন্ত্র কোথায় পাইবে? সে মন্ত্র এক অতীন্দ্রিয় পরম পুরুষে সংশয়বিরহিত বিশ্বাসেই মিলে, অন্যত্র নহে।

নৈতিক জীবনের উদ্দেশ্য, আপনার ও আবেষ্টনের উন্নতিসাধন। কোথায় উন্নতির পরিসমাপ্তি, কেহই কল্পনা করিতে পারে না। আত্মোন্নতির অর্থ, শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ের সংগ্রামে নিয়ত শ্রেয়ের অনুগামী হওয়া, অর্থাৎ রিপুপরবশতা হইতে চিরঞ্জয়ী, স্থিতধী, স্বপ্রতিষ্ঠ পুরুষরূপে স্ফুরণ, অর্থাৎ স্বাধীনতালাভ। এ স্বাধীনতা বিদ্রোহীদিগের দৈহিকারামলোলুপ উদ্দাম যথেচ্ছাচার নয়; ইহা নিঃশেষ আত্মসমর্পণ-প্রসূত পরিপূর্ণ আত্মপরিণতি, আত্মবিলোপের দ্বারা আত্মোপলব্ধি বা আত্মবিকাশ (self-realisation through self-effacement)। আমি নিজে স্বাধীন হইব, সমাজের প্রত্যেকে স্বাধীন হইবে, নীতিবাদীর ইহাই আদর্শ। তিনি অল্পে সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না; কিন্তু তিনি

যেমন পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি নিত্য অসন্তুষ্ট, আপনার প্রতি তদপেক্ষা কম অসন্তুষ্ট নহেন। এই উভয় প্রকার অসন্তোষই নৈতিক জীবনের প্রণোদক। ভূমার সন্ধানবিহনে মানুষের অন্তরে অনির্ব্বাপণীয় অতৃপ্তি জাগে না।

বিবেকানুগত্যের পর প্রথম হইতেই আলোকমালায় উদ্ভাসিত থাকে না। অপরিস্ফুট আলোকে চলিতে চলিতে যাত্রীর লোচন হইতে মোহঘন দূর হইতে আরম্ভ করে, উজ্জ্বল আলোকে পথ স্পষ্টতর হইয়া উঠে। ধর্ম্মসাধনের পথও ঠিক এই প্রকার। পরিমিতায়ুঃ জড়দেহধারী মানুষ কি নীতিপালনে, কি ধর্ম্মানুসরণে, কদাপি দেশ-কালের ঊর্দ্ধে উঠিয়া সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিতে পারে না। বহুল শ্রম করিয়া, দারুণ দুঃখ সহিয়া, বারংবার গহন তিমির ঠেলিয়া তাহাকে অগ্রসর হইতে হয়। নিরীশ্বর নীতিবাদী যেখানে বলে, "তুমি যাহা, তাহাই হও", বিশ্বাসী যেখানে বলে, "ঈশ্বরের অনুগামী হও।" বস্তুতঃ নৈতিক জীবনের পূর্ণতা ব্রহ্মপ্রেমে ও ব্রহ্মস্বভাবের আদর্শে আপনাকে গড়িয়া তুলিবার অবিচ্ছিন্ন অপরাজেয় অধ্যবসায়ে।

নীতির আলোচনা করিতে করিতে আমরা অলক্ষিতে নীতি ও ধর্ম্মের মধ্যে যে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ বিদ্যমান, সেই তত্ত্বে আসিয়া পড়িলাম।

ধর্ম্মবিচার

"ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্"—ধর্ম্মের তত্ত্ব নিগূঢ়। ধর্ম্মের আলোচনা এক অকূল পারাবার; ইহাতে বিচারনৌকা ভাসাইয়া বিতর্কপাল উড়াইয়া সাকারবাদ-নিরাকারবাদ, একেশ্বরবাদ বহুদেববাদ, শাস্ত্রবাদ-গুরুবাদ, অবতারবাদ-মধ্যবর্ত্তিবাদ-প্রেরিতবাদ—ইতি কত কত বন্দরে উপনীত হওয়া যায়। অজ্ঞাতবহির্গমনপথ তর্কব্যূহের মধ্যে

প্রবেশ করিবার সাহস ও সামর্থ্য আমাদিগের নাই; আমরা সাধারণ ভূমিতে দাঁড়াইয়া কয়েকটী মন্তব্য প্রকাশ করিব।

ধর্ম্মের সংজ্ঞা

Religion ও ধর্ম্ম, উভয়ের ব্যুৎপত্তিগত অর্থে সাদৃশ্য আছে। যাহা বন্ধন করে, তাহা religion; যাহা ধারণ করে, তাহা ধর্ম্ম। লোকস্থিতি দুইয়েরই অভিপ্রেত। সংস্কৃত সাহিত্যে ধর্ম্মশব্দটী এত বহুবিধ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, যে, religionএর সমার্থক উহার একটী সর্ব্বজনসম্মত সংজ্ঞা আছে কি না সন্দেহ। ইংরেজী ভাষায় বিস্তর আছে। "নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্"—এমন জ্ঞানী নাই, যিনি একটা বিভিন্ন সংজ্ঞা না দিয়াছেন। জেমস্ মার্টিনোর সংজ্ঞা এই—Religion is "a belief in a Divine Mind and Will ruling the Universe and holding Moral relations with mankind."—এক জ্ঞানময় ও ইচ্ছাময় পুরুষ বিশ্বকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন; এবং মানবের সহিত তাঁহার নৈতিক সম্বন্ধ আছে, এই বিশ্বাসই ধর্ম্ম।" এটী আমাদের মনোমত, কিন্তু একেশ্বরবাদ ব্যতীত আর সমুদায় ধর্ম্ম এতদ্দ্বারা বর্জ্জিত হইতেছে; অধিকন্তু সংজ্ঞাটী অর্দ্ধ শতাব্দীরও অধিক পুরাতন। ইতোমধ্যে নাস্তিক বৈজ্ঞানিকেরা "আশ্চর্য্যবক্তা" জড়বিজ্ঞানের বেড়াজালে ঘিরিয়া টানিতে টানিতে ধর্ম্মকে প্রায় উদ্বাস্তু করিয়া তুলিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের সমীক্ষা (observation), পরীক্ষা (experiment) ও অন্বীক্ষার (inference) শরাঘাত সহিয়া টিঁকিয়া থাকিতে পারে, এমন একটী সংজ্ঞার প্রয়োজন। অতএব জে. ঈ, টার্ণারের সংজ্ঞা উদ্ধৃত হইতেছে—Religion is "the response or attitude of humanity, when this response is taken

as being an *explicit* unity or real whole, to the Universe, likewise taken as a whole."

Essentials in the Development of Rel. p. 32

"মানব ও বিশ্ব, উভয়ের সম্বন্ধ হইতে ধর্ম্মের উদ্ভব। মানব বিশ্বের প্রতি যে-ভাব পোষণ করে, কিংবা বিশ্বের সংস্পর্শে আসিয়া যে-সাড়া দেয়, অখণ্ড ও পূর্ণাঙ্গ বিশ্বের প্রতি সেই সাড়া অখণ্ড বা পূর্ণাঙ্গরূপে ব্যক্ত হইলে তাহা ধর্ম্ম নামে অভিহিত হইয়া থাকে।"

বিবৃতি

সমগ্র মানুষটী সমগ্র বিশ্ব সম্বন্ধে কি ভাবে, কি বিশ্বাস করে, এই তত্ত্বটী ধর্ম্মের বীজ। 'সমগ্র মানুষ', 'সমগ্র বিশ্ব' এই দুইটী বাক্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। মানুষের সমস্ত ইন্দ্রিয় ও মনোবৃত্তি বিশ্বের সমস্ত রূপ ও স্বরূপের দিকে উন্মুখীন আছে কি না, দেখিতে হইবে। মানুষ একাধারে জড় ও অজড়; বিশ্বও একাধারে জড়ীয় ও প্রাণবান্। মানুষ দেহ ও আত্মার সমবায়, ইন্দ্রিয়গোচর বিশ্ব ও ইন্দ্রিয়াতীত বিশ্বপতি বিশ্বের রূপ ও স্বরূপ। দেহ ও মন সমগ্র ভাবে সমগ্র বিশ্বের সহিত যোগ রক্ষা করিয়া চলিবে, এই আকাঙ্ক্ষাই ধর্ম্মের প্রণোদক।

মানুষের মন জ্ঞানবৃত্তি, হৃদবৃত্তি, ও ইচ্ছাবৃত্তি, এই তিনটীর আধার। শুধু জ্ঞানের বিকাশে, শুধু হৃদবৃত্তি বা ভাবের বিকাশে, শুধু ইচ্ছা বা কর্ম্মশক্তির স্ফুরণে মানুষ পূর্ণ জীবনের অধিকারী হয় না। কেন না, বৃত্তিত্রিতয় অন্যোন্যসাপেক্ষ, একসূত্রে গাঁথা, একে অন্যকে ছাড়িয়া সম্যক্ ও সার্থক ক্রিয়া করিতে পারে না। জ্ঞানার্জ্জন করিতে হইলে জ্ঞানার্থীর অনুরাগ, প্রীতি ও ভাবাবেগ চাই। প্রেম জ্ঞানকে উজ্জ্বলতা ও গভীরতা দান করে, আবার জ্ঞানের দ্বারা সংযত ও সংহত

না হইলে চিত্তকে বিভ্রান্ত করিয়া ফেলে। তেমনি জ্ঞান ও প্রেমের প্রেরণা বিনা ইচ্ছা বা কর্ম্মশক্তি কাণ্ডারবিহীন তরণীর ন্যায় ঘূর্ণিপাকে পতিত হয়। বিশ্বও কেবল পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য, রূপরসগন্ধস্পর্শশব্দাধার, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মযন্ত্রাদিগম্য পদার্থ নহে; উহা পরমসত্তা দ্বারা আচ্ছাদিত, পরিপূর্ণ ও পরিচালিত। কোটি কোটি বৎসর ধরিয়া বিশ্ব অভিব্যক্ত হইতেছে, উহার অভিব্যক্তি অদ্যাপি সমাপ্ত হয় নাই। আমাদের সৌরজগতে পৃথিবী জীবের বাসভূমি হইয়াছে, হয়তো মঙ্গলগ্রহও বুদ্ধিজীবী প্রাণীর দ্বারা অধ্যুষিত হইতেছে। বৃহস্পতি, শুক্র, শনি প্রভৃতি গ্রহেও কালে জীবের আবির্ভাব হইবে, সন্দেহ নাই। বৈজ্ঞানিকেরা ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছেন, কোটি বৎসর অন্তে ধরিত্রী প্রলয়ঙ্কর শৈত্যের প্রকোপে পড়িয়া মরিয়া যাইবে; যদি যায়, বৃহত্তর সূর্য্যের প্রাণস্পন্দনে উচ্ছ্বসিত নব নব গ্রহে মানবজাতির, অথবা তদপেক্ষাও মহত্তর জীবের, পুনরভ্যুদয় হইবে, ইহা বিচিত্র নয়। তার পর, লক্ষ লক্ষ বৎসরের অভিব্যক্তির পথে মানুষের দেহ বর্ত্তমান আকারে উপনীত হইয়াছে; আরও লক্ষ লক্ষ বৎসরে মানব দৈহিক বিকাশে অতিমানবে পরিণত হইবে কিনা, জানি না, কিন্তু তাহার মনোবৃত্তির বিকাশ যে চরম পরিণতি লাভ করে নাই, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনবচ্ছিন্ন ক্রমবর্দ্ধমান উন্নতিই তাহার প্রমাণ। তৃতীয়তঃ মানবও বিশ্বের অঙ্গ, সুতরাং মানবের দেহাতিরিক্ত জ্ঞানপ্রেমপুণ্যের অভিব্যক্তিও বিশ্বের অভিব্যক্তির অঙ্গ। "সমগ্র মানব" ও "সমগ্র বিশ্ব"—এই কথা দুটীর ব্যবহারে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে।

বিজ্ঞান "আদিসত্য" (Ultimate Reality) আলোচনা করিতেছে; দর্শন "অব্যক্ত সত্তার" (the Absolute One) সন্ধানে ব্রতী রহিয়াছে; ধর্ম্ম আদি সত্য এবং অব্যক্ত সত্তাকেই ঈশ্বর বা

ব্রহ্ম নামে আখ্যাত করিয়া বলিতেছে, তিনি জ্ঞান, প্রেম ও পুণ্যের নিলয়, সত্য-শিব-সুন্দরস্বরূপ। মানবের সমগ্র সত্তা জ্ঞান-প্রেম-ইচ্ছা-বৃত্তির উন্মেষ হইতেই ত্রিবিধ বর্ত্মে জ্ঞানে গভীর, প্রেমে বিশাল ও পুণ্যে স্থিতপ্রজ্ঞ হইবার কামনায় সত্যশিবসুন্দরের স্পর্শে সাড়া দিতেছে; কখনও আর্ত্ত, কখনও জিজ্ঞাসু, কখনও অর্থার্থীরূপে তাঁহার শরণ লইতেছে, এবং পরিশেষে জ্ঞানী ও অনন্যশরণ হইয়া দিন দিন অধিকতর নিঃসংশয়, ব্যাকুল ও কৃতার্থ হইতেছে। ধর্ম্মসাধনের ইহাই মর্ম্মকথা।

কিন্তু অপূর্ণ মানুষ একত্র জ্ঞানার্জ্জনী (cognitive), ভাবোন্মুখী (affective) ও ইচ্ছামূলক (conative) বৃত্তির অনুশীলন করিতে পারে না; সেজন্য চাই, অবিরাম প্রয়াস ও পরীক্ষা; নতুবা পর্য্যায়ক্রমে একটী প্রবল হইয়া অপর দুটীকে নিষ্প্রভ করিয়া রাখে। এক এক জন কখনও হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলি অবহেলা করিয়া জ্ঞানের পশ্চাতে ছুটিতেছে; কখনও প্রেমভক্তির উত্তেজনায় জ্ঞানের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেছে, কখনও বা জ্ঞানপ্রেম দ্বারা ইচ্ছাকে শৃঙ্খলিত করিতে অক্ষম হইয়া দুর্নীতিতে পতিত হইতেছে, কিংবা বিষয় প্রচেষ্টাকেই জীবনের ধ্রুবতারা করিয়া ফেলিয়াছে। এই ত্রিবিধ কারণে ধর্ম্মও জ্ঞানপ্রধান, ভাবপ্রধান ও ইচ্ছাপ্রধান, ত্রিবিধ আকার ধারণ করে। কিন্তু ধর্ম্ম পূর্ণতার অভিলাষী, একাঙ্গে বিকল কিংবা অপরিণত থাকিয়া অপর অঙ্গে স্ফীত হওয়া তাহার আদর্শ নয়। এজন্য ইহাতে পরা ও অপরা বিদ্যা, ললিত কলা ও চারু শিল্প এবং নীতি ও সেবা সম্মান স্থান পাইবে, অধিকন্তু এই জন্যই জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্ম্মযোগ ইহার সাধনপন্থা। পরন্তু মানবাত্মা স্থিতিশীল (static) নহে, গতিশীল (dynamic), ধর্ম্মও সুতরাং সচল, অচলায়তন নহে।

মানুষ বিশ্বের সংস্পর্শে যে সাড়া দেয়, তাহার দুইটী দিক্ আছে, কেন না, বিশ্বপ্রকৃতি দ্বি-মুখ। প্রকৃতি এক দিকে চিত্ততোষ, নয়নাভিরাম, সুধাপরিসিক্তি; তাহার কান্ত, কোমল মূর্ত্তি মনন করিতে করিতে ভাবুকের অন্তস্থল হইতে স্বতঃই ভাববিহ্বল সঙ্গীতলহরী উৎসারিত হয়,—

"—যখন আঁখি মেলি ধরাপানে চাই,
মরি মরি কি মাধুরী বলিহারি যাই,
এ যে রূপে রসে সৌরভেতে পরিপূর্ণ সুখের খনি।"

আবার পরক্ষণেই বিশ্ব তাহার সমক্ষে ভৈরবরূপ ধারণ করিয়া আবির্ভূত হইয়া থাকে। সে কখনও যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তননিয়ম মনন করিতে করিতে মনশ্চক্ষুতে দেখে, "Nature red with tooth and claw"—"প্রকৃতি দন্তনখরাঘাতনিঃসৃতরক্তরাগরঞ্জিত" আবার সহসা ঝঞ্ঝা।জ্রবিদ্যুৎ-ভূমিকম্প-অগ্ন্যুদ্‌গার-মহাপ্লাবনের ত্রাসে দিশাহারা হইয়া ইষ্টদেবতাকে ডাকিতে আরম্ভ করে। যোদ্ধা রণক্ষেত্রে বিশ্বরূপের কালাগ্নিসদৃশ করাল মুখ দর্শন করিয়া অধীরচিত্তে বলিয়া উঠেন,

"লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্জ্বলদ্ভিঃ।"

গীতা। ১১।৩০॥

"তুমি প্রদীপ্ত বদন বিস্তার করিয়া চতুর্দ্দিকে সমগ্র লোককে গ্রাস করিতেছ।"

মানুষকে বিশ্বের রুদ্র ও কমনীয় উভয় রূপই অন্তরে ধারণ করিতে হইবে, অতীব কঠিন হইলেও তাহার সহিত যোগ স্থাপন করিতে হইবে, বিবাদ ভঞ্জন করিয়া মিলিত হইতে হইবে; উপযোগিতা রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। রুদ্রানুবর্ত্তন ও মাধুর্যসম্ভোগ, সাধনে দুইটীর সামঞ্জস্য না থাকিলে ধর্ম্মের আদর্শ ম্লান ও অপূর্ণ থাকিয়া যায়।

কিন্তু মানুষের চিত্ত যেমন বহির্জ্জগতের সংস্পর্শে আসিয়া এক এক সময়ে বিদ্রোহী হইয়া উঠে, অন্তর্জগতেও তেমনি সে আদি হইতেই স্বচ্ছন্দে, স্বতঃনিস্যন্দিত প্রীতির সহিত সাড়া দিতে পারে না। বিশ্বনিয়মের সহিত ঐক্য স্থাপন করিতে যেমন জ্ঞান, ধ্যান ও অধ্যবসায় আবশ্যক, তেমনি অন্তর্দেবতার নিকটে নতিস্বীকারে সহজপটুতা লাভের জন্যও তাহাকে নিরন্তর সংগ্রাম করিতে হয়, তপস্যায় রত থাকিতে হয়। অভ্যাসবলে ক্রমশঃ উপাস্য-উপাসকের সম্বন্ধ স্বাভাবিক ও মধুর হইতে থাকে। তপস্যার ভূমিতে নীতি ও ধর্ম্ম পুনশ্চ মিলিত হইয়াছে।

মনুষ্যের জীবনে ধর্ম্মকে উজ্জ্বলরূপে প্রতিফলিত করিতে হইলে চাই অনুকূল আবেষ্টন। সে যে-গোষ্ঠীতে, যে-সমাজে, যে-রাষ্ট্রে বাস করে, তাহাতে তাহার ব্যক্তিত্ব অবাধে ফুটিয়া উঠিবে, ধর্ম্মের ইহা ন্যূনতম দাবী (sine qua non), অপরিহার্য্য সর্ত্ত। এজন্য সমাজতন্ত্র অর্থাৎ যাবতীয় সামাজিক প্রতিষ্ঠান, এবং রাষ্ট্রতন্ত্র, অথবা স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অর্থব্যবহার, শাসনসংরক্ষণ ইত্যাদির বিধিব্যবস্থা ধর্ম্মানুশাসনের অনুগামী হইবে; নতুবা তদন্তর্গত নরনারীর স্বাভাবিক পরিণতির আশা নাই।

এতক্ষণ ধর্ম্মের যে সূত্র ও ভাষ্য প্রদত্ত হইল, জড়বাদী তাহাতে অনেক খুঁৎ ধরিতে পারেন, কিন্তু অপর সকলের ইহাতে সায় দিতে বাধা নাই। ব্যাখ্যানে সকল শ্রেণীর ধর্ম্মই অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে; বৃক্ষ-প্রস্তরের পূজা হইতে এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনা পর্য্যন্ত কিছুই বর্জ্জিত হয় নাই। এক্ষণে কোন্ ধর্ম্ম আচরণীয়, তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হইব।

কোন ধর্ম্ম আচরণীয়?

শান্তিপর্ব্বে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন—

সর্ব্বতঃ সৎকৃতঃ সদ্ভির্ভূতিপ্রবরকারণৈঃ।
হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতো যো ধর্ম্মস্তং ব্যবস্যতি॥ ১৩২।১৯॥

"সর্ব্বত্র সৎকৃত, শ্রোতধর্ম্ম; মন্বাদিসৎকৃত স্মার্ত্তধর্ম্ম; সাধুজনাচরিত ধর্ম্ম, এবং আত্মবিচারসিদ্ধ ধর্ম্ম—এই চারি কারণে ধর্ম্ম সিদ্ধ হয়। এই চারি প্রকার ধর্ম্মই অবগত হওয়া নরপতিদিগের কর্ত্তব্য।"

তৃতীয় ও চতুর্থ প্রকার ধর্ম্ম সম্বন্ধে নীলকণ্ঠের ভাষ্য—পারম্পর্য্যাগত, কুলদেশগ্রামাদিপরিগৃহীত, এই নিমিত্ত সৎকৃত, অর্থাৎ শিষ্টজনাদৃত ধর্ম্ম।

"হেতুত্রয়াভাবেহপি স্বয়ং চ যো ধর্ম্মত্বেন নিশ্চিতঃ"—"হেতুত্রয়ের অভাবে তুমি স্বয়ং যে ধর্ম্ম নিশ্চিত বলিয়া বুঝিয়াছ।"

মনুসংহিতাতেও প্রায় এতদনুরূপ উক্তি আছে—

বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্য লক্ষণম্॥
২।১২॥

"বেদ, স্মৃতি, সদাচার এবং আত্মতুষ্টি, ঋষিগণ এই চারিটীকে ধর্ম্মের সাক্ষাৎ লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।"

ভীষ্মবচনে ধর্ম্মের পরিধি বিশ্বব্যাপী, অর্থাৎ উহাতে ধর্ম্মের সমুদায় বিভাগ ও সমস্ত কর্ত্তব্যই অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। শ্লোকটীতে চারি প্রকার ধর্ম্মের উল্লেখ আছে; কিন্তু স্মৃতির ভিত্তি শ্রুতি; মনু, পরাশর প্রভৃতির সংহিতা বেদের শাখাপ্রশাখা, প্রভেদ এই যে, এগুলিতে ধর্ম্মের ব্যবহারিক বিষয়সমূহই বিশেষভাবে বর্ণিত

হইয়াছে। তাহা হইলে আমরা বিচারের জন্য তিন প্রকার ধর্ম্ম পাইতেছি। প্রথম, শ্রৌত এবং স্মার্ত্ত, অর্থাৎ আপ্তবাক্যাগত ও শাস্ত্র-সিদ্ধ, revealed, and based on scripture, authority and tradition. দ্বিতীয়, সাধুজনাচরিত, তৃতীয়, আত্ম-বিচারসিদ্ধ।

ত্রিবিধ ধর্ম্ম

(১) আপ্তবাক্যাগত

(১) বেদ অপৌরুষেয়, ইহার নামান্তর শ্রুতি। ঋষিগণ অশরীরী বাণী শুনিয়া কণ্ঠে তাহা রক্ষা করিয়াছেন, এবং সেই বাণী বংশ-ও-শিষ্যপরম্পরাক্রমে ঋক্ প্রভৃতি বেদরূপে নিবদ্ধ হইয়াছে। "ঋষয়ো মন্ত্রদ্রষ্টারঃ"—ঋষিগণ বেদের মন্ত্র দর্শন করিয়াছিলেন; কিন্তু শ্রুতমন্ত্র বা দৃষ্টমন্ত্র, উভয়ই আপ্তবাক্য বা revelationএর অন্তর্গত। এই অর্থে বৈদিকধর্ম্মও ইহুদী, ঈশাহী ও মুসলমানধর্ম্মের ন্যায় revealed religion; আমাদের মতে বৌদ্ধধর্ম্ম এই পর্য্যায়ে স্থান পাইবার যোগ্য। উক্ত পাঁচটীই পৃথিবীর প্রধান ঐতিহাসিক ধর্ম্ম। এ, ঈ, টেলর ঐতিহাসিক ধর্ম্মের চারি সাধারণ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(১) এক ঐতিহাসিক পুরুষ প্রত্যেকটীর প্রতিষ্ঠাতা।

(২) প্রতিষ্ঠাতার অন্তরে এমন সমাচার প্রকাশিত হইয়াছিল, যাহা অপর কেহ প্রাপ্ত হয় নাই, প্রাপ্ত হইতে পারিত না। তিনি সেই সমাচার জনসমাজে প্রচার করিয়াছেন।

(৩) প্রত্যেক ঐতিহাসিক ধর্ম্ম সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের নামে ও তাঁহার আদেশে (authority) নরনারীর নিকটে প্রচারিত হইয়াছে;

সুতরাং তাহার প্রচার ও প্রামাণিক, অবশ্যগ্রহণীয় ব্যাখ্যার অধিকারও কেবল সেই সেই ধর্ম্মমণ্ডলীরই আছে।

(৪) সামাজিক উপাসনা, অনুষ্ঠান এবং মণ্ডলীভুক্ত সকলের জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণের জন্য যে বিধিব্যবস্থার প্রয়োজন, তাহা প্রণয়ন করিবার অধিকারও একা সেই মণ্ডলীরই আছে।

প্রত্যেক ঐতিহাসিক ধর্ম্মের দাবি এই চারিটী।

The Faith of a Moralist, Vol. II. Chap. I.

ঋগ্বেদ শুধু এক ঋষির নিকটে প্রকাশিত হয় নাই; উহা বহু-ঋষির শ্রুতিসমষ্টি। ইহুদী, বৌদ্ধ, ঈশাহী ধর্ম্ম ও ইসলামের ন্যায় বৈদিক ধর্ম্ম এক মহাপুরুষের নামের সহিত যুক্ত নহে। তবে পূজার্চ্চনা আচারানুষ্ঠানের বিধিব্যবস্থা করিবার অপ্রতিহত অধিকার শাস্ত্রকার বা ভাষ্যকারেরা চিরদিনই ভোগ করিয়া আসিতেছেন। আমাদের প্রধান বিচার্য্য বিষয় আপ্তবাক্য বা revelation.

আপ্তবাক্য

প্রাচীনকাল হইতে সভ্যদেশ মাত্রেই এই মত প্রচলিত আছে, যে ঈশ্বর স্বয়ং মানবসমাজে সত্য প্রকাশ করিতেছেন; তিনি 'ধর্ম্মাবহ', ধর্ম্মসংস্থাপক। বেদস্মৃতিপুরাণ, গীতা, বাইবেল, কোরাণ, কাব্য, সাহিত্য, দর্শন এই মত সমর্থন করিতেছে। কিন্তু আপ্তবাক্যের যৌক্তিকতা স্বীকার করিলেও আমরা অভ্রান্তশাস্ত্রবাদ বা অভ্রান্ত মহাপুরুষবাদ মানি না। এমার্সনের ভাষায় আমরা বলি, "God speaks, not spake"—"ঈশ্বর মানবের অন্তরে অতীত কালে কথা বলিয়াছিলেন, এখন বলেন না, তাহা নয়; তিনি এখনও বলেন।" তিন সহস্র, দুই সহস্র কি চৌদ্দশত বৎসর পূর্ব্বে তিনি এক এক

মহাপুরুষের নিকটে বাণী প্রেরণ করিয়াছিলেন, তার পরে মানবজাতি অনুপ্রাণনায় বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে, ইহা স্বীকার করিতে পারি না। তবে ক্ষণজন্মা লোকোত্তর পুরুষদিগের চিত্তে যে-পরিমাণে, যেরূপ উজ্জ্বলভাবে, যে-প্রকার দুর্নিবার বেগে সত্যনিচয় আবির্ভূত হয়, সকলের চিত্তে তাহা হয় না। ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। মানুষে মানুষে বর্ণ, অবয়ব, স্বাস্থ্য, বল ইত্যাদি দৈহিক বিষয়ে কত ব্যবধান দৃষ্ট হয়। মানসিক শক্তি ও নৈতিক প্রকৃতিতেও তদ্রূপ। ভূতলে প্রতিভা এত বিরল কেন? বিশ্ববিশ্রুত কবি, চিরঞ্জীব শিল্পী, বিচিত্রকর্ম্মা রাষ্ট্রপতি, সৃষ্টিকুশল লোকনায়ক, দিগ্বিজয়ী বীর—এক এক জন মরণজয়ী কীর্ত্তির ভাস্বর প্রভায় দিঙ্‌মণ্ডল আলোকিত করিয়াছেন. কিন্তু তাঁহাদিগের বংশলতিকার দূরপ্রসারী পূর্ব্বগামী ও পরবর্ত্তী কালপ্রবাহে অসামান্যতার কিরণরেখাও দৃষ্ট হয় না। এই সে দিন সহসা কোন্ অজ্ঞাত পরিবারে, অননুকূল আবেষ্টনের মধ্যে শ্রীনিবাস রামানুজমের ন্যায় অতুলনীয় গণিতবিদের আবির্ভাব হইল। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের অধ্যাপক জে. বি. এস্. হল্ডেন বলেন,

"Had he lived a century earlier, when the methods which he favoured were yielding their best results, he were probably have been the world's greatest mathematician. And though he died too early to earn that title, he may perhaps be awarded the palm for mathematical originality in the twentieth century".

Possible Worlds. p. 156.

"রামানুজম্ যদি এক শত বৎসর পূর্ব্বে জীবিত থাকিতেন—তিনি যে গবেষণাপ্রণালীর পক্ষপাতী ছিলেন, তাহা সেই সময়েই উৎকৃষ্ট ফল প্রসব করিতেছিল—তাহা হইলে সম্ভবতঃ তিনি পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গণিতবেত্তা বলিয়া গণ্য হইতেন। যদিও অসময়ে মৃত্যু হওয়াতে তিনি সে খ্যাতি লাভ করিতে পারেন নাই, তথাপি বোধ হয় বিংশ শতাব্দীতে গণিতে মৌলিকতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার তাঁহারই প্রাপ্য।"

মানবসমাজে এই প্রকার অলৌকিক প্রতিভাজ্যোতিষ্কের উদয়াস্তের নিয়ম কোনও বিজ্ঞান অদ্যাপি আবিষ্কার করিতে পারে নাই। সুতরাং বিশ্বামিত্র, মধুচ্ছন্দা, কণ্ব, মেধাতিথি, অগস্ত্য, যাজ্ঞবল্ক্য, মূসা, ঈশা, বুদ্ধ, মহম্মদ, এই সকল পুরুষের অন্তরে যদি প্রাকৃতজন অপেক্ষা ধর্ম্মের মহামূল্য তত্ত্বসমূহ "হস্তস্থিত আমলকবৎ" সর্ব্বসংশয় ছিন্ন করিয়া উজ্জ্বলতররূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকে, তাহাতে নৈসর্গিক নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নাই। "যমেবৈষ বৃণুতে"—ব্রহ্ম যাঁহাকে সত্যপ্রকাশের জন্য বরণ করেন, তিনিই যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিতে পারেন, অপর কেহ পারে না।

যদি কাব্য, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, রাষ্ট্রনীতি, সমরকৌশল, সকল বিভাগে অনন্যসুলভ মনীষার অভ্যুদয় হইতে পারে, তবে আধ্যাত্মিক প্রতিভারই বা না হইবে কেন? অপিচ, বিশ্বেশ্বর জাতিবিশেষে তাঁহার কৃপা আবদ্ধ রাখেন নাই। বহু বৎসর পূর্ব্বে আর্চবিশপ টেম্পল "মানবজাতির শিক্ষা" নামক নিবন্ধে লিখিয়াছিলেন,

"Thus the Hebrews may be said to have disciplined the human conscience. Rome the human will, Greece the reason and taste, Asia the spiritual imagination."

Essays and Reviews, p. 19.

"এই রূপে বলা যাইতে পারে, ইহুদী জাতি মানবের বিবেককে, রোম ইচ্ছাবৃত্তিকে, গ্রীস বিচারবুদ্ধি ও সৌন্দর্য্যবোধকে এবং আসিয়া আধ্যাত্মিক কল্পনাশক্তিকে শিক্ষা দিয়াছে।"

কিন্তু তরলপদার্থ যেমন পাত্রভেদে বিভিন্ন আকার ধারণ করে, আপ্তবাক্যও তেমনি শ্রোতার দেশ, কাল, শিক্ষা, ভাষা প্রভৃতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ভারতীয় ঋষি সংস্কৃতে, মূসা হিব্রুতে, ঈশা গালিলি-প্রদেশের উপভাষায়, মহম্মত আরবীতে বাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন; সেই সেই ভাষাতেই তত্তৎ শ্রুতি নিবদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। অতএব, revelation অসম্ভব বলিয়া বিশ্বাস না করিলেও আমরা বলিতে পারি, প্রথমতঃ, শ্রোতা যে বাণী অবিকল হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিয়াছিলেন, দ্বিতীয়তঃ তিনি যতটুকু যথাযথরূপে ধারণ করিতে পারগ হইয়াছিলেন তাহা যে অবিকৃত আকারে রক্ষিত ও প্রচলিত হইয়াছে, এই দুই বিষয়ে বিচারের অবকাশ আছে। সুতরাং ধর্ম্মান্ধতার মোহে জ্ঞান বুদ্ধি বিসর্জ্জন না দিলে কেহই আপ্তবাক্যকে বিচারের বাহিরে রাখিয়া দিতে পারে না।

শ্রুতির গোঁড়া পক্ষপাতীরা বলেন, এখানে বিচারের স্থান নাই, কারণ, "বিশ্বাসে পাইবে তাঁরে, তর্কে বহু দূর"; শ্রুতি শুধু বিশ্বাস দ্বারা বোধগম্য হইয়া থাকে, ইহা জ্ঞান, reason বা knowledgeএর আয়ত্ত নয়। এক অর্থে কথাটী কিয়ৎ পরিমাণে সত্য। বিশ্বাস, faith কেবল ধর্ম্মজীবনে নয়, জ্ঞানজগতেও উহা মানুষের পরম সহায়; বিজ্ঞানের এক একটী অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কার ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কিন্তু আমি যাহা বিশ্বাসবলে গ্রহণ করিতেছি, জ্ঞানের কষ্টিপাথরে পরখ করিলে তাহা খাঁটি বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে, এই প্রত্যয় না থাকিলে বিশ্বাসের মূল্য অত্যল্প। "তোমার যদি সর্ষপকণা-পরিমাণ বিশ্বাস থাকে,

তোমার আদেশে পর্ব্বত অন্তর্হিত হইবে"; ঈশার এই বাণী সুপরিচিত। নেপোলিয়ন ইটালী বিজয়ের প্রাক্কালে বলিয়াছিলেন, "There shall be no Alps." তিনি সত্য সত্যই জয়যাত্রার অন্তরায় শৈলমালা পদানত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার বিশ্বাসের পশ্চাতে শক্তিরূপী জ্ঞান বিদ্যমান ছিল। বস্তুতঃ ধর্ম্মসাধনে যাত্রার প্রারম্ভবিন্দু (starting point) বিশ্বাস, নির্ম্মল জ্ঞান গন্তব্য তীর্থ (goal)। দুইটী অবিচ্ছেদ্য। উপনিষদে পুনঃ পুনঃ বিশ্বাস ও জ্ঞানের গুরুত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্রুতির মর্ম্মাবধারণে বিশ্বাস ও জ্ঞান উভয়ের প্রয়োজন না থাকিলে সমস্ত ঐতিহাসিক ধর্ম্মশাস্ত্রের টীকা, ব্যাখ্যা, ভাষ্য, ভাষ্যানুভাষ্য প্রভৃতির গ্রন্থগুলি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া "অনন্তপার" হইয়া উঠিত না।

পারম্পর্য্য (Tradition)

শ্রুতিজাত অর্থাৎ আপ্তবাক্যলব্ধ ও শাস্ত্রসিদ্ধ ধর্ম্মের পশ্চাতে একটা tradition, পরম্পরাগত ধারা, লিখিত বা অলিখিত ব্যাখ্যা-প্রণালী, পুরাতন প্রথা, কুলাগত আচার থাকে। Traditionএরও মূল্য আছে। ধর্ম্মের তত্ত্ব ও ব্যবহার, কোনটীই নিরবচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত মত ও স্বস্বপ্রধান আচারের উপরে টিঁকিয়া থাকিতে পারে না। যেমন অন্য সমবেত কর্ম্মক্ষেত্রে, তেমনি ধর্ম্মে সমষ্টির নিকটে ব্যষ্টিকে নত হইয়াই চলিতেই হইবে। Tradition ধর্ম্মে অনুরাগ প্রজ্জ্বলিত রাখে, সাধনের ধারাকে সুনির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে পরিচালিত করে, অনুগামীদিগকে মণ্ডলীর নিকটে বিশ্বস্ত থাকিবার উপায় দেখাইয়া দেয়, কেন্দ্রাপসারিণী শক্তিকে খর্ব্ব করিয়া কেন্দ্রাভিগামিনী শক্তিকে জয়যুক্ত করিয়া তোলে। Tradition নির্ম্মল জীবনযাপনও সহজসাধ্য করিয়া দেয়। দুই একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। নারীজাতির পরম্পরাগত ব্রীড়া তাহাদিগকে সহজেই অভদ্র আচরণ হইতে রক্ষা করে; পরীক্ষায়

পড়িলে যুক্তিতর্কের প্রয়োজন হয় না; চক্ষুর পলকে বিদ্যুৎচমকের ন্যায় অন্তরে শ্রেয়ের পথ দেদীপ্যমান হইয়া উঠে, প্রেয়ের প্ররোচনা পরাস্ত হয়। যে-নারী সে স্থলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুক্তি খোঁজে, তাহার পক্ষে অশোভন আচরণ পরিহার করা একান্তই কঠিন। সেইরূপ এ দেশে "অতিথি গৃহদেবতা", এই পুরাগত সংস্কার যতদিন অটুট ছিল, তত দিন অতিথি-অভ্যাগত নিতান্ত গরীবের দ্বারে আসিলেও বিমুখ হইয়া ফিরিয়া যাইত না। যে ভদ্র গৃহস্থের একখানা বই ধুতি থাকিত না, স্নানান্তে আর্দ্র বস্ত্র শুকাইয়া তাহাই আবার পরিধান করিতে হইত, তিনিও অতিথির জন্য একখানা পাকশালা রাখিতেন। এখন জ্ঞানালোক বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আতিথেয়তা প্রায় উঠিয়াই গিয়াছে।

কিন্তু পরম্পরাগত পদ্ধতি ও আচারানুষ্ঠান কালক্রমে stereotyped, ছাঁচে ঢালা, মামুলী ও প্রাণহীন হইয়া পড়িতে পারে। অতএব প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য, জ্ঞানের আলোকে পরীক্ষা করিয়া তাহার অনুসরণ করিবে; নতুবা সে গতানুগতিকতা অথবা অন্ধ গোঁড়ামির মোহে আচ্ছন্ন হইয়া মনুষ্যত্ব হারাইবে। কোথায় আনুগত্য বাঞ্ছনীয়, কোথায় বিবেকের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে, এই মীমাংসা জ্ঞানের কার্য্য। জীবনের সমগ্র বিভাগে—উপদেশ ও সাধনপন্থা, গার্হস্থ্যানুষ্ঠান, নৈতিক আচার, ভাবের তরঙ্গ, কর্ম্মোদ্যম; আবার বিশ্বাস, জ্ঞান, নীতি, সুকুমার বৃত্তি—সমগ্র ক্ষেত্রে পরম্পরাগত ধর্ম্মধারা মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশের পথে সহায় কি না, এই কষ্টিপাথরের দ্বারা উহাকে পরীক্ষা করিতে হইবে। যে-ধর্ম্ম এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে না, তাহা বদ্ধ জলাশয়ে পরিণত হইয়াছে।

(২) সাধুজনাচরিত

(২) দ্বিতীয় সাধুজনাচরিত ধর্ম্ম। একটা সাধারণ দৃষ্টান্ত দিয়া বিষয়টীর অবতারণা করিতেছি। জ্যামিতি শিখিতে যাইয়া শিক্ষার্থী যদি ইয়ুক্লিডের ন্যায় বিন্দু হইতে আরম্ভ করিয়া স্বীকার্য, স্বতঃসিদ্ধ, সম্পাদ্য, উপপাদ্য সমস্ত স্বয়ং আবিষ্কার করিবার প্রয়াস পায়, অথবা জ্যোতিষের চর্চ্চা করিবার মানসে পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বকার কাল্‌ডিয়া, বাবিলোনীয়া, মিসরের জ্যোতির্বিদের মত নগ্ন চক্ষুতে জ্যোতিষ্কমণ্ডলী পর্য্যবেক্ষণ করিতে সুরু করে, তবে অভিভাবকেরা তাহার জন্য নিশ্চয়ই বাতুলালয় খুঁজিবেন। সুস্থমনাঃ বিদ্যার্থী এস্থলে জগতের সঞ্চিত জ্ঞানের সাহায্যে শিক্ষার সাধনায় প্রবৃত্ত হয়। প্রত্যেক মানুষ পদে পদে নিজে একটা নবনীতি বা নবধর্ম্ম প্রতিপাদন করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে, ইহা একেবারেই অসম্ভব। বিশেষতঃ যাহারা অপরিণতবয়াঃ, যাহাদিগের শিক্ষা অসম্পূর্ণ, অভিজ্ঞতা অকিঞ্চিৎকর, লোকচরিত্রজ্ঞান অণুপরিমাণ, তাহারা এ পথে পদার্পণ করিলে "মহতী বিনষ্টিঃ", মহাবিনাশ প্রাপ্ত হইবে। এ ক্ষেত্রেও তাহাকে অযুতবৎসরসঞ্চিত পূর্ব্ববর্ত্তী সজ্জনগণের উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দিগ্‌দর্শনযন্ত্রের ন্যায় পথ দেখাইয়া দিবে। ব্যবহারিক জীবনে পরম্পরাগত নীতিধর্ম্মের মূল্য অপরিসীম। কিন্তু এস্থলেও জ্ঞান-বিবেকের প্রদীপ মানুষের পরম বান্ধব। তৈত্তিরীয় উপনিষদের শিক্ষাধ্যায়ে আচার্য্য শিষ্যকে যে-সকল উৎকৃষ্ট উপদেশ দিয়াছেন, তন্মধ্যে একটী এই—

"যান্যস্মাকং সুচরিতানি তানি ত্বয়োপাস্যানি। নো ইতরাণি॥"

"আমাদের যে-সকল কর্ম্ম সৎ, সে-সকলই তোমার কর্তব্য, অন্য

(অর্থাৎ বিপরীত কর্ম্ম) কর্ত্তব্য নহে।" এই উপদেশে অভ্রান্ত গুরুবাদের দুর্গন্ধ নাই; গুরুর কোন্ কর্ম্ম সৎ, কোন কর্ম্ম অসৎ, শিষ্যকে তাহাও বিচার করিয়া দেখিতে হইবে।

কিন্তু আমরা ইদানীং কি দেখিতে পাইতেছি? 'সুচরিত', 'কুচরিত' বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। হুজুগে মাতিয়া যাও, দশজনে যাহার পশ্চাতে ছুটিতেছে, তুমিও তাহার পশ্চাতে ছুটিতে থাক। মনোমোহন বংশীরব শুনিয়া যেমন ইতর জীব আত্মহারা হয়, তুমিও তেমনি পদলালিত্য, ধ্বনিমাধুর্য্য, কল্পনার উচ্ছ্বাস, মনোবৃত্তির বিস্ময়কর বিশ্লেষণ, এবং নন্দনকানন হইতে সদ্যোঽবতীর্ণা ভোগলালসার সম্মোহন মন্ত্রে অভিভূত হইয়া শব্দশিল্পীর চরণে লুটাইয়া পড়। বাস্তবতা, realism এর খাতিরে অশ্লীলতার, বীভৎসরসের বিষ ছড়াও; ভুলিয়া যাও, নগ্নদেহের ন্যায় নগ্ন ভাষাও কদর্য্য। দিবা রজনী এই cant, এই শূন্যগর্ভ বাক্য জপ কর— "Art for Art's sake", "আমরা ললিতকলার জন্যই ললিতকলার অনুশীলন করিব।" ললিতকলার স্বরূপ সম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, প্রাচীন ও আধুনিক পূর্ব্বাচার্য্যগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহা বাতিল, পুরাতন বর্ষের নূতন পঞ্জিকার ন্যায় অব্যবহার্য্য।

একটা জাতির আধ্যাত্মিক মূল্য নিরূপণের যে কয়টী সঙ্কেত আছে, তন্মধ্যে একটী এই প্রশ্ন—"Who are its heroes?"—"এই জাতির আরাধ্য বীর কাহারা?" সুদীর্ঘকাল শিক্ষাকার্য্যে ব্রতী থাকিয়া এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছি, যে, নব্য সম্প্রদায়ের নৈতিক মেরুদণ্ড শক্ত হইতে এখনও বিলম্ব আছে।

ঔদার্য্য এবং গুণগ্রাহিতা সংস্কারমুক্ত চরিত্রের প্রশংসনীয় গুণ; কিন্তু গুণদুইটী জ্ঞানবর্জ্জিত ও ভাবান্ধ হইলে বিপত্তির কারণ হয়।

(৩) আত্মবিচারসিদ্ধ

(৩) পরিশেষে আত্মবিচারসিদ্ধ ধর্ম্ম। বর্ত্তমান যুগে আস্তিক্য-বুদ্ধিসম্পন্ন জ্ঞানীগণ ইহাকেই সর্ব্বোপরি স্থান দিয়াছেন। ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয় যে, এই অভ্রান্তগুরুবাদ ও অভ্রান্তশাস্ত্রবাদের দেশে ঋষিগণ পুনঃ পুনঃ স্বাধীন বিচারের গুরুত্ব ঘোষণা করিয়াছেন। আর্য্যজাতি তখন স্বাধীন ছিল, তাই শাস্ত্র ও গুরুর সহিত স্বানুভূতি, আত্মবিচার তুল্যমূল্য প্রাপ্ত হইত। যোগবাসিষ্ঠে উক্ত হইয়াছে—

স্বানুভূতেঃ সুশাস্ত্রস্য গুরোশ্চৈবৈকবাক্যতা।
যস্যাভ্যাসেন তেনাত্মা সন্ততেনাবলোক্যতে॥

"নিজের অনুভূতি, সুশাস্ত্র এবং গুরুবাক্য, এই তিনের ঐক্য করিয়া যিনি নিরন্তর ব্রহ্মজ্ঞান অভ্যাস করেন, তিনি পরমাত্মাকে দর্শন করেন।" 'সুশাস্ত্র' শব্দ হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, শাস্ত্র 'সু' ও 'কু' দুই প্রকার; সুশাস্ত্র আদরণীয়, কুশাস্ত্র বর্জ্জনীয়; অতএব, শাস্ত্রমাত্রই অভ্রান্ত সুতরাং মান্য হইতে পারে না।

ফলতঃ ধর্ম্ম জড়পূজা হইতে বিশুদ্ধ ব্রহ্মবাদ পর্য্যন্ত যে স্তরেরই হউক না কেন, জীবনে যদি ধর্ম্ম সত্যরূপে প্রতিফলিত করিয়া তুলিতে হয়, তবে বিশ্বাস, গুরুভক্তি, শাস্ত্রানুরাগ, এ সমুদায়ের সঙ্গে সঙ্গে অনুবর্ত্তীকে আত্মানুভূতি ও নিত্যসঙ্গী করিয়া রাখিতে হইবে। শাস্ত্র যত প্রাচীন হউক না কেন, গুরু জ্ঞানগৌরবে যত মহীয়ান্ হউন না কেন, এমন কি তিনি স্বয়ং ভগবান্, পরিত্রাতা, অথবা অংশাবতার বলিয়া গৃহীত হইলেও জিজ্ঞাসুর হৃদয় যদি তাঁহাদিগের বাণীতে সায় না দেয়, তবে সে কদাপি সংশয়তিমির পার হইয়া আলোকমণ্ডিত স্থির ভূমি লাভ করিতে সমর্থ হয় না।

উপসংহার

আমাদিগের এই সুদীর্ঘ আলোচনার ফলে বর্ত্তমান কালের উপযোগী হইতে হইলে ধর্ম্মের কি কি লক্ষণাক্রান্ত হওয়া আবশ্যক, তাহা হয় তো যথাকথঞ্চিৎ পরিস্ফুট হইয়াছে। সজীব ধর্ম্মের একটী লক্ষণ, সে যুগে যুগে নবকলেবর ধারণ করিয়া যুগোপযোগিতা লাভ করে, কিন্তু তাহার প্রাণশক্তির উৎস যে আত্মাপরমাত্মার নিগূঢ় যোগ, তাহা প্রবহমান থাকে। মানুষের এখন ধর্ম্মের প্রতি মনোনিবেশ করিবার অবসর কোথায়? একে তো পৃথ্বীপাল জাতিসমূহের রণদামামার রোলে অন্তঃস্থবাণী শ্রুতিগোচর হইতেছে না, তদুপরি জড়বিজ্ঞানের তীব্র জ্যোতিতে লোকের চক্ষু ঝলসিয়া গিয়াছে, তাহারা সিদ্ধান্ত করিতেছে, জড়াতীত সত্তা কল্পনার বস্তু, আধ্যাত্মিক জগৎ অলীক। অথচ অন্তরের অব্যক্ত বুভুক্ষা, হৃদয়ের urge (নির্ব্বন্ধ), ভোগে অতৃপ্তি, অনন্তের অভিমুখে নিত্যোত্থিত অস্ফুট ক্রন্দন—মানুষ এগুলিকেও চাপিয়া পিষিয়া নিস্তব্ধ করিতে পারিতেছে না। কিন্তু বহুতর জ্ঞানী ও গুণী প্রাচীন ধর্ম্মেও তৃপ্ত নহেন। যাঁহারা আপ্তবাক্য অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের সংখ্যা দিন দিন কমিয়া যাইতেছে, কত নরনারী কৌলিক ধর্ম্মে আস্থাহীন হইয়া পড়িয়াছেন। যাঁহারা পিতৃপিতামহাচরিত ধর্ম্ম এখনও পরিত্যাগ করেন নাই, তাঁহারাও পুরাতন গুরুবাদ ও শাস্ত্রবাদ বর্জ্জন করিয়া স্বানুভূতি ও আত্মতুষ্টির দ্বারা ধর্ম্মের সংস্কার ও সংরক্ষণের পক্ষে আন্দোলন করিতেছেন। রাষ্ট্রানুমোদিত ধর্ম্মে আস্থাবান্, কুলক্রমাগতধর্ম্মে অনুরক্ত, উদারমতাবলম্বী, সংস্কারপ্রয়াসী, ধর্ম্মবিরোধী, ধর্ম্মের ধ্বংসকামী—ইত্যাদি দলে নিরন্তর বিচারবিতণ্ডা চলিতেছে। এক স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, ও অপর

ভবিষ্যদ্ধর্ম্মের পরিকল্পনাকারী, এই দুই দর্শনাচার্য্যের অভিমত যৎকিঞ্চিৎ প্রদত্ত হইয়াছে। এখন, প্রচলিত খৃষ্টধর্ম্মে শ্রদ্ধা নাই, অথচ পূর্ণ মাত্রায় জড়বাদও সমর্থন করিতে প্রস্তুত নহেন, এমন এক বৈজ্ঞানিকের উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি।

অধ্যাপক হল্ডেন খৃষ্টধর্ম্ম আজিও জ্ঞান বিস্তারে কিরূপ বাধা দিতেছে, তাহা প্রদর্শনপূর্ব্বক নবযুগের ধর্ম্মসম্পর্কে বলিতেছেন,—

(১) বর্ত্তমান অবস্থার পরিবর্ত্তন না হইলে হয় তো ধর্ম্মের অবনতি ঘটিবে, এবং মানুষের জীবনে উহার কোনও প্রভাব থাকিবে না। ইহা মানবজাতির পক্ষে ঘোরতর দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। কেন না, ধর্ম্মের যে মূলতত্ত্ব নিজের ও প্রতিবেশীর সুখই জীবনের চরম লক্ষ্য নহে—এই তত্ত্বটী ভুলিয়া গিয়া লোকে আপনাকেই আরাধ্য দেবতার আসনে বসাইবে, এবং আত্মপূজায় প্রবৃত্ত হইবে।

(২) আমরা যে আকারে ধর্ম্ম দেখিয়া আসিতেছি, তাহা হয় তো কালক্রমে অন্তর্হিত হইবে। বহুজন ধর্ম্ম ছাড়াও সাধুজীবন যাপন করিতেছে। মৃত্যুর পরপারে পরলোক বিদ্যমান, এবং ঈশ্বরের personality আছে, অর্থাৎ তিনি পরমপুরুষ, এই বিশ্বাস ধর্ম্মের অচ্ছেদ্য অঙ্গ নহে। ঈশ্বর ও পরলোকে বিশ্বাস না থাকিলেও একজন দার্শনিক যুক্তির সাহায্যে দৃঢ় প্রত্যয়ে উপনীত হইতে পারে যে, আধ্যাত্মিক সত্তাই আদি সত্য এবং ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্।

(৩) ইহাও সম্ভবপর যে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের ধ্বংসাবশেষের উপরে এমন একটি ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইবে, বর্ত্তমান যুগের চিন্তার সহিত যাহার সংবাদিতা বা ঐক্য আছে।

আমরা বলি 'তথাস্তু'। বর্ত্তমান যুগের চিন্তার উপযোগী ধর্ম্ম আমাদিগেরও কাম্যবস্তু। কিন্তু যে-ধর্ম্ম ঈশ্বরকে পুরুষ বলিয়া স্বীকার

করে না, আত্মা অমর, এই প্রত্যয়কে উপেক্ষণীয় বলিয়া গ্রহণ করিতে অপ্রস্তুত নয়, সেই রক্তমাংসবিবর্জ্জিত, নীরস, স্বাদহীন ধর্ম্ম লইয়া ভারতবাসী কি করিবে? পুণ্যভূমি আমাদের ভারতবর্ষ—এই মহাদেশ পৃথিবীর দুইটি প্রধান ধর্ম্মকে জন্ম দিয়াছে; এখানে কত প্রকার ধর্ম্ম, উপধর্ম্মের উদ্ভব হইয়াছে, প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতে সাধনের কত বিচিত্র ধারা বহিয়া আসিতেছে। এ দেশে কত মহা-মনীষী অত্যাশ্চর্য্য দার্শনিক বিচারবলে জগত্তত্ত্বের উত্তুঙ্গ গিরিশিখরে আরোহণ করিয়াছেন; কত ভক্ত ভক্তির বন্যায় আসমুদ্রহিমাচল জন্মভূমি প্লাবিত করিয়াছেন, কত 'তচ্চিত্ত', 'তদ্গতপ্রাণ' নরনারীর সুমধুরসঙ্গীতে পাষাণহৃদয় বিগলিত হইয়াছে, পাপী উদ্ধার পাইয়াছে; কত যোগী ভোগতৃষ্ণার জাজ্বল্যমান প্রতিবাদস্বরূপ রাজসিংহাসন, ধনৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া প্রাকৃতজনকে বৈরাগ্যের মন্ত্র শিক্ষা দিয়াছেন; কত জীবন্মুক্ত পুরুষ বিষয়বৈভবের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিয়াও নিত্য ভূমানন্দের সাহচর্য্যে তদীয় মহিমালোকে বাস করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ধর্ম্মের এমন বহুরূপ সাধন আর কোনও একটা দেশে আছে কি? সভ্যতার ইতিহাসে আমাদের ঋগ্বেদ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ভারতের ধর্ম্মসাহিত্য যেমন বিপুল ও সর্ব্বতোমুখী, আর্য্য-জাতির অন্য কোন শাখায় তাহার তুলনা মিলে না। উপনিষদ, ভগবদ্গীতার মত কোন গ্রন্থ গ্রীসে রোমে কোনও মনস্বীর মেধা হইতে প্রসূত হয় নাই; ঔপনিষদিক ব্রহ্মবাদ ধরণীতে অদ্যাপি অতুলনীয় ও অনতিক্রান্ত রহিয়াছে। ভারতের গৌরব জনবহুলতায় নয়, ঐশ্বর্য্যমদমত্ততায় নয়, সাম্রাজ্যসংগঠনে নয়; ভারতের চিরন্তন গৌরব তাহার ব্রহ্মবাদ। আর্য্যজাতির প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শাখা-সকলের মধ্যে ভারতীয় ব্রহ্মবাদও প্রাচীনতম। ঋগ্বেদ ঈশাহী শকের

চারি হাজার অথবা দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে রচিত হউক, একেশ্বরবাদের বীজ, সেই সুপ্রসিদ্ধ মন্ত্র, "একং সৎ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি"—বৈদিক যুগেই উপ্ত হইয়াছিল। সে বীজ ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হইল, ব্রাহ্মণসাহিত্যের যুগে নবকিশলয়শোভিত তরুণতরুর আকার ধারণ করিল, উপনিষদের যুগে শাখাপ্রশাখাবিস্তারী মহা-মহীরুহে পরিণত হইয়া উঠিল। জাতীয় দশাবিপর্য্যয়ের ফলে সে মহীরুহ আলোকরোধী লতাগহনে আচ্ছাদিত হইয়া কত কাল লোকচক্ষুর অগোচর ছিল, কিন্তু তাহার রসধারা শুষ্ক ও সারবত্তাজীর্ণ হয় নাই। যাহারা স্বদেশভক্ত, অথচ চিরাগত নীতি ও ধর্ম্মে পরিতৃপ্ত হইতে না পারিয়া প্রকৃত মানুষ হইবার আকাঙ্ক্ষায় অভ্যুত্থিত হইয়াছে তাহারা দেখুক, জাতীয় গৌরবের অক্ষয় ভাণ্ডার তাহাদিগের হাতের কাছেই আছে; তাহারা উপলব্ধি করুক, যুগধর্ম্ম তাহাদিগের চক্ষুর সম্মুখেই গড়িয়া উঠিতেছে। এই ধর্ম্মের উৎপত্তি একটা বিজাতীয় আকস্মিক ব্যাপার নহে; ইহা বৈদিক ধর্ম্মের স্বাভাবিক পরিণতি ও সর্ব্বোচ্চ বিকাশ। বিগত শতাব্দীতে হিন্দু, খৃষ্টীয় ও মস্লেম সভ্যতার ত্রিবেণীসঙ্গম এই ভারতেই যুগধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়াছে। এ ধর্ম্ম বিদেশী পণ্য নয় যে, স্বদেশপ্রাণ নরনারী ইহাকে বয়কট্ করিবে; জাতীয় প্রতিভার প্রতিকূল নয়, যে বিরূপ হইয়া ইহাকে দূরে সরাইয়া রাখিবে; জ্ঞানবিরোধী, উন্নতির পরিপন্থী কিংবা Zeit-Guest অর্থাৎ যুগ-প্রকৃতির অনুপযোগী নয়; ভেদবুদ্ধিজনক, অশান্তির উদ্দীপক নয়, যে স্বদেশসেবার প্রেরণায় ইহার প্রতি বহিষ্কারের দণ্ড প্রয়োগ করিবে! এ ধর্ম্ম ভারতবাসীর নিজস্ব, পূরাগত পৈত্রিক সম্পত্তি। ইহার মূলতত্ত্ব তাহাদিগের অন্তর্নিহিত প্রবণতার সহিত বিজড়িত, স্বভাবানুকূল, সদ্যঃ-ফলপ্রদ, গৌরবের ধন। কি আশ্চর্য! যুগযুগান্তর ধরিয়া ধর্ম্মের

ইতিহাসে ঈশ্বরের যে-স্বরূপনিচয় অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহার প্রথমোন্মেষ আমরা ঋগ্বেদেই দেখিতে পাই। ঈশ্বর জ্ঞানবান্, পরমশক্ত, মঙ্গলময়; স্রষ্টা, পাতা, নিয়ন্তা, নেতা, সর্ব্বপরিবর্ত্তনের মূল; তিনি রাজা, পরিত্রাতা, অমৃতত্বদাতা, রক্ষক, সখা, পিতৃতম পিতা, মাতা, সর্ব্বস্ব, উপায়, সহায়; অধিবক্তা, বল, দুর্গ, আশুতোষ, প্রার্থনাশ্রোতা, ভাবগ্রাহী; বিবিধভাবে প্রকাশবান, এক, বিশ্বকর্ম্মা, পুরুষ, বিরাট—ইত্যাদি স্বরূপ নানা সুক্তে বিভিন্ন দেবতাতে আরোপিত হইয়াছে। (সমন্বয়-গীতাভাষ্য। ৪।১১॥)। পরবর্ত্তী ঐতিহাসিক ধর্ম্মশাস্ত্র বাইবেল ও কোরান অধ্যয়ন করিয়া দেখুন, প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষদিগের সুসমাচারের আলোকে বৈদিক ভারতের আধ্যাত্মিক প্রতিভা হীনপ্রভ বোধ হইবে কি? যে-জাতির সাধন-গৌরব এমন সমুজ্জ্বল, এত দূরপ্রসারী; তামসিক যুগের ভ্রষ্টাচারও যাহাকে বিলুপ্ত করিতে পারে নাই; যে-দেশে জ্ঞানবঞ্চিত, অবজ্ঞাত নিম্নস্তরেও নিরাকার, পূর্ণ ব্রহ্মের আরাধনাপ্রচারের ব্রতে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ এক এক সাধুর আবির্ভাব হইয়াছে; যে-দেশে নিরক্ষর গ্রামিকেরাও প্রতিমাপূজার রূপক ব্যাখ্যা দেয়,—এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের উপাসনা যদি সে দেশের উপযোগী না হয়, তবে national genius, জাতীয় অন্তঃপ্রকৃতির অর্থ কি? আমরা বলি, ঐ উপাসনাই হিন্দুর "স্বধর্ম্ম", আর সমস্তই "ভয়াবহ পরধর্ম্ম।"

কিন্তু কোন ধর্ম্মই শুধু হাওয়ায় বাঁচিয়া থাকে না; তাহার চাই উপযুক্ত সাধনক্ষেত্র, সুগঠিত মণ্ডলী; এবং আরও চাই অনুবর্ত্তীদিগের সরলতা, ঐকান্তিকতা, উৎসাহ, ত্যাগ ও একনিষ্ঠ সাধন। নিজেদের অযোগ্যতা ও অবিশ্বস্ততা অনুভব করিয়া আমাদের হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। পৃথিবীময় ধর্ম্মের গ্লানি দেখিয়া আমাদের অন্তর হইতে

স্বতঃই প্রার্থনা উত্থিত হইতেছে, "ভগবান্, সত্যধর্ম্ম জয়যুক্ত কর।" যে-নির্ম্মল ব্রহ্মোপাসনা বহুশতাব্দী তপোবনসীমায় আবদ্ধ ছিল, ভারতের পুনরুজ্জীবনের মহোদ্দেশ্যে তাহা জনসমাজে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মহতী ইহার আশা, সুদুষ্কর ইহার ব্রত, দুর্জ্জয় প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিপুঞ্জ, দুর্নিরীক্ষ্য সিদ্ধির অস্ফুট রশ্মি। শতধাবিভক্ত হিন্দুস্থান অন্তর্দ্রোহে হীনবল; অসাম্যমূলক বর্ণবিভাগ প্রাচীন সমাজকে বিকলাঙ্গ করিয়া রাখিয়াছে; যখন তখন ধর্ম্মোন্মত্ত হিন্দুমুসলমানের সংঘর্ষে রক্তগঙ্গা বহিতেছে। চিরকাল যাহারা সধর্ম্মী, সহকর্ম্মী, সতীর্থ, জ্ঞাতি-প্রতিবেশীরূপে সৌহার্দ্দে বাস করিল, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন লাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদিগের মধ্যেও বিরোধানল জ্বলিয়া উঠিল। দাসত্বজ মনোভাব, প্রাদেশিক মনোভাব, সাম্প্রদায়িক মনোভাব—অবনত জাতির এই ত্রিবিধ দৌর্ব্বল্য মিলনের পথে দুরতিক্রম্য বাধা হইয়া রহিয়াছে। বিবাদপরায়ণ, মিলনপরাঙ্মুখ ভারতবাসীর ঐক্যবন্ধনের নিগূঢ় সঙ্কেত কোথায়? রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের দলপতিগণ বিকর্ষণ-বিক্ষিপ্ত জনগণকে মিশ্রীর দানার মত কেন্দ্রীভূত করিবার বাঞ্ছায় কত সমিতি, কত অঙ্গীকার, কত pact, entente cordiale করিতেছেন, রাজনৈতিক কুরুক্ষেত্রে মিত্রলাভ, সুহৃদ্‌ভেদ, বিগ্রহ ও সন্ধির অভিনয় অহরহ চলিতেছে; কিন্তু স্বার্থের একত্বই কি কখনও জাতীয় একতার যথার্থ নিদান হইতে পারে? স্বার্থ কালবশে ভিন্নরূপ ধারণ করে; স্বার্থ আজ যাহাদিগকে মিত্র করিয়াছে, স্বার্থই কাল তাহাদিগের বিচ্ছেদ ঘটাইবে। শিক্ষা-বিস্তার, দারিদ্র্যদূরীকরণ, দেহমনের স্বাস্থ্যবিধান, অবাধ বিকাশের সুযোগ দান, এক কথায় জীবনসংগ্রামের তীব্রতা লঘু এবং আত্মোন্নতির পথ সুগম করিয়া দেওয়া—এ সমস্তই অত্যাবশ্যক এবং ঐক্যবন্ধনের

সহায়ঃ কিন্তু ইহার মূলসূত্র নিহিত আছে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা, এই তিন উদ্দীপনাসঞ্চারিণী মন্ত্রশক্তিতে। যে-ধর্ম্ম শুধু তত্ত্ব-বিচারে নয়, কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে অসাম্যকে বিষবৎ বর্জ্জন করে, মৈত্রী যাহার পরম সাধন, এবং মানুষের স্বাধীন বিকাশ যাহার লক্ষ্য,—সেই ধর্ম্মই জাতিতে জাতিতে ঐক্যস্থাপনের উৎকৃষ্ট উপায়। ভিন্ন ভিন্ন নামে, কত বিচিত্ররূপে অবনীমণ্ডলে ধর্ম্ম ঐ সার্ব্বভৌমিক আদর্শের দিকেই অগ্রসর হইতেছে। শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে ভবিষ্যদ্ধর্ম্মের যে পরিকল্পনা রামমোহনের চিত্তপটে উদ্ভাসিত হইয়াছিল, তিনি আশা করিতেন, সেই সর্ব্বজনীন বিকাশক্ষম ধর্ম্মই জগদ্বাসীকে এক মহাসংঘে মিলিত করিতে সমর্থ হইবে। তাঁহার সে আশা ফলবতী হইতে হয় তো এখনও অনেক বিলম্ব আছে। কিন্তু আমাদের এই অনৈক্যজর্জ্জর স্বার্থসংঘাতের দেশে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ও বাঞ্ছিত বস্তু কি? কিসের অভাবে ভারতবর্ষের জয়-যাত্রার রথচক্র চলিষ্ণু হইতেই নিশ্চল হইয়া পড়িতেছে? অভাব ঔদার্য্যের, পরমত-সহিষ্ণুতার, অনাবিল প্রেমের। কোনও একদেশদর্শী, শাস্ত্রনিগড়বদ্ধ, সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম জাতিসংগঠনে উক্ত অপরিহার্য্য উপকরণ যোগাইতে পারে না; পারে সেই ধর্ম্ম, যাহা মানুষকে ভ্রান্ত স্বাজাত্য ও স্বাধর্ম্মের নাগপাশ হইতে মুক্তি দিয়া অবিরত উন্নতি হইতে উন্নতি, বিকাশ হইতে বিকাশের পথে লইয়া যায়। পারে সেই ধর্ম্ম, যাহা স্বাধীনতা, সাম্য, ও মৈত্রীর স্বরূপ তাহার মনে মুদ্রিত করিয়া দিতে সুক্ষম। ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মানবের ভ্রাতৃত্ব স্বানুভূতির অন্তর্নিবিষ্ট হইলে তবে একজন মানুষকে মানুষ বলিয়াই সম্মান এবং তাহার নৈসর্গিক স্বত্ব স্বীকার করিতে প্রস্তুত হয়। মৈত্রীর প্রস্রবণ প্রেমস্বরূপ ঈশ্বরের সহিত হৃদয়ের নিভৃত যোগ; যিনি বিশ্বমানবের পিতা মাতা সখা,

তাঁহার সহিত প্রেমের আদানপ্রদান হইতে যে-মৈত্রী সঞ্জাত হয়, তাহাই অকৃত্রিম, অবিচল ও ঘাতসহ। যদি প্রকৃত স্বাধীনতার মর্ম্ম বুঝিতে চাও তবে অগ্রে 'স্ব'কে অবগত হও; উপলব্ধি কর, যে, যিনি তোমার পরম নিজস্ব, তাঁহার স্বরূপাভাসে বিকশিত না হইলে তোমার স্বাধীনতার কোন মূল্যই নাই। জ্ঞানযোগে ও ভক্তিযোগে ইচ্ছাময়ের সকাশে স্বেচ্ছাকে পূর্ণরূপে আহুতি না দিলে কেহ কোন কালে স্বাধীন হইতে পারে না, বস্তুগত্যা সে বায়ুতাড়িত শুষ্কপত্রের ন্যায় একান্তই পরাধীন।

স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর কথাও বাহ্য; ইহার আগেও কথা আছে। ধর্ম্মের সার্থকতা বহিঃপ্রকাশেই নিঃশেষ হয় না। যে প্রেরণা মানুষকে ধর্ম্মের অন্তরঙ্গ সাধন দেহ মন অর্পণ করিতে উদ্বুদ্ধ করে, তাহা পুণ্যজীবনের জন্য অতর্পণীয় বুভুক্ষা, hunger for holiness. মানুষ যে দেবতাসম্ভব এবং অনন্ত জীবনের অধিকারী, তাহার পরিচয় দেয় জ্ঞানপিপাসা ও সৌন্দর্য্যবোধের উর্দ্ধে এই শুদ্ধতার আকিঞ্চন। ধর্ম্ম যে-পরিমাণে আত্মাকে ব্রহ্মপ্রকৃতির অনুরূপ করিয়া পুনর্গঠন করিতে সমর্থ, সেই পরিমাণে সত্য। আত্মার জাতসংস্কার, প্রকৃতিপরিবর্ত্তন, আকাঙ্ক্ষা-উদ্যমের আমূল সংশোধন, পরমাত্মস্বভাবের অভিমুখে অবিরাম গতি, দ্বিজত্বলাভ—যে ধর্ম্ম উপাসকের সম্মুখে নিয়ত এই আদর্শ রাখিয়া তাহাকে পরমসুন্দরের রূপে আকৃষ্ট এবং পরিপূর্ণ আত্ম-বিসর্জ্জনের জন্য আকুল করে, সেই ধর্ম্মই নবযুগের ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মেই ভারতে পরিত্রাণ, সেই ধর্ম্মই ভবিষ্যমানবের রক্ষাকবচ—

স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ

"এই ধর্ম্মের অত্যল্পও মানুষকে মহৎ ভয় হইতে ত্রাণ করে।"

গীতা ।২।৪০।

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে
তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ ।"

“যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে ।

তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ ।”

ভূমিকা

ভগবদ্গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের একাদশ শ্লোক অতি সুপরিচিত। আমি উহা অবলম্বন করিয়া আমার বক্তব্য বিবৃত করিব।

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥

“যে যে-ভাবে আমাকে ভজনা করে, আমি সেই ভাবেই তাহাকে অনুগ্রহ করিয়া থাকি। মনুষ্যগণ সর্ব্বপ্রকারে আমারই পথের অনুবর্ত্তী হইয়া থাকে।”

প্রথম পদের শাঙ্কর ভাষা—“যাহারা যে-প্রকারে, যে-প্রয়োজনে, যে-ফলের প্রার্থী হইয়া আমার ভজনা করে, তাহাদিগকে আমি সেই ফল প্রদানের দ্বারা অনুগৃহীত করি। তাহারা স্পষ্টই মোক্ষ প্রার্থনা করে না, মোক্ষকামনা ও ফলকামনা যুগপৎ এক ব্যক্তিতে সম্ভবে না; যাহারা যথোক্ত কর্ম্ম করিয়া তাহার ফল কামনা করে, মোক্ষও চাহে, তাহাদিগকে জ্ঞানপ্রদানের দ্বারা, যাহারা জ্ঞানী, সন্ন্যাসী এবং মোক্ষকামী, তাহাদিগকে মোক্ষপ্রদানের দ্বারা, আর্ত্তদিগকে আর্ত্তি হইতে ত্রাণের দ্বারা—যাহারা যেরূপে আমাকে ভজনা করে, তাহাদিগকে সেই রূপে আমি অনুগৃহীত করি।” ইতি।

ধর্ম্মের স্তর

শঙ্কর এস্থলে পর পর ধর্ম্মসাধনের কয়েকটী স্তরের উল্লেখ করিয়াছেন। ফলকামনা ধর্ম্মসাধনের প্রথম স্তর। বস্তুতঃ চিন্তা-শক্তির উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ যখন আপনার ও জগতের বিষয়ে ভাবিতে শিখিল, তখন সে দেখিল, তাহাকে পদে পদে আপনার অতিরিক্ত, আপনার বাহিরে, এক বা বহু শক্তির উপর নির্ভর করিতে হইতেছে; জীবনরক্ষার জন্য যে-সকল পদার্থ অপরিহার্য্য, সেগুলি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র তাহার শক্তির আয়ত্ত নয়। এক দিকে আত্মাতিরিক্ত সত্তার অনতিক্রম্য অধীনতার বোধ এবং অপর দিকে বিশ্বের কাম্য বস্তু সম্ভোগের আকাঙ্ক্ষা—এই বোধ এবং আকাঙ্ক্ষার জাগরণ হইতেই ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে। এজন্য দেখিতে পাই, পৃথিবীর সর্ব্বত্র মানবজাতির উষাকালে বলি, নৈবেদ্য, স্তব ও প্রার্থনা ধর্ম্মসাধনের রূপ। এই চতুরঙ্গ সাধনের অন্তর্নিহিত ভাব এই—উপাসক যেন আরাধ্য দেবতাকে বলিতেছে, "Do ut des," "দেহি মে দদামি তে," —"তুমি আমাকে ইষ্টবস্তু দিবে, এই আশায় আমি তোমাকে নৈবেদ্য দিতেছি।" ঋগ্বেদাদি ধর্ম্মগ্রন্থগুলি "ধনং দেহি জনং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি" (ধন দেও, জন দেও, যশঃ দেও, শত্রু বধ কর) এই প্রকার প্রার্থনায় পরিপূর্ণ। গীতার নিষ্কাম কর্ম্মের উপদেশ উহার বহু শতাব্দী পরবর্ত্তী, অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

ধর্ম্ম মানুষের স্বভাবনিহিত, প্রকৃতির অন্তর্গত, প্রকৃতির সহিত ওতঃপ্রোতভাবে বিজড়িত। সুতরাং ধর্ম্ম স্বাভাবিক; ধর্ম্মের দ্বারা স্বতঃনিস্যন্দিত, ধর্ম্মের সাধন সহজ, অর্থাৎ মানুষের সহজাত। তৎপরে এটীও লক্ষ্য করিবার বিষয়, যে ধর্ম্মের পরিণত বিকাশে জ্ঞানবৃত্তি,

হৃদ্বৃত্তি ও ইচ্ছাবৃত্তি—এই ত্রিধারা পরস্পরের পরিপুষ্টিসাধনকল্পে মিলিত হইয়াছে বটে, কিন্তু উহার সাধন শৈশবাবস্থায় জ্ঞানের উপরে তত নির্ভর করে না, যত নির্ভর করে হৃদ্বৃত্তি বা ভাবের উপরে। নতুবা অজ্ঞ, নিরক্ষর, বিদ্যাবঞ্চিত নরনারী ধর্ম্মের সাধনে ও ধর্ম্মপালনে চিরকাল বঞ্চিত থাকিয়া যাইত। শুধু বিদ্যার কথাই বা বলি কেন? প্রখরবুদ্ধিবলে কত ব্যক্তি বর্ণপরিচয়ব্যতিরেকেও রাজমুকুট জয় করিয়াছেন; 'অবিদ্বান্' মহাপুরুষ দিগ্‌বিজয়ী ধর্ম্মস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্মের বিশেষত্ব এই, যে ইহার সাধনের এমন একটা ক্রমবিকাশ আছে, যাহাতে বিদ্যাবত্তা, পাণ্ডিত্য, তীক্ষ্ণবুদ্ধির অধিকারী সাধক হইতে আরম্ভ করিয়া দীনদরিদ্র, মূর্খ, অল্পবুদ্ধি, সমাজে অবজ্ঞাত, নগণ্য মানুষ পর্য্যন্ত যে-কেহ স্বীয় যোগ্যতার অনুরূপ সাধনক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে। আমার স্বগ্রামের অনুন্নত শ্রেণীর একটী যথার্থ ভাগবত ব্যক্তির দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিতেছি।

সহজ ধর্ম্ম

আমাদের পুকুরের উত্তর পাড়ে এক প্রজা বাস করিত, নাম লক্ষ্মণ মাঝি। মাঝিদের প্রধান ব্যবসায় মাছ ধরা ও মাছ বিক্রয় করা। তা' ছাড়া নৌকা চালান, জমিজমা চাষ করা, মজুরি করা, ভদ্র গৃহস্থের ঘরে ঘরামির কাজ করা, পুরুষ-স্ত্রীতে মিলিয়া জাল বোনা, ইত্যাদি তাহাদিগের জীবিকা উপার্জ্জনের আরও কতকগুলি পথ আছে।

লক্ষ্মণ অত্যন্ত গরীব। তাহার একখানি ছোট বাসের ঘর ও খুব ছোট একখানি রান্নাঘর ছিল। পরিবারে স্বামী-স্ত্রী ও চারি পাঁচটি কন্যা; দুইটী বিধবা, অপর কয়টীর যথাসময়ে বিবাহ হইয়া

গেল। একটী শিশু পুত্র ও এক বিবাহিতা কন্যার শোকও তাহাদিগকে বহন করিতে হইয়াছিল।

লক্ষ্মণ ও তাহার স্ত্রী বড়ই সৎস্বভাব ছিল। আমাদের বাড়ীর সংলগ্ন উত্তরপূর্ব্ব কোনে ইহাদের বসতবাটী, আমরা সদাসর্ব্বদা উহার ভিতর দিয়া যাতায়াত করিতাম, অথচ কখনও ইহাদের গলার আওয়াজ শুনিতাম না, নিজেদের মধ্যে বা অপরের সহিত কলহ করিতেও ইহাদিগকে দেখি নাই। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গভীর প্রেম ছিল। তাহাদের চরিত্রে একটুকুও কলঙ্কের দাগ পড়ে নাই।

লক্ষ্মণের জমিজমা অল্পই ছিল। সে আর সব মাঝির মত মাছ ধরিয়া জাল বুনিয়া নৌকা চালাইয়া পরিবার প্রতিপালন করিত। বোধ হয় চল্লিশ বৎসর এই রকম করিয়া চলিয়া গেল। তারপর তাহাতে এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখা দিল। সে আমাদের গ্রামের এক বৈরাগীর নিকটে দীক্ষা লইল। একখানি ছোট পূজার ঘর করিল। তাহাতে সে প্রতিদিন সকালে স্নান করিয়া ফুল দিয়া পূজা করিত। সে ঘরে কোন প্রতিমা ছিল না; কাহার পূজা করিত কখনও জিজ্ঞাসা করি নাই। দীক্ষার পরেই লক্ষ্মণ মাছ খাওয়া ছাড়িয়া দিল, তাহার স্ত্রীও ছাড়িল। মাছ ধরা জীবিকার প্রধান সম্বল, সে মাছ ধরা বন্ধ করিল। কিছুদিন পরে তাহার মনে একটা ধাক্কা লাগিল—"মাছ নিজে মারি না, কিন্তু মাছ মারিবার জাল তৈয়ার করি; আমি তো জীব বধ করিবার সাহায্য করিতেছি।" সে ও তাহার স্ত্রী দুই জনেই জাল তৈরার করা ত্যাগ করিল। এখন লক্ষ্মণের সংসার চালাইবার একমাত্র উপায় রহিল একখানি ক্ষুদ্র নৌকা। আমাদের গ্রামের আধক্রোশ পূর্ব্বে এক গ্রামে অনেক কর্ম্মকারের বসতি। তাহারা উহার প্রায় তিন ক্রোশ পশ্চিমে এক বড় হাটে

প্রতি শনিবার লোহার সরঞ্জাম বিক্রয় করিত। লক্ষ্মণের প্রধান কাজ হইল, নৌকাতে কর্ম্মকারদের লোহার মাল গ্রাম হইতে হাটে ও হাট হইতে গ্রামে বহন করা। ইহাতে সে সামান্য যাহা পাইত, তাহাতেই জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাহাকে দিন চালাইতে হইয়াছে। ঘোর কষ্টে পড়িয়াও লক্ষ্মণ একবারের তরেও নিজের ব্রত ভঙ্গ করে নাই। সে সাত্ত্বিক বৈষ্ণব ছিল, বৈষ্ণব থাকিয়াই পরলোকে গমন করিয়াছে। তাহার সুশীলা ও সদাচারিণী পত্নীও পতির পায়ে পায়ে চলিয়া ওপারে যাইয়া তাহার সহিত মিলিত হইয়াছে।

যে পথে নিম্নবর্ণের এই অশিক্ষিত অবজ্ঞাত ব্যক্তির ধর্ম্মজীবন বিকশিত হইয়াছিল, সে পথে আরও কত সরলপ্রাণ, নির্ম্মলচরিত্র, পুণ্যব্রত মানুষ যথার্থ ভাগবত নামের যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন। এই জন্যই এদেশের চিরাগত সংস্কার, ধর্ম্মচর্য্যায় সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয় দীনতাবোধ, অনুরাগ, নিষ্ঠা, আত্মসমর্পণ ও ভক্তি—ধীশক্তি ও শাস্ত্রাধিকারের স্থান এ সকলের অনেক নীচে। এই দিক্ দিয়া বিচার করিলে, এবং উদ্ধৃত শ্লোকটীর দুই পঙক্তি একত্র পড়িলে প্রথম পদের আরও একটী ব্যাখ্যা আমাদের সুসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতে পারে। মানুষ যে ভাবেই ঈশ্বরের আরাধনা করুক না কেন—সে যদি বৃক্ষ, প্রস্তর, পুত্তলিকার সাহায্যেও তাঁহার পূজা করে, তবে সেই পূজাও তিনি গ্রহণ করিয়া তাহাকে কৃপা দানে চরিতার্থ করিবেন। ব্যাখ্যাটী দার্শনিক বিচারে টিঁকিবে না, কিন্তু বহু শিক্ষিত ব্যক্তির এই মতে অটল আস্থা আছে। "ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ"—এই বাক্যটীও উক্ত মতের পোষকতা করে। "যত মত তত পথ"—এই লৌকিক বচনটীতেও অনুরূপ মত ব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু আমরা একটু পরেই দেখিতে পাইব, ইহাতে ভ্রম আছে।

পন্থা এক

অতএব মানুষেরা যে-ফলকামনায় কিংবা যে-ভাবে ঈশ্বরের ভজনা করুক না কেন, তাহারা সর্ব্বপ্রকারে তাঁহারই পথের অনুসরণ করিয়া থাকে। দ্বিতীয় পদের ভাষ্যে শঙ্কর বলিতেছেন—"মনুষ্যেরা বলিতে যাহারা যে-ফলের আকাঙ্ক্ষায় যে কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া যে-প্রযত্ন করে, সেই মনুষ্যগণের কথা এস্থলে বলা হইতেছে।"

শ্রীধর—"সর্ব্বশঃ সর্ব্বপ্রকারে, ইন্দ্রাদিসেবকেরাও, আমারই বর্ত্ম অর্থাৎ ভজনমার্গ অনুবর্ত্তন করে, যেহেতু ইন্দ্রাদিরূপে তাহারা আমারই সেবা করে।"

উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় সমন্বয়গীতাভাষ্যে লিখিয়াছেন—"একবচনে ব্যবহৃত বর্ত্ম শব্দটী প্রদর্শন করিতেছে যে, পন্থা একই, প্রতিপত্তি অনুসারে ভিন্ন বলিয়া প্রতিভাত হয়। অপিচ জ্ঞানপ্রধান ব্যক্তিরা জ্ঞানের দ্বারা, প্রবৃত্তিপ্রধান ব্যক্তিরা কর্ম্মের দ্বারা, ভাবপ্রধানেরা ভক্তির দ্বারা, কামনাবশবর্ত্তী লোকেরা ফলাভিকাঙ্ক্ষার দ্বারা সেই এক ঈশ্বরকেই চিন্ময়, শক্তিমান্, প্রিয় বা অভীষ্ট ফলদাতারূপে জানিয়া আরাধনা করে।"

ব্যাখ্যাটী ব্রাহ্মসমাজের মনোমত।

ধর্ম্মান্ধতা—তাহার কুফল

"মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ"—এই ভগবদুক্তি ধর্ম্মান্ধতার ভেষজ, ধর্ম্মকলহের প্রতিষেধ, সাম্প্রদায়িক বিবাদ বিদ্বেষের দাবানল নির্ব্বাণ করিবার পর্য্যাপ্ত বারিধারা। "আমার ধর্ম্মেই জগতের সমস্ত সত্য নিহিত আছে, আর সমস্ত ধর্ম্মই মিথ্যা, আমার শাস্ত্রই অভ্রান্ত, জগতের অপর সমুদায় শাস্ত্র অসারের অসার, আমার পন্থাই মুক্তির পন্থা, আর সকলই নরকের পথ"—এই রকম গোঁড়ামি হইতে যত অনর্থ প্রসূত হইয়াছে, এমন আর কিছুতেই হয় নাই। খৃষ্টীয়, ইস্লাম প্রভৃতি ধর্ম্মের অনুবর্ত্তীরা বিশ্বাস করে, তাহাদিগের ধর্ম্ম স্বীকার না করিলে মানবের পরিত্রাণ নাই। রোমাণ কাথলিক সম্প্রদায়ের অন্যতম মৌলিক মত—"Extra ecclesiam salvatio non esse potest"—"চার্চ্চ বা তাঁহাদের মণ্ডলীর বাহিরে মানুষের পরিত্রাণ নাই, থাকিতে পারে না।" শত শত বৎসর ধরিয়া বিচার চলিয়া আসিতেছে,—যাঁহারা ঈশাকে পরিত্রাতা বলিয়া স্বীকার করে না, তাহারা তো অনন্ত নরকযন্ত্রণা ভোগ করিবেই; কিন্তু ঈশার অভ্যুদয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে কোটি কোটি নরনারী জন্মিয়াছে মরিয়াছে, যাহারা নব-ধর্ম্মের সুসমাচার শুনিবার অবকাশ পায় নাই, তাহাদের দশা কি হইয়াছে? অমরকীর্ত্তি মহাপুরুষ জরথুস্ত্র, কংফুচ, বুদ্ধ, সোক্রাটীস, 'ঈশার অগ্রগামী' নামে আখ্যাত প্লেটো, মহাকবি দান্তের মতে 'আচার্য্যগণের আচার্য্য' আরিষ্টটল—ইহারাও কি অন্তহীন দুর্গতিতে পড়িয়া রহিয়াছেন? এ সমস্যার সর্ব্ববাদিসম্মত সমাধান অদ্যাপি ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত। নিষ্ঠার সহিত যদি ঔদার্য্য মিলিত না হয়, তবে ধর্ম্মের নামে অত্যাচার উৎপীড়ন অপরিহার্য্য; বরং স্বধর্ম্মে বিচার-বিমুখ রতি যত গভীর হইবে, বিধর্ম্মীবিনাশের উদ্যম ও উৎসাহও ততই বাড়িয়া চলিবে, এবং তাহার ফলে রক্তস্রোতঃ বিপুলায়তন হইয়া উঠিবে। খৃষ্টধর্ম্মের ইতিহাসে ইহার জাজ্বল্যমান নিদর্শন বিদ্যমান।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম যানে Pope Innocent III বিধর্ম্মী-দিগের উচ্ছেদসাধনের অভিপ্রায়ে "পবিত্র ধর্ম্মাধিকরণ" (The Holy Inquisition) স্থাপন করেন। ১৪৮০ সনে উহা স্পেন দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার পর বৎসরেই যে লোমহর্ষণ নরমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন হইল,

তাহার আহুতিরূপে আট সহস্র বিধর্ম্মী হুতাশনে দগ্ধ হইয়া প্রাণ হারাইল বড় ক্ষোভে কবি টেনীসন অন্তিমজীবনে রচিত "Locksley Hall : Sixty Years After" নামক কবিতায় বলিয়াছেন—

"মহতো মহীয়ান্" (the Greatest of the Great) (ঈশা) উপদেশ দিলেন, 'শত্রুকে প্রেম দেও, যে তোমাকে বিদ্বেষ করে তাহাকে আশীর্ব্বাদ কর।' (কিন্তু) খৃষ্টীয় মণ্ডলীসমূহের মধ্যে প্রেম হইল অ-খৃষ্টিয় জাতির প্রতি বিদ্বেষের যমজ সহোদর।

"মানুষ আশীর্ব্বাদের সুবর্ণপাত্র ভাঙ্গিয়া নিজের জন্য অভিশাপ গড়িয়া তুলিল। সম্রাট্‌দিগের রোম, পিটারের উত্তরাধিকারী পোপদিগের রোম, এই দুইয়ের মধ্যে কোনটী নিষ্ঠুরতর, কোন্‌টী অধমতর ?"

কথিত আছে, এক ওয়াহাবী কোনও স্থূলকায় মাড়োয়ারীকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিরাছিল—"ওঃ, নরকের আগুনে পুড়িবার কি প্রকাণ্ড কাঠ রে!"

ভারতবর্ষ চিরদিন ধর্ম্মবিষয়ে ঔদার্য্য ও গুণগ্রাহিতা প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছে; কিন্তু পূর্ণচন্দ্রের কলঙ্ক আছে, ভারতের ইতিহাসও তথাকথিত বিধর্ম্মীর প্রতি উৎপীড়নের কলঙ্ক হইতে নির্ম্মুক্ত নহে। ভগবদগীতাত, পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে, সাধুগণের পরিত্রাণ ও দুষ্কৃতের বিনাশের অভিপ্রায়ে ভগবান্ যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। শঙ্করাদি ভাষ্যকারের মতে 'দুষ্কৃৎ' শব্দের অর্থ 'বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিরোধী'। তবেই দেখা যাইতেছে, 'মনুষ্যগণ সর্ব্বথা আমার পথেরই অনুসরণ করে', এই মহতী বাণী বর্ণাশ্রমধর্ম্মের গণ্ডীতে আবদ্ধ করা হইয়াছে, উহা বিশ্বমানবের পক্ষে প্রযোজ্য নহে। তত্ত্ববিচার ছাড়িয়া দিয়া ব্যবহারের দিক হইতে

আলোচনা করিলেও দেখিতে পাই, যে এ দেশের নরপতিরাও সময়ে সময়ে বিদ্বিষ্টধর্ম্মযাজীদিগের উপরে নৃশংস অত্যাচার করিয়াছেন। খৃষ্টপূর্ব্ব ২য় শতাব্দীতে মগধের রাজা পুষ্যমিত্র বৌদ্ধধর্ম্মের উচ্ছেদাশয়ে বহু মঠ দগ্ধ ও বহু ভিক্ষু বধ করেন। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে সাকল-রাজ মিহিরকুল সম্বন্ধেও ঐরূপ বর্ণনা বিদ্যমান আছে। ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে আমাদের মধ্যবঙ্গের রাজা শশাঙ্ক বৌদ্ধধর্ম্ম নির্ম্মূল করিবার জন্য বিহারসমূহ ধ্বংস, ভিক্ষুগণকে নির্ব্বাসন এবং বোধিদ্রুম উৎপাটন ও দাহ করেন। নবম কি দশম শতাব্দীতে পাণ্ড্যরাজ সুন্দর আট হাজার জৈনকে শূলে বধ করিলেন।

উদার বাণী—পশ্চিমে

কিন্তু সার্ব্বভৌমিক উদারতার তৃপ্তিদায়িনী বাণী পূর্ব্ব ও পশ্চিম, উভয় ভূখণ্ডেই ভগবদ্‌ভক্ত সজ্জনগণের কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে। কি আশ্চর্য্য! ধর্ম্মান্ধতার পীঠস্থান, নৃশংস যথেচ্ছাচারের লীলানিকেতন, বিধর্ম্মীর অনির্ব্বাপিতাগ্নি মহাশ্মশান স্পেন দেশে উদ্ভূত, রোমাণ-কাথলিক, জেসুইট-সম্প্রদায়ভুক্ত, কার্ডিন্যাল উপাধিধারী জুয়ান ডি লুগো সপ্তদশ শতাব্দীতে বিশ্বজনীন ভগবৎকৃপার কি অপূর্ব্ব বার্ত্তাই প্রচার করিয়াছেন। রোমান কাথলিকমণ্ডলীর বাহিরে, অন্যান্য-ধর্ম্মের সাধকেরা ভগবৎকৃপার অধিকারী হইতে পারে কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে লুগো বলিতেছেন—

"বিবিধ খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়, ইহুদী, মুসলমান ও পৌত্তলিক ধর্ম্ম, এবং তত্ত্বজ্ঞানীর দল—এই সকলের অন্তর্ভুক্ত নরনারীগণ নিশ্চয়ই পরিত্রাণ লাভ করিতে সমর্থ। কিরূপে, বলিতেছি। তাহাদের নিজ নিজ সমাজের পূজা ও উপদেশে যাহা সত্য ও কল্যাণকর, এবং যাহা আদিতে

ঈশ্বর স্বয়ং প্রকাশ করিয়াছেন, তাহারা সরল বিশ্বাসে একাগ্রচিত্তে সেইগুলি সাধন ও পালন করে। ঈশ্বর কৃপা করিয়া তাহাদিগের বিশ্বাসকে সাহায্য করেন, এবং সে জন্যই তাহারা মুক্তির অধিকারী হইয়া থাকে।"

"এখন, প্রধানতঃ যাহা ঘটে, তাহা এই—যে আত্মা সরল বিশ্বাসে ঈশ্বরকে, তাঁহার প্রেম ও সত্যকে, অন্বেষণ ও আকাঙ্ক্ষা করে, সে, যে-ধর্ম্মশাস্ত্র, ধর্ম্মসম্প্রদায়, মণ্ডলী বা দলের প্রভাবের মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহাতে অল্প হউক, বহু হউক, যাহা যাহা সত্য, তদুপরি সমগ্র অভিনিবেশ কেন্দ্রীভূত করে; সে এগুলির দ্বারাই পরিপুষ্ট হয়, যাহা ভ্রান্ত তাহা মনের বাহিরে থাকিয়া যায়। ভগবৎকৃপা ঐ সকল সত্যের সাহায্যে তাহাকে পোষণ ও ত্রাণ করিয়া থাকে।" (F. Von Hugel, *Essays and Addresses*, pp. 92, 252.)

উদার বাণী—ভারতে

লুগো ১৬৬০ সনে পরলোক গমন করেন। তাঁহার প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্ববর্ত্তী ভারত-সম্রাট্ আকবরের সভাসদ্ আবুল ফজলের একটী মধুর উক্তি আপনাদিগকে উপহার দিতেছি। উহা কাশ্মীরের এক মন্দিরের উৎসর্গলিপিস্বরূপ রচিত হইয়াছিল।

"হে ঈশ্বর, প্রত্যেক মন্দিরে আমি এমন মানুষ দেখিতে পাই, যাহারা তোমার দর্শন লাভ করিয়াছে; যত ভাষা শুনিতে পাই, তাহাতে নরনারী তোমারই স্তুতি কীর্ত্তন করিতেছে।"

"বহুদেববাদ ও ইসলাম তোমারই সত্তা উপলব্ধি করিবার প্রয়াস পাইতেছে।"

"প্রত্যেক ধর্ম্মই বলিতেছে, তুমি এক ও অদ্বিতীয়।

"মসজিদে লোকে অস্ফুটস্বরে পবিত্র প্রার্থনা উচ্চারণ করিতেছে, খৃষ্টীয়ান গির্জ্জাতে উপাসকেরা তোমারই প্রেমে ঘণ্টা বাজাইতেছে।"

"আমি কখনও গির্জ্জায়, কখনও মসজিদে গমন করি।"

"কিন্তু মন্দিরে মন্দিরে আমি তোমাকেই অন্বেষণ করিতেছি।"

"তুমি যাহাদিগকে বরণ করিয়াছ, তাহারা বিশুদ্ধ বা ভ্রান্ত মতের সহিত সংস্রব রাখে না; কেন না, তাহারা কেহই তোমার সত্যের যবনিকার অন্তরালে দণ্ডায়মান নহে।"

"কুধর্ম্মী কুধর্ম্ম এবং ধার্ম্মিক ধর্ম্ম লইয়া থাকুক;"

"কিন্তু গোলাপপটলের রেণুগুলি গন্ধবণিকেরই হৃদয়ের ধন।"

জ্ঞান ও ভাবের সামঞ্জস্য

ধর্ম্মকে এই প্রকার উদার দৃষ্টিতে দেখিলে বিশ্বমানবের প্রতি প্রীতির সাধন সহজ হয়। কিন্তু মানুষ যে-পথেই ঈশ্বরকে অন্বেষণ করুক না কেন, সে পথ পরিণামে তাহাকে ঈশ্বরসমীপে লইয়া যাইবেই, ইহা মানিয়া লইলেও এ কথা স্বীকার করিতে পারি না যে, সকল পথই সমান সরল ও সুগম। রোমক সাম্রাজ্যে প্রবাদ ছিল, "All roads lead to Rome," "সকল পথই রোমে যাইয়া পঁহুছিয়াছে।" প্রবাদটী সত্য হইলেও সুগমতা ও দুর্গমতা, সরলতা ও বক্রতা, দৈর্ঘ্য, মনোহারিত্ব প্রভৃতি সম্পর্কে বর্ত্মে বর্ত্মে বিস্তর পার্থক্য ছিল। ধর্ম্মসাধনেও ঠিক তাই। বৃক্ষপ্রস্তরের পূজা, সাকার দেবতার পূজা, এবং এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের আরাধনা তুল্যমূল্য হইতে পারে না। ধর্ম্মসাধনে জ্ঞানের স্থান অতি উচ্চ। ধর্ম্মের একটা সংজ্ঞা দিতে গেলেই আমাদিগকে যুগপৎ জ্ঞান, প্রেম, ও ইচ্ছাবৃত্তির বিকাশকে লক্ষ্যপথে রাখিতে হয়। ধর্ম্মের নিম্নস্তরে স্বাভাবিক কারণেই জ্ঞান নিস্তেজ, ভাবের প্রাধান্য

অধিক। বহু যুগের সাধনার ফলে মানব ভাবকে জ্ঞানের দ্বারা সংযত ও পরিচালিত করিতে শিক্ষা করিয়াছে। জ্ঞান ও ভাবের সামঞ্জস্য ভিন্ন ধর্ম্ম পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না।

ভাবপ্রধান জাতির লক্ষণ

যে-জাতি জ্ঞান অপেক্ষা ভাবকে প্রাধান্য দান করে, সে-জাতির মধ্যে শক্তি গুণ অপেক্ষা বৈষ্ণব গুণ, পুরুষোচিত গুণ অপেক্ষা নারী-জনোচিত গুণ—অর্থাৎ তেজঃ, বীর্য্য, আত্মপ্রতিষ্ঠার উৎসাহ, জ্ঞানানুরাগ, বিজিগীষা, অন্যায়-অত্যাচারের প্রতি দুর্জ্জয় ক্রোধ, এই জাতীয় গুণ অপেক্ষা বিনয়, নম্রতা, কোমলতা, সহিষ্ণুতা, আত্মসমর্পণে রতি ও আত্মবিলোপপ্রবণতা সমধিক বিকাশ লাভ করে। সুতরাং সে জাতির মধ্যে ভয় ও ভক্তির ভাব, এবং উন্মত্ত ভাবোচ্ছ্বাস, মর্ম্মন্তুদ অনুশোচনা, ধূলিতে অবলুণ্ঠন, দরবিগলিত ধারে অশ্রুবর্ষণ যত দেখা যায়, বংশ ও গোত্রকে অতিক্রম করিয়া হৃদয়ের প্রীতিকে রাষ্ট্রে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিবার আগ্রহ, অসত্য অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার সামর্থ্য, দুর্নীতিদমনে রুদ্রের অনুবর্ত্তন করিবার অদম্য সাহস তেমন দৃষ্ট হয় না।

জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা ভগবদ্গীতাতেই পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তিত হইয়াছে।

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনো হর্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ ৭।১৬ ॥

শ্লোকটী এই মন্দিরেই আমরা কতবার শুনিয়াছি। "পুণ্যকর্ম্মা চারি প্রকার মানুষ ঈশ্বরের ভজনা করে—আর্ত্ত (তস্কর ব্যাঘ্র রোগাদি দ্বারা অভিভূত), জিজ্ঞাসু (ভগবতত্ত্ব জানিতে ইচ্ছুক), অর্থার্থী (ধনকামী), এবং জ্ঞানী (ব্রহ্মবিৎ)। তাহাদিগের মধ্যে নিত্যযুক্ত, একমাত্র ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিমান্ জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ।"

বঙ্গদেশে প্রতিমাপূজার প্রসারবৃদ্ধি

বিগত অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে বঙ্গদেশে ভগবদ্গীতার বহুল প্রচার হইয়াছে। বোধ হয় এমন শিক্ষিত পরিবার নাই, যাহার একখণ্ড গীতা না আছে। সম্প্রতি উহা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকের তালিকায়ও স্থান পাইয়াছে। ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়, যে, গীতা-প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে নব্যসমাজে সাকারোপাসনাও প্রসার লাভ করিতেছে। পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্ব্বে আমরা যখন স্কুল কলেজে পাঠ করিতাম, তখন বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে ছাত্রাবাসে ছাত্রাবাসে সরস্বতী পূজার উৎসব প্রচলিত ছিল না। প্রাচীন সমাজের বাঁধন সকল দিকেই শিথিল হইতেছে; অন্নগত জাতিভেদ উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়; বৈবাহিক কুলাচারের প্রাচীরে ফাটল দেখা দিয়াছে; পারিবারিক কল্যাণ-চিন্তা সমাজহিতৈষীদিগের চিত্তকে ব্যথিত করিতেছে; পাশ্চাত্য শিক্ষার কৃপায় বিজ্ঞান দর্শনের বিমল জ্যোতিঃ দেশময় ছড়াইয়া পড়িতেছে; অথচ সাকার দেবতার পূজার প্রতি শিক্ষার্থী ও শিক্ষিত যুবকপ্রৌঢ়পরিণতবয়াঃ পুরুষনারীর সরল ঐকান্তিক বিশ্বাস দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে—ইহা এক দুরবগাহ্য রহস্য বলিয়া প্রতিভাত হয়।

ধরিত্রীর অধীশ্বর জাতিসমূহের শৈশবকালে যে দেশে অনুপম ব্রহ্মবাদ প্রচারিত হইয়াছিল, সেই উপনিষদ্ ভগবদ্গীতার দেশে জ্ঞান-মন্দিরে যাত্রীর দল যে নব্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে, "পরমাণু চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া উড়িয়া গিয়াছে, জড়জগতের মূলে নিরাকার শক্তি ভিন্ন আর কিছুই বিদ্যমান নাই"—এই প্রকার মন্ত্র আবৃত্তি করিতে করিতে পূজার ঘরে ঢুকিয়াই মূর্ত্ত দেবতাকে আবাহন করিতে বসিল, "যমুনা আবার উজান বহিতে লাগিল," ইহার অর্থ কি ?

প্রতিমাপূজার রূপক ব্যাখ্যা

নিষ্ঠাবান্ (এবং অনিষ্ঠাবান্) শিক্ষিত ব্যক্তিরা একটা ব্যাখ্যা দিয়া থাকেন। আমারই এক উচ্চপদস্থ মেধাবী বন্ধু বলিয়াছিলেন, "দুর্গাপ্রতিমা একটা প্রকাণ্ড symbol বা রূপক।" বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গোৎসবকে স্বদেশপ্রেম উদ্বোধনের উদ্দেশ্যে রূপক রূপেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। অনেকে হয়তো জানেন না, যে আনন্দমঠের মরণহীন জাতীয় সঙ্গীত যে, "বন্দে মাতরম্"--তাহার প্রথম আভাস দৃষ্ট হয় কমলাকান্তের দপ্তরের "আমার দুর্গোৎসব" নামক প্রবন্ধে। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে দেবীস্তোত্রের "যে দেবী সর্ব্বভূতে চেতনারূপে, শক্তিরূপে, ক্ষান্তিরূপে, শান্তিরূপে, কান্তিরূপে বর্ত্তমান"—এ সমুদায় বাক্য কোনও পরিমিত দেবতার প্রতি প্রযোজ্য নহে। কিন্তু সকল দেবদেবী সম্বন্ধে এ-কথা খাটে না; কোন কোন স্থলে মানবীয় ভাবে সুস্পষ্ট।

কিন্তু রূপক ব্যাখ্যাতে জ্ঞানপ্রেমপুণ্যে অনন্ত উন্নতিপিপাসু মানবাত্মা তৃপ্ত হইতে পারে না। অধিকন্তু ব্যাখ্যাটী অত্যন্ত পুরাতন। খৃষ্টীয় প্রথম কি দ্বিতীয় শতাব্দীতে টায়ার নগরনিবাসী মাক্সিমস (Maximus) মূর্ত্তিপূজা সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—

"ঈশ্বর বিশ্বের স্রষ্টা ও পিতা; তিনি সূর্য্য এবং আকাশ হইতে পুরাতন; তিনি দিনমাসসংবৎসরসমন্বিত সময়, অনাদ্যনন্ত কাল, এবং সমগ্রসত্তাপ্রবাহ হইতে মহত্তর; তিনি নামাতীত, বাক্যাতীত, চক্ষুর অগোচর; মানবের ভাষা তাঁহাকে প্রকাশ করিতে অক্ষম। আমরা তাঁহার স্বরূপ ধারণা করিতে অসমর্থ বলিয়া শব্দ, নাম, স্বর্ণরৌপ্যগজদন্তময় মূর্ত্তি, এবং তরুলতা, গিরিশিখর, নদী ও বেগবতী

স্রোতস্বিনীর সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকি। আমাদিগের চিত্ত তাঁহার জ্ঞানের জন্য তৃষিত; এজন্য অশক্তিবশতঃ বিশ্বের যাবতীয় সুন্দর বস্তু আমরা তাঁহার স্বরূপ দ্বারা ব্যক্ত করি। ঠিক যেমন সংসারের প্রেমিক করিয়া থাকে। প্রেমিকের নিকটে প্রেমাস্পদের প্রকৃত মুখখানিই সর্ব্বাপেক্ষা মনোহর দৃশ্য; কিন্তু প্রেমাস্পদকে স্মৃতিতে জাগ্রত রাখিবার অভিপ্রায়ে প্রেমিক তাহার একটী বীণা, একটা ছোট শেল, একখানি আসন, কিংবা ক্রীড়াভূমি অথবা ভূমণ্ডলের যাহা কিছু তাহার স্মৃতিকে উদ্রিক্ত করে, তাহা দেখিয়াই আনন্দ অনুভব করে। প্রতিমা সম্বন্ধে আর বিচার বিতর্কের প্রয়োজন কি? মানুষ ভাগবত স্বরূপ অবগত হউক; তাহারা দেবপ্রকৃতি উপলব্ধি করুক;—তাহাই যথেষ্ট। যদি একজন গ্রীক, ভাস্কর ফাইডিয়াসের রচিত প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া ঈশ্বরকে স্মরণ করে; যদি মিসরবাসীর অন্তরে ইতরপ্রাণীর পূজার দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপ উদিত হয়, যদি কেহ অগ্নি, কেহ বা প্রবাহিণীর সাহায্যে ঈশ্বরকে মনন করে—তবে এই বিভিন্ন পন্থার প্রতি আমার কোপের উদয় হইবে কেন? সকলে শুধু (ঈশ্বরকে) অবগত হউক, প্রীতি করুক, স্মরণে রাখুক।"

তত্ত্বজ্ঞানীদিগের উদার ব্যাখ্যা গ্রীস ও রোমের সাকারবাদকে খৃষ্টধর্ম্মের সর্ব্বগ্রাসী প্রভাব হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই। পৌত্তলিক পূজা পৃথিবীর আর সকল সভ্যদেশেই বিলুপ্ত হইয়াছে, আছে ভারতবর্ষে, যাহার গগনে ব্রহ্মবাদের প্রথম প্রভাত উদয় হইয়াছিল। উপনিষৎ, গীতার সমাদর বাড়িতেছে, কিন্তু আধ্যাত্মিক ক্ষুন্নিবৃত্তির কামনায় জনসমাজ রাজসিক অনুষ্ঠানের প্রতিই ঝুঁকিয়া পড়িতেছে। প্রস্থানত্রয়ের অদ্বিতীয় ভাষ্যকাররূপে শঙ্করাচার্য্য অদ্যাপি স্বদেশবাসীর হৃদয়ে রাজত্ব করিতেছেন, কিন্তু তিনি যে "পরাপূজাস্তোত্রে" বলিলেন,

"পূর্ণের আবাহন কোথায় ? সর্ব্বাধারের জন্য আসন কেন ? নির্ম্মলের স্নান, বিশ্বোদরের বস্ত্র, গন্ধহীনের জন্য পুষ্প, রম্যের জন্য আভরণ—এ কি ?"—সে কথায় কে কর্ণপাত করে ? বিচার করিতে চাহিলেই প্রতিপক্ষের মুখে শুনিবে—"সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।" "সাধকদিগের হিতের জন্য ব্রহ্মের রূপ কল্পিত হইয়াছে।" এই এক কথায় উপনিষৎগুলির সমাধি দেওয়া হইয়াছে। শুধু তাই নয়। সাকার অবলম্বন করিয়া এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের নির্ম্মল জ্ঞানে উপনীত হয় লক্ষের মধ্যে কয় জন ? যদি কেহ বলেন,

শিক্ষার্থিনাং হিতার্থায় গ্রন্থভাষ্যাঃ প্রকাশিতাঃ—

আর শিক্ষার্থী সারা জীবন পাঠ্য পুস্তকের ব্যাখ্যা, সরলটীকা, সুবোধিনী, তাৎপর্য্যমঞ্জুষা লইয়াই কাটায়, তবে আমরা কি বলিব ? অথবা মনে করুন, এক তীর্থযাত্রী প্রয়াগ যাইবার মানসে গৃহ হইতে বাহির হইল। কিছুদূর যাইয়া সে প্রশস্ত রাজপথ পাইল, সে পথ নানা জনপদ অতিক্রম করিয়া প্রয়াগে যাইয়া পঁহুছিয়াছে। পথিক আনন্দে চলিতে চলিতে কয়েক দিন পরে এক মনোহর পান্থশালায় উপনীত হইল, এবং সেখানকার আরাম আনন্দে মুগ্ধ হইয়া গন্তব্য তীর্থের কথা ভুলিয়া গিয়া পথিপার্শ্বেই রহিয়া গেল। সাকারবাদীর অবস্থাও তাই। সে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পূর্ব্বসাধন মনে করিয়া মূর্ত্তিপূজা গ্রহণ করিল। ক্রমশঃ হয়তো মূর্ত্তিপূজায় তাহার নিষ্ঠা জন্মিল, অনুরাগ বাড়িল; কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান সাধনের ঋষিপ্রোক্ত যে উপায়, শ্রবণমননিদিধ্যাসন, ধ্যান-ধারণাসমাধি—মূর্ত্তিপূজাতে তাহার স্থান কোথায় ? ফলতঃ যদি বা তাহার হৃদয় আরাধ্য দেবতার প্রতি ভক্তিরসে সিক্তও থাকে, তথাপি নির্ম্মল জ্ঞানের অভাবে সে ঐ তীর্থযাত্রীর মত সারা জীবন পথেই থাকিয়া যাইবে। "তরুণচন্দ্রকলাসদৃশশুভ্রকান্তি স্থিরযৌবনা, কমলাসনা,

বিদ্যাদায়িনী" দেবীমূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে অবশেষে বিদ্যার্থী ব্রহ্মবিদ্যায় উপনীত হইবে, ইহা কি সম্ভব ?

মহামনস্বী গ্লাডষ্টোন বিশ্বাস করিতেন, বাইবেলের সৃষ্টিপ্রকরণ অক্ষরে অক্ষরে সত্য। তৎসম্বন্ধে হাবার্ট স্পেন্সার বলিয়াছেন, কে কি বিশ্বাস করে, তাহা তাহার বিদ্যা ও মেধার উপরে নির্ভর করে না; তাহা নির্ভর করে মস্তিষ্কের সংগঠনের উপরে (on the conformation of the brain)। বোধ হয় কথাটা যেমন ব্যক্তি সম্বন্ধে তেমনি জাতি সম্বন্ধেও সত্য। সেমিটিক্ গোত্রের আরবজাতি মহম্মদের অলৌকিক শিক্ষার প্রভাবে এক পুরুষে সাকারোপাসনা ত্যাগ করিল। মূর্ত্তিপূজা ভারতীয় আর্য্যজাতির চিরন্তন ধর্ম্ম নয়; ইহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক; তথাপি উপনিষৎ-ব্রহ্মসূত্র ভগবদ্‌গীতার অতুলনীয় উপদেশ, ইসলামের দুর্দ্দমনীয় সংঘাত এবং ইহসর্ব্বস্ব পাশ্চাত্যসভ্যতার নব উন্মাদন কিছুতেই অপরাপূজাকে হঠাইতে পারে নাই। ঐ দুই জাতির মস্তিষ্কের সংগঠনে বিভেদ আছে কি ?

আর এক কথা। আমরা যখন বলি, ধর্ম্মের সকল পথই ঈশ্বরের পথ, তখন অজ্ঞাতসারে আমাদের মনে হয়তো এই একটা ভাব প্রচ্ছন্ন থাকে, যে সকল ধর্ম্মই সমান, অথবা ধর্ম্মে ধর্ম্মে গুরুত্ব, মর্য্যাদা ও মূল্যের তারতম্য নাই। এই ধারণা একটা মারাত্মক ভ্রম। তাত্ত্বিক বিচারে প্রধান প্রধান ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা অশ্রেষ্ঠতা নিরূপণ করা অতীব দুরূহ খৃষ্টীয় অবতারবাদ যে ভারতীয় অবতারবাদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে, রামমোহন রায় তাহা সপ্রমাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু গোঁড়া খৃষ্টান লেখকেরা এখনও বলিতেছেন, যে তাঁহাদের ঈশ্বরবাদ ঔপ-নিষদিক ব্রহ্মবাদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইস্‌লাম ও অন্যান্য ধর্ম্মের ঈশ্বরতত্ত্ব হইতেও শ্রেষ্ঠ। কিন্তু ধর্ম্মের অভ্রান্ত কষ্টিপাথর নীতি। যে ধর্ম্মের

আচারানুষ্ঠান মানুষের নীতিবোধকে বিদ্রোহী করে, সে ধর্ম্ম বিশুদ্ধ-নীতিমূলক ধর্ম্মের সহিত সমান আসন পাইবার যোগ্য নয়। মহাভারতে উক্ত হইয়াছে,—

ধর্ম্মং যো বাধতে ধর্ম্মো ন স ধর্ম্মঃ কুবর্ত্ম তৎ।

বন। ১৩১। ১১॥

"যে ধর্ম্ম ধর্ম্মে বাধা দেয়, তাহা ধর্ম্ম নহে, তাহা কুপথ।"

উপসংহার

ব্রহ্মোপাসনা—ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য

রাজা রামমোহন রায় কিশোর বয়সেই সাকারপূজার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইয়াছিলেন; পরে অনেক বৎসর ধরিয়া শাস্ত্রীয় প্রমাণের দ্বারা প্রতিপক্ষের সমস্ত আপত্তি খণ্ডন করিয়া ব্রহ্মোপাসনার শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করেন। তাহারই স্বাভাবিক ফল, ১৮২৮ সনের ৬ই ভাদ্র সামাজিক ব্রহ্মোপাসনার জন্য ব্রাহ্মসমাজপ্রতিষ্ঠা। ব্রাহ্মসমাজের কাজ ফুরায় নাই; বরং বলিতে হইবে, রামমোহন স্বয়ং যেটীকে তাঁহার বহুমুখী সাধনার শীর্ষদেশে স্থান দিয়াছিলেন, তাহা ভারতবর্ষে এতকাল পরেও উপেক্ষিত ও অনাদৃত রহিয়াছে। ব্রাহ্মগণ সচেতন না হইলে তরুণদলের পশ্চাদ্‌গতি কে রোধ করিবে? নিরাকারোপাসনা গৃহে গৃহে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথ যে সংগ্রাম করিয়াছিলেন, সে সংগ্রাম সার্থক হইয়াছে, এখন আর তাহার প্রয়োজন নাই, যাঁহারা এই প্রকার বলিয়া থাকেন, তাঁহারা ভাবিয়া দেখুন, দেশের অবস্থাটা কি? শত সহস্র শিক্ষিত ব্যক্তি সাকারোপাসনায় আস্থাহীন হইলেও ব্রহ্মোপাসনার প্রতি বিমুখ; অনেকে মূর্ত্তিপূজায়

শ্রদ্ধা না থাকিলেও কৌলিক আচারের খাতিরে, কিংবা সমাজ-বিপ্লবের আশঙ্কায় তাহার সহিত যোগ রক্ষা করিতেছেন। ব্রাহ্ম-সমাজের প্রথম কাজ, ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে ব্রহ্মোপাসনাকে সত্য, স্বাভাবি ও মিষ্ট ও মুক্তিপ্রদ বলিয়া প্রতিপন্ন করা, হাতে কলমে কাজ করিয়া একটা আধ্যাত্মিক Kindergarten বা সাধনোদ্যান গড়িয়া তোলা। এটা ভাবাত্মক কাজ। অভাবাত্মক দিকে, ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান ও ভবিষ্য পরিচালক যুবকদিগকে বলি, তোমরা কথায় ও কাজে সাকারবাদের প্রতিবাদ করিও, সবলে ব্রহ্মবাদের নিশান তুলিয়া ধরিও। তোমরা পড়িয়া থাকিবে, বালক দেবেন্দ্রনাথ রামমোহন রায়কে দুর্গোৎসবের নিমন্ত্রণ করিতে গিয়াছিলেন। যথারীতি নিমন্ত্রণের বাক্য উচ্চারণ করিতেই রামমোহন বলিলেন, "ব্রাদার, আমাকে কেন? রাধাপ্রসাদকে বল।" কত বৎসর পরে, জীবনের সন্ধিক্ষণে দেবেন্দ্রনাথ সেই কথার অর্থ ও ভাব বুঝিতে পারিলেন। "এই অবধি আমি মনে মনে সংকল্প করিলাম যে, রামমোহন রায় যেমন প্রতিমাপূজা ও পৌত্তলিকতায় যোগ দিতেন না, তেমনি আমিও আর তাহাতে যোগ দিব না।" শুনিয়াছি, স্বদেশী আন্দোলনের প্রারম্ভে এই মন্দিরের সম্মুখে পান্তির মাঠে, জগদ্ধাত্রী পূজার উৎসব হইয়াছিল। উৎসবের মুখ্য অভিপ্রায় ছিল রাজনৈতিক; উদ্যোক্তারা ভিতরে ভিতরে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগকে জানিতে দিয়াছিলেন, যে তাঁহারা সিংহবাহিনী জননী জন্মভূমির অর্চ্চনা করিবেন। রবীন্দ্রনাথ নাকি নিমন্ত্রণ পাইয়া বলিয়াছিলেন, "যেখানে প্রতিমাপূজা হইবে, সেখানে ঠাকুরবাড়ীর একটা বিড়ালও যাইবে না।" কথাটা খাঁটি ঐতিহাসিক সত্য হউক বা না হউক, সাকারোপাসনার প্রতি ব্রাহ্মদিগের মনোভাব এইরূপই হওয়া উচিত। নবীন ব্রাহ্ম-

দিগের প্রতিমাপূজার প্রতি ঐ প্রকার বিরাগ আছে কি? কোনও কলেজ হষ্টেলের ব্রাহ্ম অধ্যক্ষ আমাকে বলিয়াছিলেন, সেখানে সরস্বতী-পূজা করিবার প্রস্তাবে একটী ব্রাহ্ম ছাত্রই অত্যধিক উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছিল। ব্রাহ্মগণ যদি হিন্দু পূজাপার্ব্বণে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন, আমোদ প্রমোদে যোগদান, এমন কি দীপান্বিতা কালীপূজায় বাজি পুড়াইয়া অর্থের অপবায় করিতেও দ্বিধাবোধ না করেন, তবে বুঝিতে হইবে, ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধেই তাঁহাদের মত ও বিশ্বাস শিথিল হইতেছে।

সে-কালের ব্রাহ্মদিগকে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল সত্য-ধর্ম্মের জন্য প্রাচীন সমাজের সরল বিশ্বাস ও নিষ্ঠার সহিত, পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজনের চোখের জল ও বিচ্ছেদবেদনার সহিত—ধর্ম্মের জন্য তাঁহারা প্রসন্ন অন্তঃকরণে কত উৎপীড়ন অত্যাচার সহ্য করিয়াছেন। নব্য ব্রাহ্মদিগের সংগ্রাম রাজসিক ব্যাপারের আমোদপ্রমোদে মাতিয়া যাইবার প্রলোভনের সহিত, এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের স্বরূপ ভুলিয়া জনস্রোতে গা' ঢালিয়া আত্মবিলোপের মারাত্মক বিপদের সহিত।

Iconoclasm বা কালাপাহাড়ের প্রকৃতি নিশ্চয়ই নিন্দনীয়; কিন্তু ধর্ম্ম ও নীতির প্রতি উগ্র অনুরাগ, অধর্ম্ম ও দুর্নীতি দমনের সংগ্রামে যে গতিবেগ প্রদান করে, তাহার যথেষ্ট মূল্য আছে। ইংলণ্ডের পিওরিটানেরা যতই বাড়াবাড়ি করিয়া থাকুক না কেন, সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংরেজ জাতি যখন সৌন্দর্য্য-লালসায় ধর্ম্মে কুসংস্কার ও নীতিতে উন্মার্গগামিতার আবর্ত্তে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া রসাতলে যাইতেছিল, তখন ঐ গোঁড়ার দলই তাহাদিগকে দুর্গতি হইতে রক্ষা করে।

সাকারবাদ জাতীয় মিলনের অন্তরায়।

তরুণেরা কেহ কেহ বলেন, প্রাচীন সমাজের উৎসবানন্দে যোগ না দিলে দেশাত্মবোধ, স্বজাতিপ্রীতি, একপ্রাণতা জাগিবে কি করিয়া? এই প্রশ্নের উত্তরে দুইটী কথা বলিবার আছে। প্রথমতঃ, স্মরণ রাখিতে হইবে, হিন্দুমুসলমানের মিলনের বলিতে গেলে এক অনতিক্রমণীয় অন্তরায় হিন্দুর পৌত্তলিকতা, এবং মুসলমানের গোবধপ্রথা। যদি হিন্দুসমাজ প্রতিমাপূজা এবং মুসলমানসমাজ প্রকাশ্য গোবধ বর্জ্জন করেন, তবে বোধ করি উভয়ের ঐক্যবন্ধন অপেক্ষাকৃত সহজ-সাধ্য হইবে। আমরা জানি, ছাত্রাবাসে সরস্বতীপূজা প্রবর্ত্তনের পরে একটী সরকারী ও একটী সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজে কি সাম্প্রদায়িকতার হলাহল উত্থিত হইয়াছিল। কলেজের হাতার মধ্যে হিন্দুছাত্রেরা নিজেদের হষ্টেলে সরস্বতী পূজা করিল। মুসলমান ছাত্রেরাও অমনি অদূরে তাহাদের হষ্টেলে গোবধ করিতে উদ্যত হইল; করিল কি না, ঠিক মনে নাই। করুক বা না করুক, "এই তৃণখণ্ড দেখাইতেছে, হাওয়া কোন্ দিকে বহিতেছে।" যে দেশের দুইটী জাতি একে অন্যের পূজাকে দুষ্কৃতি বা অপরাধ জ্ঞান করে; আবার একের যাহা অবশ্যকর্ত্তব্য ধর্ম্মাকর্ম্ম অপরে তাহাতে মর্ম্মাহত হয়, সে দেশের অধিবাসীরা এক বিশ্বজনীন ধর্ম্ম ছাড়াও মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারে, রামমোহন রায়ের অনুবর্ত্তী হইয়াও যদি কেহ তাহা সম্ভবপর বলিয়া বিশ্বাস করেন, তবে তদপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় আর কি আছে? "ব্রাহ্মসমাজের কূপমণ্ডুকের মত নিজেদের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকবার দিন চলে গিয়েছে" নিশ্চয়ই; কিন্তু "সমস্তদেশের মধ্যে ধর্ম্ম থেকে রাষ্ট্রনীতি পর্য্যন্ত যে অসত্যের, অন্যায়ের ও দুর্নীতি ও অন্যান্য নানা

প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে, তার বিরুদ্ধে" ব্রাহ্মেরা যদি কিছু করিতে চান, তবে তাঁহাদিগকে সর্ব্বাগ্রে নিজের ধর্ম্মে—মতে ও আচরণে—সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। তাঁহারা যেন ভুলিয়া না যান, সত্য ও নীতির ক্ষেত্রে সন্ধি করিয়া চলিবার প্রবৃত্তি the spirit of compromise) বিষবৎ পরিত্যজ্য। ঈশ্বর এক না বহু; সাকার ও নিরাকার উপাসনার মধ্যে কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ; অবতারবাদ যৌক্তিক না অযৌক্তিক, নরপূজা বৈধ কি অবৈধ; ইহজীবনে ভোগই মানবের চরম লক্ষ্য, অথবা এই শ্রুতিই মান্য—ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বমানশুঃ—"দেবগণ ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ করিয়াছিলেন"—এই সকল প্রশ্নের মীমাংসায় সন্ধির অবসর নাই। সন্ধির প্রয়োজন আছে, রাষ্ট্রনীতিতে, সাম্প্রদায়িক ভাগ বাটোয়ারায়, লঙ্কাবিভাগে। তৎপরে, তাঁহারা যেন ইহাও স্মরণ রাখেন, যাহারা স্বধর্ম্মে আত্মপ্রতিষ্ঠ, তাহারা অক্লেশে ভিন্নধর্ম্মীর প্রতি প্রীতি এবং ঔদার্য্য রক্ষা করিয়া অপরের সহিত জন্মভূমির সেবায় খাটিতে পারে। কলহ জমিয়া উঠে সেইখানে, যেখানে দুইপক্ষের কাহারই নিজের ধর্ম্মে অকপট অনুরাগ নাই।

ধর্ম্মসমাজের সংগ্রাম

সংগ্রাম জীবনরক্ষার একটী চিরন্তন ও অলঙ্ঘ্য বিধান। জীব ও উদ্ভিদের ন্যায় প্রত্যেক ধর্ম্মসমাজকেই সংগ্রাম করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে হইয়াছে। বৈদিক ধর্ম্ম, ইহুদী ধর্ম্ম, ইস্লাম যেমন আধ্যাত্মিক সংগ্রাম করিয়াছে, তেমনি সত্য সত্য অসিযুদ্ধে জয়যুক্ত হইয়াও সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার অনুকূল আবেষ্টন রচনা করিয়া লইয়াছে। ঈশার অনুবর্ত্তীগণ যত দিন সংখ্যায় অল্প, রাষ্ট্রীয় অধিকারে বঞ্চিত, এবং ধনবলে দুর্ব্বল ছিল, ততদিন তাহারা প্রতিপক্ষের সহিত বাগ্‌যুদ্ধ করিয়াছে, বাহুযুদ্ধ

করে নাই। কিন্তু খৃষ্টধর্ম্ম রোমকসাম্রাজ্যে রাষ্ট্রীয় গৌরব লাভ করিবার পরে প্রবলপ্রতাপ ঈশাপন্থী ভূপতিগণ অনেকে অরূপক শোণিতপ্লাবী যুদ্ধ করিয়াই স্বধর্ম্মের বিস্তার সাধন করিয়াছেন। সম্রাট্ শার্লমেন সাক্সন জাতিকে বাহুবলে জয় করিয়া খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। একা বৌদ্ধধর্ম্ম তর্ক, বিচার ও উপদেশের সাহায্যে স্বদেশে ও বিদেশে প্রতিষ্ঠা ও প্রসার লাভ করিয়াছিল।

ব্রাহ্মসমাজের সংগ্রামও বৌদ্ধধর্ম্মের অনুরূপ। প্রথমাবধি ইহাকেও জ্ঞানমূলক বিচার-সংগ্রামের মধ্যে পুষ্ট ও জীবিত থাকিতে হইতেছে।

খৃষ্টধর্ম্মের ইতিহাসে যুদ্ধের অভিধান হইতে গৃহীত দুইটী বাক্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে,—'The church militant, and the church triumphant.'—'যুযুধান ধর্ম্মমণ্ডলী' ও 'বিজয়ী ধর্ম্মমণ্ডলী'। খৃষ্টধর্ম্ম কয়েক শতাব্দী স্বরূপ ও রূপক, দুই অর্থেই যুদ্ধে রত ছিল, তৎপরে উহা বিজয়ী হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের বয়স মোটে একাদশাধিক এক শতাব্দী। ইয়ুরোপে নামমাত্র খৃষ্টান হইতে এক সহস্র বৎসরের অধিক লাগিয়াছিল। ব্রাহ্মধর্ম্মের সংগ্রামের যুগ এখনও চলিতেছে; কবে ইহার যুযুধান যুগের অবসান ও বিজয়যাত্রার যুগ আরম্ভ হইবে, বিধাতাই জানেন।

রামমোহন রায় হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্র গভীর ভাবে পাঠপূর্ব্বক এমন সম্যক্ আয়ত্ত করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার মনীষা এমন প্রখর ও বিচারপটুতা এত অসামান্য ছিল, যে তৎকালে ধর্ম্মবিষয়ক তর্কযুদ্ধে তাঁহার সমকক্ষ ভারতবর্ষে কেহই ছিলেন না। একেশ্বরবাদের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনের বহুবর্ষব্যাপী সংগ্রামে বিজয়ী হইয়া ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিবার পাঁচ বৎসর পরেই তিনি

লোকান্তরিত হইলেন। তাঁহার তিরোধানের পরে দেবেন্দ্রনাথ কি প্রকার সংগ্রামের মধ্য দিয়া বিলুপ্তপ্রায় ব্রাহ্মসমাজকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার আত্মজীবনীতে বর্ণিত আছে। তৎপরে কেশবচন্দ্র ও তাঁহার সহযোগিগণ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের ব্রতে আত্মোৎসর্গ করিয়া স্বদেশে বিদেশে উহার সুসমাচার প্রচার করিয়াছেন, গভীর সাধনলব্ধ নব নব আধ্যাত্মিক তত্ত্ব দ্বারা ব্রাহ্মসমাজকে নূতন আকারে গড়িয়া তুলিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে। কেশবচন্দ্র স্বয়ং বিপক্ষগণের আক্রমণ হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মের গৌরব রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে তর্কযুদ্ধ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। কৃষ্ণনগরে পাদ্রি ডাইসনের সহিত তাঁহার যে বিচার হইয়াছিল, তাহা চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। অর্দ্ধশতাব্দীর অধিক হইল, হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান-দলের নেতা পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি প্রভৃতি যখন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সাহায্যে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের প্রভাব ম্লান করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছিলেন, তখন ব্রাহ্ম-সমাজের পক্ষে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, এই দুই মহারথী দণ্ডায়মান হইলেন। শাস্ত্রী মহাশয় এই মন্দিরে জাতিভেদের বিরুদ্ধে এমন সুযুক্তিপূর্ণ ওজস্বিনী বক্তৃতা করিয়াছিলেন, যে তাহা শুনিতে শুনিতে একজন তৎক্ষণাৎ উপবীত ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন। নগেন্দ্রনাথ দার্শনিক যুক্তির সাহায্যে অকাট্য প্রমাণ-প্রয়োগপূর্ব্বক, সাকারোপাসনা, অবতারবাদ প্রভৃতি খণ্ডন করিয়া যে-সকল বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহা 'ধর্ম্মজিজ্ঞাসা' নামক পুস্তকে স্থায়ী আকারে ব্রাহ্ম সাহিত্যের সম্পৎ বৃদ্ধি করিয়াছে। উপাধ্যায় গৌর-গোবিন্দ রায়ের সমন্বয়গীতা ও অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থ, এবং পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ কর্তৃক সম্পাদিত প্রস্থানত্রয়ের সহজবোধ্য সংস্করণ ও তদীয় অন্যান্য পুস্তক ব্রাহ্মধর্ম্মের স্বরূপ বুঝিবার পক্ষে প্রচুর সহায়তা করিতেছে।

ব্রাহ্মসমাজের নবীন সৈনিকদিগের হস্তে ঐ গ্রন্থগুলি প্রতিপক্ষের সহিত সংগ্রামে দিব্যাস্ত্রের কাজ করিবে।

নব অবতার পূজা

কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের সম্মুখে এখন এমন এক প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী দণ্ডায়মান, যাহা উনবিংশ শতাব্দীতে রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের সময়ে আবির্ভূত হয় নাই। কেশবচন্দ্র, শিবনাথ প্রভৃতি বহু ব্রাহ্ম যাঁহাকে ঘনিষ্ঠ ভাবে জানিতেন, যাঁহার সহিত তাঁহাদিগের সুগভীর প্রীতির যোগ ছিল, এবং যিনি এক এক দিন ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় উপস্থিত থাকিয়া ভাবাবেশে প্রমত্ত নৃত্য করিতে করিতে সংজ্ঞাহীন হইতেন, সেই ভক্তপ্রবর রামকৃষ্ণ অধুনা অবতাররূপে মঠে মঠে ভোগ-আরতি-সহকারে পূজা প্রাপ্ত হইতেছেন। রামকৃষ্ণ মিশনের জনবল বিপুল; দুঃস্থবিপন্নের সেবায় ব্রাহ্মসমাজ উহার ছায়ায় পড়িয়া গিয়াছে। তাহাতে ভয়ের কারণ নাই। কারণ, সত্যধর্ম্ম এক হইতে দুই, দুই হইতে তিন, এই ধারাতেই ধীরে ধীরে প্রসারিত হয়। সংখ্যাবহুলতার দ্বারা ধর্ম্মের প্রকৃত মূল্য নিরূপিত হয় না। বরং ধর্ম্মে যতদিন চিত্তাকর্ষক অশ্রেষ্ঠ উপাদান প্রবেশ না করে, তত দিন তাহা প্রাকৃত জনের অনুরাগ আকর্ষণ করিতে পারে না। সোনায় খাদ না মিশাইলে যেমন মোহর তৈয়ারী হয় না, ধর্ম্মের অবস্থাও প্রায় সেইরূপ। কিন্তু নরপূজারত প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত বিশুদ্ধ ব্রহ্মবাদের সৈনিক-রূপে যুদ্ধ করিতে হইবে ব্রাহ্মসমাজকেই। রামকৃষ্ণ মহাপ্রস্থানের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, যখন শুনিতে পাইলেন, কোন কোনও ভক্ত তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া বিশ্বাস করেন, তখন বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছিলেন, "হুঁ:, ভগবান্ গলায় ঘা হইয়া মরিতে চলিয়াছেন!" যে-দেশে মৎস্য কূর্ম্ম,

বরাহ অবতার, সে দেশে ভগবৎপ্রেমোন্মত্ত রামকৃষ্ণ যে ঈশ্বরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইবেন, তাহা বিচিত্র নয়। এবং যে-জাতির অস্থিতে মজ্জাতে সাকারবাদ ও অবতারবাদ অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে, যে জাতির মধ্যে নব অবতার যে শত সহস্র নরনারীর চিত্ত জয় করিবেন, তাহাও বিচিত্র নয়।

ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তব্য

ব্রাহ্মসমাজের প্রধান পুরুষগণ পূর্ব্বে পূর্ব্বে অতীতের অবতারবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছেন। এক্ষণে অবতারবাদ ব্রাহ্মগণের চক্ষুর সম্মুখে মূর্ত্ত, প্রত্যক্ষ, জাজ্জ্বল্যমান। ইহার অগ্রগতি রোধ করিবার জন্য সংগ্রাম ঘোষণা করিবার কর্ত্তব্য ব্রাহ্মসমাজের—অপর কোনও সম্প্রদায় এ কাজে অগ্রসর হইবে না। ব্রাহ্মসমাজের আশাস্থল, বর্ত্তমান এবং উদীয়মান পরিচালকবৃন্দ, এই অত্যাবশ্যক কার্য্যের জন্য বদ্ধপরিকর হইবেন কি? ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশুদ্ধতা অটুট রাখিতে হইলে. ইহার প্রসার যাহাতে সঙ্কুচিত ও অবরুদ্ধ না হয়, তাহার সমুচিত উপায় বিধান করিবার ইচ্ছা থাকিলে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাঠগোষ্ঠীতে বিভিন্ন বিভাগে জ্ঞানসাধনার দ্বারা তাঁহাদিগকে এই সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। বিংশ শতাব্দীতে জ্ঞানবিজ্ঞানের সে অসাধারণ উন্নতি হইয়াছে, তাহার সহিত পরিচয় আবশ্যক; মহাপ্রতিভাশালী হইলেও একা কোন মানুষের পক্ষেই তাহা সাধ্যায়ত্ত নহে। এজন্য চাই সহযোগিতা। বৈজ্ঞানিক যুক্তিকে বৈজ্ঞানিক যুক্তির দ্বারা, দার্শনিক বিচারকে দার্শনিক বিচার দ্বারা, অন্ধসংস্কারকে নির্ম্মল জ্ঞানালোকের দ্বারা, প্রতিরোধ করিতে হইবে। আমাদের নানা বিভাগে কৃতবিদ্য, যশস্বী লোকের অভাব নাই; তাঁহারা সংঘবদ্ধ হইলে শক্তিতে দুর্জ্জয় হইয়া উঠিবেন। ব্রাহ্মসমাজ আজন্ম ধর্ম্মের মহান্ আদর্শ জনমণ্ডলীর নয়নসমক্ষে তুলিয়া ধরিয়াছে; চির দিনই ধরিবে, নতুবা ইহার বাঁচিয়া থাকিবার সার্থকতাই লুপ্ত হইবে। কনিষ্ঠ কর্ম্মীদিগকে বলি, তোমরা রাজনৈতিক ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া ব্রাহ্মসমাজের বৈশিষ্ট্য ভুলিও না; অভীষ্ট জনসেবার আহ্বানে আত্মসমর্পণ করিয়াও মুহূর্ত্ত তরে ব্রাহ্মধর্ম্মের স্বরূপকে ম্লান হইতে দিও না। কোন্‌টী অপরিহার্য্য, কোন্‌টী উপেক্ষণীয় (essential and non-essential), আমাদিগকে নিয়ত তাহা স্মরণ রাখিতে হইবে; আরও স্মরণ রাখিতে হইবে, ব্রাহ্মসমাজ জন্মতঃ ব্রহ্মোপাসনার সমাজ। উপাসনা যে-স্থানে, যে-প্রণালীতে, যে-ভাষায়, যে রূপেই সম্পন্ন হউক না কেন, ব্রাহ্মসমাজের জীবনীশক্তি ঐখানে। স্থান, ভাষা ও পদ্ধতির উপরে উঠিয়া যদি কেহ ব্রহ্মযোগ সম্ভোগ করিতে পারেন, তবে তিনি তো অধ্যাত্ম জীবনে উন্নত স্তরে আরোহণ করিয়াছেন। সমাজদেহে যদি আধ্যাত্মিক রক্তপ্রবাহের প্রণালী দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তবে, জড়দেহ যেমন দুষ্ট রক্তহীনতা রোগে (pernicious anaimia) ক্ষয়গ্রস্ত হইতে হইতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, উহাও তেমনি কালে অন্তর্হিত হইবে।

ব্রহ্মোপাসনা প্রতিষ্ঠার সাংবৎসরিক উৎসবে আমরা যেন হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ করিয়া পুনঃ পুনঃ মনন করি, মহামনাঃ রামমোহন রায় কি গভীর জ্ঞান-সাধনা, কি কঠোর তপস্যা, কি একাগ্র অবিরাম শ্রমস্বীকার করিয়া, দেশ দেশান্তর ঘুরিয়া, কত নিন্দাগ্লানি লাঞ্ছনা সহিয়া, জীবনের মায়া ছাড়িয়া, বহুবৎসর অনন্যচিত্তে সত্যানুসন্ধানে নিমগ্ন থাকিয়া, তবে ব্রহ্মোপাসনা সর্ব্বসাধারণের জন্য প্রবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার মত স্থিতধী, বীর্য্যবান্, জ্ঞানব্রত, স্বদেশভক্ত,

বিশ্বপ্রেমিক, পরার্থপরায়ণ, ব্রহ্মার্পিতচিত্ত ক্ষণজন্মা পুরুষ আধুনিক ভারতে কয় জন আবির্ভূত হইয়াছে? পরম্পরাক্রমে তদীয় অনুবর্ত্তী কত ব্যাকুল ত্যাগী সাধুসদাত্মা, তচ্চিত্ত, তদ্গতপ্রাণ, তদেকশরণ হইয়া বিন্দু বিন্দু শোণিত দান করিয়া ব্রাহ্মসমাজের সেবাযজ্ঞে নিঃশেষে আপনাদিগকে আহুতি দিয়া গিয়াছেন। এই সকল পুণ্যশ্লোক পূর্ব্ব পিতৃগণের মহৎ দৃষ্টান্ত ভাস্কর আলোকস্তম্ভরূপে তাঁহাদের বংশধরগণকে অনুপ্রাণিত করুক, কল্যাণকর্ম্মে দিক্ প্রদর্শন করুক, ব্রাহ্মধর্ম্মের মুক্তিপ্রদবার্ত্তা প্রচারের সুদুষ্কর প্রচেষ্টাকে বাক্য ও ব্যবহারের মনোজ্ঞ সংবাদিতা দ্বারা সাফল্যে মণ্ডিত করিয়া তুলুক।

প্রাস্মৎ পাশান্ মুঞ্চ সর্ব্বান্ য উত্তমা অধমা যে।

অথর্ব্বসংহিতা।

"হে দেব, আমাদের সর্ব্ববিধ অজ্ঞানের পাশ তুমি মোচন কর, সে পাশ উত্তমই হউক আর অধমই হউক।"

সভ্যতার পরশপাথর

সভ্যতার পরশপাথর

সভ্যতার প্রাচীন আলেখ্য

মরণজয়ী গ্রীক কবি সফক্লীসের "আন্টিগনী" বা "বীরকুমারী" নাটকে একটী "নরাশংস" কবিতায় মানবের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে—

"জগতে অনেক আশ্চর্য্য পদার্থ আছে, কিন্তু মানব অপেক্ষা আশ্চর্য্যতর কিছুই নাই। ম্যনুষ স্বীয় শক্তিতে দক্ষিণ বায়ুর সাহায্যে ধবল সাগরের পরপারে উত্তীর্ণ হইতেছে। যে তরঙ্গমালা তাহাকে প্রতিক্ষণ গ্রাস করিতে চাহিতেছে, তাহার নিম্নে সে পথ করিয়া চলিয়া যাইতেছে। দেবকূলে প্রাচীনতম, অমর, অক্লান্ত পৃথিবীকে, অশ্বশাবক দ্বারা কর্ষণ করিয়া সে খিন্ন করিতেছে; তাহার হল, বৎসরের পর বৎসর, একবার এ-দিকে এবং আবার ও-দিকে সঞ্চালিত হইতেছে।

"নর তীক্ষ্ণবুদ্ধি; সে চঞ্চলচিত্ত বিহঙ্গম, দুর্দ্দান্ত বন্য পশু, এবং সাগর-বিহারী প্রাণিবর্গকে স্বহস্তবয়িত জালের পাশে আবদ্ধ করিতেছে। যে-পশু বনে বাস করে, যে-পশু পর্ব্বতে বিচরণ করে, তাহাকে সে সুকৌশলে জয় করিতেছে। সে কেশরীর অশ্বকে বশীভূত করিয়া তাহার স্কন্ধে যুগভার স্থাপন করিয়াছে; সে শৈলবিহারী শ্রান্তিহীন বৃষকে আপনার বশে আনিয়াছে।

"আর, মানুষ আপনি আপনাকে ভাষা, বায়ুতুল্য দ্রুতগামী মনন, এবং রাষ্ট্রপরিচালিনী মনোবৃত্তি শিক্ষা দিয়াছে। যখন উন্মুক্ত আকাশতলে বাস করা কঠিন, তখন কিরূপে তুষারসায়ক, ঘন বর্ষার তীক্ষ্ণধারা হইতে

আত্মরক্ষা করিতে হয়, তাহাও সে আবিষ্কার করিয়াছে; এমত কিছুই নাই, যে-স্থলে মানুষ নিরুপায়। ভবিষ্যতে যাহা ঘটিবে, সে পূর্ব্ব হইতেই তাহার জন্য উপায় বিধান করিয়া রাখিয়াছে। সে শুধু মৃত্যুকে পরিহার করিবার সহায় পায় নাই; কিন্তু দুঃসাধ্য ব্যাধির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার পথ পাইয়াছে।

"মানুষের উদ্ভাবিনী বুদ্ধির কৌশল চিন্তার অতীত। উহা তাহাকে কখনও সুখ দিতেছে, কখনও দুঃখে নিপতিত করিতেছে। যে-ন্যায়ধর্ম্মকে রক্ষা করিবে বলিয়া সে দেবগণের নামে শপথ করিয়াছে, মানুষ যখন সেই ন্যায়ধর্ম্মকে ও স্বদেশের বিধিসমূহকে মান্য করিয়া চলে, তখন তাহার পুরী মহোচ্চ গৌরবে প্রতিষ্ঠিত থাকে; আর যে-ব্যক্তি দুঃসাহসভরে পাপে লিপ্ত হয়, সে পুরীহীন, তাহার কোনও দেশ নাই। এই প্রকার দুষ্কৃতিকারী যেন কদাপি আমার গৃহে স্থান না পায়, এবং আমার ভাবনার ভাবুক না হয়।" (Antigone, 331-73.)

এই সঙ্গীতে মানুষের কীর্ত্তিকলাপ অঙ্কিত হইয়াছে; তাহাতে যে-বস্তুটীর চিত্র পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে, তাহারই নাম সভ্যতা, civilization বা culture. কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, পশুপালন, জীবন-রক্ষার উপযোগী যাবতীয় সামগ্রীর আবিষ্কার ও উৎপাদন, রাষ্ট্র এবং ধর্ম্ম—এই সমস্তের মধ্য দিয়া মানবজাতির সভ্যতা অভিব্যক্ত হইতেছে। অধিকন্তু সামাজিক আচারব্যবহার, শাসনপ্রণালী, সাহিত্য, ললিতকলা প্রভৃতিও ইহার অঙ্গ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া পরিবর্ত্তনপরম্পরার পরীক্ষার ফলে মানবের দেহ নগণ্য সামুদ্রিক জীব হইতে যাত্রা করিয়া বর্ত্তমান আকারে উপনীত হইয়াছে; সে তিন লক্ষ বৎসর পূর্ব্বের কথা। কিন্তু ইতর প্রাণী হইতে উচ্চতর সোপানে উঠিতে, সমাজবদ্ধ হইয়া সভ্যতার পত্তন করিতে, প্রায়

তিন লক্ষ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। উহার ইতিহাস অত্যন্ত আধুনিক, বয়ঃক্রম অযুত বৎসরের নিম্নে। কিন্তু এই কাল-গণনা অপেক্ষাকৃত পরিণত সভ্যতাগুলি সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। মানুষ যখন প্রথম নিত্যনৈমিত্তিক কাজের জন্য তীক্ষ্ণধার খণ্ড খণ্ড প্রস্তর ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল, সেই প্রাচীন প্রস্তরযুগ হইতে সভ্যতার উন্মেষ ধরিলে উহার বয়েস কয়েক অযুত বৎসর বাড়িয়া যাইবে।

সভ্যতার স্তর বা ছাঁচ

সমাজতত্ত্ববিৎ আনুউইনের (J. D. Unwin) মতে সভ্যতা (culture) চারিটা ছাঁচে বা আদর্শে গঠিত—

১। জীববাদী (zoistic)

২। প্রেতবাদী (manistic)

৩। দেববাদী (deistic)

৪। জ্ঞানবাদী (rationalistic)

(১) জীববাদী সমাজ বিশ্বাস করে, জীবনের অবসান হইলেই মানুষের অবসান হয়; সুতরাং ইহাতে উপরত পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ তর্পণের ব্যবস্থা নাই, দেবমন্দির এবং পুরোহিতও নাই।

(২) দ্বিতীয় প্রেতবাদী স্তরের লোকেরা মৃত পিতৃগণের প্রতি কোন না কোনও রূপে শ্রদ্ধা অর্পণ করে; সুতরাং ইহাদিগের পূজার আয়তন ও মন্ত্রবিৎ বা magician আছে।

(৩) যে সমাজের লোকেরা বিশ্বের শক্তিপুঞ্জ, অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় সত্তার সহিত অনুকূল সম্বন্ধ রক্ষার উদ্দেশ্যে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহাদিগের পূজার্চ্চনা করে, তাহার পারিভাষিক নাম "দেববাদী"; পুরোহিত, পূজাপদ্ধতি প্রভৃতি ইহার বিশেষ লক্ষণ।

বৃক্ষ-প্রস্তরের উপাসক হইতে একেশ্বরবিশ্বাসী সমাজ পর্য্যন্ত সমস্তই এই পর্য্যায়ভূক্ত।

(৪) জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যুগে যুগে তৃতীয় শ্রেণীর সমাজ হইতে, কিংবা তৃতীয় শ্রেণীর সমাজের মধ্যে, চতুর্থ, জ্ঞানবাদী সমাজের উদ্ভব হইয়া থাকে। উদ্ভবের মূলে ক্রিয়া করে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের তপস্যা, অনুরাগ, উদ্যম, ও আত্মসমর্পণ। সমাজ, রাজনীতি ও ধর্ম্ম—সর্ব্বত্র বিপ্লবের ঐ একই উৎস, সাফল্যের বীজ নিহিত থাকে লোকচক্ষুর অন্তরালে অল্পজনের একাগ্র গোপন সাধনে।

সভ্যজগতের কোন সমাজই পূর্ণমাত্রায় জ্ঞানবাদী নহে। প্রত্যেকটাতেই প্রেতবাদী, দেববাদী ও জ্ঞানবাদী নরনারী বিদ্যমান। ধরাতলে এখনও জীববাদী সমাজ যথেষ্ট আছে।

বিবাহবিধি

চারিটী সামাজিক আদর্শের ধর্ম্মগত প্রভেদ ইঙ্গিতে ব্যক্ত হইল। এখন সমাজবন্ধনের মূলসূত্র সম্পর্কে উহাদিগের মধ্যে কি পার্থক্য আছে, তাহা প্রদর্শন করিব। সমাজের অভিব্যক্তিতে সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য করিবার বিষয় বিবাহের অভিব্যক্তি। দলবদ্ধ ইতর প্রাণী হইতে সমাজবদ্ধ মানবের বৈশিষ্ট্য এইখানে। বিবাহবিধি সম্বন্ধে সমাজে সমাজে প্রভেদ গুরুতর।

জীববাদী সমাজে বিবাহের পূর্ব্বে নরনারীর অবাধ মিলনে কোনও বাধা নাই। প্রেতবাদী সমাজ সে ক্ষেত্রে সময়বিশেষে ও অবস্থাবিশেষে সংযমের বিধি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

দেববাদী সমাজে এই বিধি প্রচলিত আছে, যে যাবৎ উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন না হয়, তাবৎ বরকন্যা শুদ্ধাচারী ও শুদ্ধাচারিণী থাকিবে।

চতুর্থ, উচ্চতর সোপানে, দেববাদী ও জ্ঞানবাদী, উভয় শ্রেণীর মিশ্রিত সমাজে সর্ব্বজনমান্য অনুশাসন এই যে বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পুরুষ ও নারী ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবে, এবং বিবাহ অবধি আমৃত্যু স্বামী স্ত্রী পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকিবে।

কিন্তু এই বিধানের দ্বারা পুরুষ ও রমণীর বহুবিবাহ নিবারিত হয় নাই। বিভিন্ন সভ্য সমাজে প্রায় দুই সহস্রবৎসর পূর্ব্বে একপতিত্ব-একপত্নীত্ব প্রথা অর্থাৎ monogamy প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল; সঙ্গে সঙ্গে এক পুরুষের বহু নারীর পাণিপীড়ন, এবং এক নারীর একাধিক পতি-বরণের রীতিও চলিতেছিল, এবং এখনও চলিতেছে। হিন্দুও ও মুসলমান সমাজে পুরুষের বহু বিবাহ আবহমানকালে প্রতিষ্ঠিত আছে, রমণীর একাধিক পতিগ্রহণ কোন কোন জাতির চিরন্তন কুলাচার।

সুদূর অতীত হইতে আরম্ভ করিয়া মানব কত অন্ধতমঃ পার হইয়া কত পরীক্ষার পরে, গোষ্ঠীগত বিবাহ (group-marriage), অবাধ মিলন (promiscuity) বহুপতিত্ব (polyandry), বহুপত্নীত্ব (polygamy), নারীহরণ, নারীক্রয় প্রভৃতি প্রথার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া পরিশেষে বিবাহের নির্ম্মল আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে।

মহাভারতের সাক্ষ্য

এ সমুদায়ের নিদর্শনই মহাভারতে অবিনশ্বর হইয়া রহিয়াছে। রাজা পাণ্ডু অনপত্যতাকুল আপদ হইতে উদ্ধার পাইবার আকাঙ্ক্ষায় কুন্তীকে তৎসদৃশ বা তদপেক্ষাও উৎকৃষ্ট কোনও ব্যক্তি দ্বারা যশস্বী সন্তান উৎপাদন করিতে অনুরোধ করিলেন; বলিলেন, শাস্ত্রে দ্বাদশ প্রকার পুত্রের উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে 'ঔরসের' পরেই 'প্রণীত' স্থান পাইয়াছে। 'অন্যের দ্বারা আপনার ক্ষেত্রে উৎপাদিত পুত্রের নাম 'প্রণীত'। চতুর্থ

'পৌনর্ভব', অর্থাৎ আপনার পরলোকপ্রাপ্তির পর বিধবা ভার্য্যার গর্ভে অন্য কর্তৃক উৎপাদিত। পঞ্চম 'কানীন', পত্নীর কুমারীকালে জাত। পাণ্ডু বীরপত্নী শরদণ্ডিণীর পুত্রোৎপাদনের কাহিনী বিবৃত করিয়া কুন্তীকে প্ররোচিত করিতে প্রয়াস পাইলেন; যখন পত্নী কিছুতেই প্রবোধ মানিলেন না, তখন পাণ্ডু উদ্দালক ঋষি ও মহাতপস্বী শ্বেতকেতুর আখ্যায়িকার মুখবন্ধে স্পষ্ট কথায় ব্যক্ত করিলেন—

অনাবৃতাঃ কিল পুরা স্ত্রিয়ঃ আসন্ বরাননে।
কামচারবিহারিণ্যঃ স্বতন্ত্রাশ্চারুহাসিনি॥
তাসাং ব্যুচ্চরমানানাং কৌমারাৎ সুভগে পতীন্।
নাধর্ম্মোঽভূদ্বরারোহে স হি ধর্ম্মো পুরাভবৎ॥

আদি।১২২।৫॥

"পুরাকালে রমণীরা সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টিগোচর ছিল; তাহারা সম্ভোগ লালসায় স্বেচ্ছায় বিচরণ করিত, স্বামীর শাসন মানিত না। কুমারীরাও কৌমার্য্য রক্ষা করিত না, ইহাতে অধর্ম্ম হইত না, পুরাকালে ইহাই ধর্ম্ম ছিল।" "সে কালে তাহাদিগের আচরণ গবাদির মত ছিল। উত্তর কুরুতে এখনও এই প্রকার আছে।"

আপনারা কুরুপাণ্ডবের বংশলতিকা প্রণিধান করুন। কুরুরাজ শান্তনু দাশরাজের অর্থাৎ জেলের কন্যা সত্যবতীকে দেখিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য অধীর হইলেন। পিতার দুঃখ দেখিয়া প্রথমা পত্নী গঙ্গার গর্ভজাত দেবব্রত পিতার জন্য দাশরাজসমীপে সত্যবতীকে প্রার্থনা করিলেন। দেবব্রত জ্যেষ্ঠ পুত্র, তিনি দারপরিগ্রহ করিলে তাঁহার পুত্রই কৌরবরাজ্যের উত্তরাধিকারী হইবে, এজন্য দাশরাজ কন্যা সম্প্রদান করিতে অস্বীকৃত হইলেন। তখন দেবব্রত প্রতিজ্ঞা করিলেন, তিনি আমরণ ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবেন। এজন্য দেবগণ তাঁহাকে 'ভীষ্ম' নাম দিলেন। ভীষ্ম সত্যবতীকে আনয়ন করিয়া পিতাকে সমর্পণ করিলেন। শান্তনু-সত্যবতীর পুত্র বিচিত্রবীর্য্য কাশীরাজ-দুহিতা অম্বিকা ও অম্বালিকাকে বিবাহ করিয়া কালে অপুত্রক গতাসু হইলেন। বংশ-রক্ষার জন্য সত্যবতী ভীষ্মের সহিত পরামর্শ করিয়া মহর্ষি ব্যাসকে আহ্বান করিলেন। ব্যাস সত্যবতীর কানীন পুত্র, পরাশর মুনির ঔরসজাত। মাতার আদেশে ব্যাস অম্বিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্রকে এবং অম্বালিকার গর্ভে পাণ্ডুকে জন্ম দান করিলেন।

যে যুগের জাতিভেদ কিরূপ ছিল? ব্রাহ্মণ ও জেলের শোণিত-সংস্রবে যাঁহার জন্ম, তিনি হইলেন নবকুরুপাণ্ডবের জন্মদাতা। সত্যবতীর এক পুত্র ব্রাহ্মণ, দ্বিতীয় পুত্র ক্ষত্রিয়।

তৎপরে আরও একটা বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। দেবরের বিধবা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূকে বিবাহ করিবার প্রথা (Levirate) ভারতে ও অন্য অনেক দেশেই ছিল। রামায়ণে আছে, বালীর পত্নী তারা সুগ্রীবের ও রাবণ-মহিষী মন্দোদরী বিভীষণের ঘরণী হইয়াছিলেন। রাবণ কর্তৃক হৃতা হইবার পূর্ব্বক্ষণে সীতা লক্ষ্মণের প্রতি যে পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহাতেও ইহার ইঙ্গিত আছে—

সুদুষ্টস্ত্বং বনে রামং একমেকোঽনুগচ্ছসি।
মম হেতোঃ প্রতিচ্ছন্নঃ প্রযুক্তো ভরতেন বা॥

অরণ্য।৪৫ ২৪

"অতি দুষ্ট তুমি আমার জন্যই, কিংবা ভরতের প্ররোচনায়, ছদ্মবেশে বনে একা একাকী রামের অনুসরণ করিতেছ।"

মনুসংহিতাতেও দেবর বিবাহের বিধি আছে। (৯।৬৯॥) কিন্তু ব্যাস ছিলেন সত্যবতীর প্রথম পুত্র, বিচিত্রবীর্য্যের জ্যেষ্ঠ সহোদর।

মহাভারতের যুগে যে, সমাজের ছাঁচ কুম্ভকারের মাটীর মত কোমল

এবং নমনীয় ছিল, পরবর্ত্তী কালের মত জমিয়া প্রস্তরীভূত হয় নাই. তাহার আরও প্রমাণ আছে। কতিপয় প্রমাণ কুরুবংশের দুই প্রধানা মহিষী, সত্যবতী ও কুন্তীর কানীন পুত্র; দৌপদীর পঞ্চপতি এবং ব্রাহ্মণ দ্রোণের কুরুক্ষেত্রে সৈনাপত্য।

ভারতীয় কাব্যসাহিত্যে দ্রৌপদীর পঞ্চপতিত্ব এমনই একটা অদ্ভুত ব্যাপার, যে ইহার সমর্থনের জন্য কবিকে বিলক্ষণ বেগ পাইতে হইয়াছে। নারীর একাধিক পতিগ্রহণের প্রথা ভূমণ্ডলে বিরল নয়, এই ভারতেই কোন কোনও প্রদেশে এখনও বর্ত্তমান আছে। কিন্তু বোধ হয় মহাভারতকার অনুভব করিলেন, দৌপদী-বিবাহের সপক্ষে দুই একটা শাস্ত্রীয় যুক্তি চিরজীবিনী করিয়া রাখা ভাল।

এই অঘটন ঘটনার মূলে সুতরাং প্রথমে কুন্তীর একটা মস্ত ভুল বা দৈব কারণ প্রদর্শিত হইল। দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে অর্জ্জুন লক্ষ্য ভেদ করিয়া তাঁহার পাণিগ্রহণ করিবার অধিকারী হইলেন; কিন্তু ভগ্নমনোরথ প্রতিদ্বন্দ্বী নৃপতিগণের সহিত ভীমার্জ্জুনের তুমুল যুদ্ধ লাগিয়া গেল। তার পর জয়শ্রীমণ্ডিত ভ্রাতৃদ্বয় "কৃষ্ণাকে লইয়া হৃদচিত্তে কুম্ভকার-গৃহে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, 'জননী, আমরা ভিক্ষা আহরণ করিয়াছি।' কুন্তী গৃহের মধ্যে ছিলেন, সুতরাং না দেখিয়াই কহিলেন, 'ভূঙ্‌ক্তেতি সমেত্য সর্ব্বে।' (আদি। ১৯১।২ ॥) 'সকলে একত্র হইয়া ভোজন কর (অথবা ভোগ কর)।" তার পর কুন্তী গৃহের বাহিরে আসিয়া দ্রৌপদীকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। কিন্তু উপায়ান্তর নাই, তাঁহার বাক্য মিথ্যা হইবার নয়। কিঞ্চিৎ আলোচনান্তে স্থির হইল, পঞ্চভ্রাতাই দ্রৌপদীকে যুগপৎ বিবাহ করিবেন। কিন্তু তাঁহার পিতা দ্রুপদ ও ভ্রাতা ধৃষ্টদ্যুম্ন এই অশ্রুতপূর্ব্ব প্রস্তাবের প্রতিবাদী হইলেন। তখন মহাকাব্যের "অশরণের শরণ" (deus ex machina) ব্যাস তথায় আবির্ভূত

হইয়া উভয়কে এক পঞ্চপতিসমৃদ্ধা কন্যার দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দিলেন, "ধর্ম্মশ্চৈব সনাতনঃ।" (১৯৬।১৯॥) "নারীর একাধিক পতিবরণ সনাতন ধর্ম্ম" যুধিষ্ঠির একটু পূর্ব্বেই ইহার সপক্ষে বলিয়াছিলেন, "পুরাণে শুনিতে পাই, গৌতমনন্দিনী জটিলা সপ্ত ঋষিকে বিবাহ করিয়াছিলেন।" কন্যাপক্ষের আপত্তি খণ্ডিত হইল, মহাসমারোহে দ্রৌপদীর পঞ্চপাণ্ডবের সহিত বিবাহ হইয়া গেল।

এক মহাভারতেই আমরা বহুপতিত্বের তিনটা দৃষ্টান্ত পাইলাম।

পঞ্চপাণ্ডবের জন্ম সম্বন্ধেও একটু রহস্য আছে।

সভ্যতার উষাকালে সর্ব্বত্রই সন্তানের পিতা অজ্ঞাত বা দুষ্পরিজ্ঞাত থাকিত; যাহা-সম্বন্ধে নৈসর্গিক কারণেই ভ্রমের অবসর ছিল না। এ জন্য পরিবারের অভিব্যক্তিতে প্রথম সোপানে মাতা ছিলেন উহার মধ্য বিন্দু। পরবর্ত্তী যুগে বিবাহবিধি সুনির্দ্দিষ্ট ও দৃঢ়মূল হইবার ফলে পরিবারে পিতার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মহাভারতে সদাব্যবহৃত 'পার্থ', 'কৌন্তেয়', 'রাধেয়'; 'গাঙ্গেয়' প্রভৃতি মাতার নামে পুত্রের পরিচয় দিবার রীতি মাতৃকেন্দ্রিক পরিবারের স্মৃতি বহন করিতেছে। মহাভারত হইতে প্রাচীনতর ছান্দোগ্য উপনিষদে সত্যকামজাবালের আখ্যান অজ্ঞাত পিতৃত্বের দুর্ভাগ্যকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে।

ইহার পরে বহুবিবাহের প্রথা এক কথাতেই শেষ হইতে পারে। কুরুরাজবংশের সনাতন প্রথা পাণ্ডু এবং তৎপুত্র ভীমার্জ্জুন অক্ষুন্ন রাখিয়াছিলেন। অন্য রাজাদের তো কথাই নাই।

বিবাহের জন্য নারীহরণের দৃষ্টান্তও মহাভারতে যথেষ্ট আছে। ভীষ্ম স্বয়ং কাশীরাজ-দুহিতাদিগকে কনিষ্ঠ ভ্রাতার জন্য হরণ করিয়াছিলেন। জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে হরণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। অর্জ্জুনের

সুভদ্রা-হরণ এদেশে আবালবৃদ্ধবনিতার নিকটে সুপরিচিত। সুভদ্রা কৃষ্ণের ভগিনী, অর্জ্জুনের মাতুলকন্যা; অর্জ্জুন কৃষ্ণের পরামর্শ ও সাহায্যে সুভদ্রাকে হরণ ও বিবাহ করিয়াছিলেন। ঘটনাটী আদিম সমাজের রীতির উপরে আলোকপাত করিতেছে। পরিশেষে আর একটী বিষয়ের প্রতি আপনাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ব্যাস ও কর্ণ, উভয়েই কানীন পুত্র। ব্যাস অধিকন্তু আর্য্য-অনার্য্যের শোণিতমিশ্রণ-জাত বর্ণসঙ্কর। অথচ মহাভারতকার ইহাকে জ্ঞানে ধর্ম্মে পুরুষোত্তম মহর্ষিরূপে স্বীয় কাব্যের আভ্যন্তমধ্যে স্থাপন করিয়াছেন।

কর্ণ জন্মমাত্র মাতার দ্বারা নদী-গর্ভে নিঃক্ষিপ্ত এবং পরে সূতগৃহে লালিত পালিত হইয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তিনি দুর্য্যোধনের সহিত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইলেন, এবং ক্রমশঃ চতুর্দ্দিকে তাঁহার শৌর্য্যের খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িল। মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে তাঁহাকে পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিবার জন্য প্রলুব্ধ করিবার মানসে কৃষ্ণ প্রস্তাব করিলেন, হৃত রাজ্যের পুনরুদ্ধার হইলে যুধিষ্ঠিরের জ্যেষ্ঠ সহোদররূপে তিনিই সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। কর্ণ সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন; দুর্য্যোধনকৃত উপকার বিবৃত করিয়া বলিলেন

বধাদ্‌বন্ধাদ্‌ভয়াদ্‌বাপি লোভাদ্বাপি জনার্দ্দন।
অনৃতং নোৎসহে কর্ত্তুং ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য ধীমতঃ॥
উদ্যোগ।১৪১।১৭॥

"বধ, বন্ধন, অন্যবিধ ভয় কিংবা লোভের বশবর্ত্তী হইয়া আমি দুর্য্যোধনের প্রতি কখনই মিথ্যা আচরণ করিতে পারিব না।" তৎপরে কুন্তী স্বয়ং কর্ণকে পুত্ররূপে স্বীকার করিয়া ভ্রাতৃগণের পক্ষ অবলম্বন করিতে নির্ব্বন্ধ করিলেন; মাতার নির্ব্বন্ধের সহিত পিতা ভাস্করের অনুরোধ মিলিত হইল; কিন্তু

এবমুক্তস্য মাত্রা চ স্বয়ং পিত্রা চ ভানুনা।
চচাল নৈব কর্ণস্য মতিঃ সত্যধৃতেস্তদা॥ ১৪৬।৩॥

"স্বয়ং পিতা ভানু এবং মাতা এইরূপ বলিলেও সত্যব্রত কর্ণের মন অনুমাত্র বিচলিত হইল না।" জননীকে তিনি যে উত্তর দিলেন, তাহাতে সূক্ষ্মমনস্তত্ত্ববিশ্লেষণ এবং নিপুণ শব্দচিত্রাঙ্কন, কবির এই দুই গুণের সমাবেশে কর্ণের রূপ দেদীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে।

মহাভারতে আমরা যে সভ্যতার পরিচয় পাই, তাহা প্রায় সার্দ্ধ দুই সহস্র বৎসরের প্রাচীন। সে যুগ ছিল ভারতের "বীরযুগ" (the heroic age of India)। নবযৌবনপ্রাপ্ত ভারতসমাজ তখন ছিল চলমান, পরবর্ত্তীকালের মত সংহিতার নাগপাশে পড়িয়া আড়ষ্ট হয় নাই। সেই জন্যই মহাভারতকার ব্যাসকে জ্ঞানধর্ম্মে আদর্শ কুলগুরু, এবং কর্ণকে বীরবিক্রমবিশ্বস্ততায় মহীয়ান্ সেনাপতিরূপে প্রাচ্যসাহিত্যে চিরঞ্জীব করিয়া রাখিতে পারিয়াছেন।

তরঙ্গিণীকে পশ্চাতে ঠেলিয়া উৎসের মুখে বাঁধিয়া রাখা যেমন অসম্ভব, বর্ত্তমান ভারতসমাজকে সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগের আদর্শে পুনর্গঠন করিবার প্রয়াসও তেমনি নিরর্থক। কিন্তু জাতীয় কল্যাণের জন্য বর্ণভেদের প্রাচীর ভাঙ্গিবার সময় শুধু আগত নয়, উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছে। কুরু-পাণ্ডব যুগের পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত উপযোগিতা রক্ষা করিবার যে সহজপটুতা ছিল, তাহা আবার অর্জ্জন করিবার প্রয়োজন আছে। কালের আহ্বানে সাড়া দিবার শক্তি হারাইয়াই হিন্দু সভ্যতার দুর্গতি ঘটিয়াছে।

সভ্যতার তালিকা

এক্ষণে ভূমণ্ডলের অতীত ও বর্ত্তমান সভ্যতাগুলির নাম উল্লিখিত হইতেছে।

(ক) বিলুপ্ত

পুরাতন ভূভাগ

১। গ্রীক ও 'তদ্ভাবে ভাবিত' রোমক সভ্যতা ; উভয়ের মিলিত নাম হেলেনিক (Hellenic)।

২। মিসরের সভ্যতা।

৩। সুমারের সভ্যতা—আসীরিয়া ও বাবিলোনের সভ্যতার উৎস।

৪। মিনোয়ন বা ক্রীট দ্বীপের সভ্যতা—গ্রীক সভ্যতার অগ্রজ।

৫। সিন্ধুনদের তীরবর্ত্তী সভ্যতা। বিংশ শতাব্দীতে সিন্ধু প্রদেশে মহেঞ্জোদারো ও পঞ্জাবে হারাপ্পাতে ভূগর্ভে ইহার অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, এই সভ্যতা সুমারীয় সভ্যতার এক শাখা ; অপর বিশেষজ্ঞের মতে এই সভ্যতার প্রতিষ্ঠাতাদিগের এক শাখাই সুমারীয় সভ্যতা স্থাপন করে। প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে সিন্ধু ও সুমার দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ আদানপ্রদানের সম্পর্ক ছিল। ভারতীয় আর্য্য-সভ্যতা সিন্ধুসভ্যতার পরবর্ত্তী।

৬। হিটাইট বা ক্ষেত্তি সভ্যতা (Hittite=Khetti) ; পশ্চিম আসিয়া ইহার উৎপত্তিস্থল।

৭। ইরাণীয় সভ্যতা অর্থাৎ ইরান বা পারস্য দেশে প্রাচীন পারসীক জাতির সভ্যতা। ইসলামের কবলে পড়িয়া ইহার অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে।

৮। বাবিলোনীয় সভ্যতা—পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

৯। সীরিয়া দেশের সভ্যতা—এই দেশ ইহুদী, গ্রীক ও আরবীয় সভ্যতার ত্রিবেণীসঙ্গম ছিল।

নূতন ভূভাগ

১০। দক্ষিণ আমেরিকার আণ্ডীস পর্ব্বতজাত সভ্যতা। পেরুদেশ ইহার শ্রেষ্ঠ নিকেতন।

১১, ১২, ১৩। মধ্য আমেরিকায় মায়াজাতির, ইয়ুকেটান উপদ্বীপের ও মেক্সিকো দেশের সভ্যতা।

মায়া সভ্যতা কালবশে লুপ্ত হয়; অপর তিনটাকে স্পানিয়ার্ডেরা ধ্বংস করিয়াছে।

(খ) জীবিত

১। ইয়ুরোপীয় সভ্যতা—ইহার দুই শাখা। (ক) পাশ্চাত্য– জর্ম্মণী, ইটালী, ফ্রান্স, ইংলণ্ড ইত্যাদি পশ্চিমের দেশসমূহ। ইহার নাম Western Civilzation. আমেরিকা প্রভৃতি ইহার অন্তর্গত।

(খ) গ্রীস ও বল্‌কান্ উপদ্বীপের অন্যান্য দেশ এবং রুসিয়া; নাম নৈষ্ঠিক খৃষ্টীয় সভাতা (Orthodox Christian)।

২। হিন্দু সভ্যতা—ভারতবর্ষ।

৩। চৈনিক সভ্যতা—ইহার দুইরূপ ; (ক) আদি পীঠস্থান চীন; (খ) সুদূর প্রাচ্য অর্থাৎ কোরিয়া ও জাপানের সভ্যতা।

৪। আরবীয় সভ্যতা—ইস্‌লাম।

ধর্ম্মের নামানুসারে হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টীয় ও ইসলামিক, এই চারিটী সভ্যতা জীবিত।

সভ্যতার উৎপত্তিবিষয়ে আলোচনা

১। জাতিবাদ (Race-theory)

সভ্যতার উদ্ভবে শ্বেত, পীত, লোহিত সকল বর্ণের জাতিরই কৃতিত্ব আছে, নাই শুধু কৃষ্ণকায় আফ্রিকাবাসীর; তাহারা আজ পর্য্যন্ত সভ্যতার পদবীতে আরোহণ করিতে পারে নাই। অধুনা সসাগরা ধরা শ্বেতাঙ্গ ইয়ুরোপীয় জাতিসমূহের পদানত ; তাঁহাদিগের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে শ্বেতেতর প্রকৃতিপুঞ্জ শাসিত হইতেছে, তাঁহাদিগের শিল্পবাণিজ্য ধরণীতে

একচ্ছত্র সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছে, নিত্য নব সংহারাস্ত্র সৃজন করিয়া তাঁহারা মহাপ্রলয় আসন্ন করিয়া তুলিতেছেন। এই সকল কারণে শ্বেতাঙ্গগণের স্পর্দ্ধা আকাশ ছাড়াইয়া উঠিয়াছে—তাঁহারা প্রচার করিতেছেন, মানবসভ্যতার এক আদি ও অকৃত্রিম সৃষ্টিকর্ত্তা ধবলমূর্ত্তি ইয়ুরোপীয়দিগের পূর্ব্বপুরুষেরা।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা অনেকে প্রচার করিয়াছেন, পশ্চিম ইয়ুরোপের জাতিগুলি উদীচ্য (Nordic) জাতির বংশধর। বিগত মহাযুদ্ধের পরে হিট্‌লারের প্রভাবে জর্ম্মণীতে ধুয়া উঠিয়াছে, তাহারাই খাঁটি আর্য্য; অতএব সেমিটিক ইহুদীদিগকে জর্ম্মনী হইতে উচ্ছেদ করিতে হইবে। ভারতবর্ষেই বর্ণভেদ সমাজ সংগঠনের মূলসূত্ররূপে গৃহীত হইয়াছিল, কিন্তু বর্ণবিদ্বেষ কখনও ব্যাপকভাবে সংহারের কার্য্যে ব্রতী হয় নাই। পাশ্চাত্য বর্ণবিদ্বেষের বিষময় ফল মার্কিণ দেশের অতীত ও বর্ত্তমান ইতিহাসে প্রকট হইয়া রহিয়াছে—প্রথম, তাম্রবর্ণ সমাজগুলির ধ্বংস, এবং দ্বিতীয়, বংশপরম্পরাগত নিগ্রো-সমস্যা।

পাশ্চাত্য বর্ণবিদ্বেষ

শ্বেতাঙ্গ নরনারীদিগের মলিন বর্ণের উপরে কি প্রকার অবজ্ঞা আছে, তাহার সাক্ষাৎ জ্ঞান শিক্ষিত অশিক্ষিত কত ভারতবাসীরই আছে। নেকড়ে বাঘ ও মেষশাবকের আখ্যান প্রমাণ করিতেছে যে, প্রবল যদি দুর্ব্বলকে গ্রাস করিতে বা পদানত রাখিতে চাহে, তবে তাহাকে বলিতেই হয়, সে বলি অর্থাৎ হিংসোদ্দিষ্ট ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই নিয়মবলেই একটা অভিনব Race-theory বা জাতিবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। ঐতিহাসিক টয়নবীর (Toynbee) মতে ইহার তিনটী কারণ বিদ্যমান। প্রথমতঃ, শ্বেতাঙ্গ জাতিসমূহ ধরণীর অপর বর্ণের জাতিগুলির

উপরে আধিপত্য বিস্তার করিয়া সেই জাতির দেশে তাহাদিগের সহিত বাস করিতেছে। দ্বিতীয়তঃ, এই শ্বেতাঙ্গ প্রভুগণ প্রায় সর্ব্বত্রই কোন না কোনওরূপে, অল্পাধিক পরিমাণে স্বীয় স্বীয় ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়াছে। তৃতীয়তঃ, তাহাদিগের মনে নিরন্তর এই ভয় জাগিয়া রহিয়াছে, যে হয়তো কালক্রমে এই সকল পদানত জাতি, শিক্ষা ও সভ্যতার উন্নতির বলে, অথবা তত্তৎ দেশের প্রাকৃতিক আবেষ্টনের সহিত অধিকতর উপযোগিতার গুণে, অথবা অল্পতর ব্যয়ে জীবনধারণের সামর্থ্য হেতু শ্বেতজাতির অধীনতা হইতে মুক্তি লাভ করিবে, অথবা তাহাদিগেরই প্রভু হইয়া বসিবে। উক্ত তিন কারণে তারস্বরে ঘোষণা করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে, ভূমণ্ডলে যাহা কিছু হিতকর, যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু মহৎ, সে সকলই উদীচ্য অর্থাৎ শ্বেতাঙ্গ জাতির কীর্ত্তি। (এই প্রসঙ্গে জুলিয়ান হাক্‌সলী প্রভৃতি রচিত We Europeans নামক উপাদেয় পুস্তকখানি পঠিতব্য।)

পাশ্চাত্য সমাজের কৃষ্ণবর্ণের প্রতি বিরাগ যত গভীর ও অটল হউক না কেন, আজ পর্য্যন্ত কোনও বৈজ্ঞানিক প্রতিপন্ন করিতে পারেন নাই, যে মানুষে মানুষে শুধু বর্ণের জন্যই মানসিক শক্তি ও অধ্যাত্ম গুণের প্রভেদ ঘটে। বিভিন্ন বর্ণের মনুষ্যের মধ্যে দৈহিক সংগঠন কিংবা বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়ের সংস্থান ও ক্রিয়ার পার্থক্য আছে, কোন শরীরতত্ত্ববিৎ অদ্যাপি এমন তত্ত্ব আবিষ্কার করেন নাই। বাহ্য আকার যদি মানসিক ও আধ্যাত্মিক প্রকৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করিত, তবে সৌন্দর্য্যাধার ও সৌন্দর্য্যপ্রিয় গ্রীক জাতির মধ্যে এত বড় জ্ঞানী ও এমন কদাকার সোক্রাটীসের আবির্ভাব হইত না; তবে বার্ণাড শ-এর জীবনচরিতকার ফ্রাঙ্ক হারিস এক নিঃশ্বাসে বুদ্ধ ও ঈশার সহিত গান্ধীর নাম করিতে পারিতেন না। আসল কথা এই, সভ্যতার বিকাশে

সকল বর্ণেরই সাধনা মিলিত হইয়াছে। সুতরাং বর্ণান্ধ স্বাজাত্যগর্ব্বের মূলে বৈজ্ঞানিক সত্য কিছুই নাই, আছে অর্থহীন সংস্কারে অত্যানুরাগ। নিরপেক্ষ নৃতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে খাঁটি অবিমিশ্র জাতি ভূতলে একটীও নাই।

২। নৈসর্গিক আবেষ্টনের প্রভাব

সভ্যতার উৎপত্তি সম্বন্ধে দ্বিতীয় মত এই, যে উহা বিশেষ নৈসর্গিক আবেষ্টনের মধ্যে উদ্ভূত হইয়াছে। টয়নবী বলেন, এই মতও যুক্তিসঙ্গত নহে। পূর্ব্বে যে উনিশটা সভ্যতার নাম উল্লিখিত হইয়াছে, সেগুলির জন্মভূমিতে নানা প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য আছে। মিসর এবং সুমারের সভ্যতা নদীমাতৃক দেশে উৎপন্ন হইয়াছিল। আণ্ডীস পর্ব্বতের ক্ষেত্তিজাতির এবং মেক্সিকোর সভ্যতা অধিত্যকাতে জন্মলাভ করে; মিনোয়ান, গ্রীক ও সুদূর প্রাচ্য সভ্যতার পীঠস্থান দ্বীপপুঞ্জ; চৈনিক, ভারতীয় এবং ইয়ুরোপীয় সভ্যতা তিন বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে অভিব্যক্ত হইয়াছে।

৩। মানবীয় আবেষ্টন

প্রাকৃতিক আবেষ্টন সম্বন্ধে যেমন, মানবীয় আবেষ্টন সম্বন্ধেও ঠিক তাই। সকল প্রকার আবহাওয়া এবং ভৌগোলিক সংস্থানই সভ্যতার অনুকূল বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। সেই রূপ ভূমণ্ডলের বিভিন্ন জাতির মধ্যে সভ্যতার পত্তন হইয়াছে, নানা জাতির সংমিশ্রণ ও আদান প্রদানের দ্বারা এক একটী সভ্যতা প্রসারিত ও সমৃদ্ধ হইয়াছে। জীবন্ত সভ্যতার ধারাই এই—উহার বিকীরণ এবং আকর্ষণ আছে; সভ্যতার প্রভাব দেশে দেশে ব্যাপ্ত হয়; আবার উহা বহির্দেশ হইতে জনগণকে আকর্ষণ করে। ভারতীয় সভ্যতা ইহার অন্যতম উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। ইহার আর্য্যেতর কত জাতিকে বক্ষে স্থান দিয়াছে; আবার সমুদ্রের পরপারে "বৃহত্তর ভারত" প্রতিষ্ঠিত করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তির অধিকারী হইয়াছে।

নৈসর্গিক অবস্থা মানুষকে সংগ্রামের জন্য আহ্বান করে। শীত, বাত্যা, তুষারপাত; প্রখর উত্তাপ, জলপ্লাবন; কঙ্করময় বা উষর ভূমি; নিবিড় অরণ্যানী, দুস্পার মরুভূমি; প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়—এই সমুদায়ের সহিত যুদ্ধ করিয়া যে-সকল জাতি জয়ী হইয়াছে, তাহারাই সভ্যতার প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ সাধন করিয়াছে।

সভ্যতার দুই রূপ

সভ্যতা দ্বিমুখ; উহার এক মুখ বৈষয়িক, এবং অপর মুখ আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রতি স্থাপিত রহিয়াছে। কিন্তু ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়, মানবজাতি এই দ্বিবিধ উন্নতির পথে সমপদে অগ্রসর হয় নাই। বিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য জাতিসমূহের বিষয়বৈভবের যে ভাস্বর জ্যোতিতে আমাদিগের চক্ষু ঝলসিয়া যাইতেছে, তাহার শ্রেষ্ঠ উপকরণগুলি একান্ত অর্ব্বাচীন। দুই একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। ষোড়শ শতাব্দীতে রাজ্ঞী এলিজাবেথের সময়ে ইংরেজেরা কাঠের বালিশ মাথায় দিয়া নিদ্রা যাইত; তাহাদিগের নিত্যব্যবহার্য্য বাসনপত্রপ অনুন্নত যুগের স্মৃতি জাগাইয়া তুলিত। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে নেলসন ওককাঠের জাহাজে (hearts of oak) চড়িয়া ট্রাফালগারের যুদ্ধে ফরাসী নৌবাহিনী ধ্বংস করিয়াছিলেন। উহার পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পরেও ভুবনবিজয়ী ওয়েলিংটন পারতপক্ষে একান্ত আধুনিক রেলগাড়ীতে চড়িতেন না, ঘোড়ার ডাকগাড়ীতে যাতায়াত করিতেন। ঐ সময়েই মেকলে হাঙ্গারফোর্ড জাহাজে স্বদেশ হইতে যাত্রা করিয়া উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া ছয় মাসে কলিকাতায় উপনীত হইয়াছিলেন। সত্তর বৎসর পূর্ব্বে জর্ম্মণীর সহিত ফ্রান্সের যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহার সহিত বর্ত্তমান আহবের তুলনা করুন; যমদণ্ডের অভিনয়ে উভয়ের মধ্যে আকাশ

শাতালের ব্যবধান! এমন কি পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে কেহ চৌম্বক মরণ-খনির নামই শুনে নাই। তৎপরে যাহা কিছু মানুষের জীবনযাত্রাকে আরামদায়ক ও সহজসাধ্য করিয়াছে, সেগুলি কত আধুনিক, তাহা সকলেই জানেন।

কিন্তু অধ্যাত্মরাজ্যে মানব সুদূর প্রাচীন কালেই কত অগ্রসর হইয়াছিল। যাহা স্থূল দৃষ্টিতে সভ্যতার বৈষয়িক অঙ্গ বলিয়া মনে হইতে পারে, যথা স্থাপত্য ভাস্কর্য্য এবং চিত্রাঙ্কন, তাহাও এক এক দেশে ধর্ম্মের অনুপ্রাণাতেই উন্নতি লাভ করে। পাঁচ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মিশরের নৃপতিগণ আধ্যাত্মিক প্রেরণায় যে সৌধসমূহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা আজিও জগদ্বাসীর বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে গ্রীক স্থপতি ও ভাস্করগণ যে সকল মন্দির ও দেবমূর্ত্তি রচনা করিয়াছিলেন, কোনও শিল্পী আজ পর্য্যন্ত তাহা অতিক্রম করিতে পারেন নাই। ঋগ্বেদের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া ইস্লামের অভ্যুদয় পর্য্যন্ত মানবজাতি যত আধ্যাত্মিক তত্ত্ব অবগত হইয়াছে, তাহার পরবর্ত্তী প্রায় চৌদ্দ শত বৎসরের সাধনসম্পৎ কি তাহার সহিত তুলনার যোগ্য? ইসলামের পরে কোটি কোটি জনসেবিত কোনও ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয় নাই। বুদ্ধ, ঈশা ও মহম্মদের পরে এযাবৎ তাঁহাদিগের সমতুল্য কোন মহাপুরুষও ধরাতলে আগমন করেন নাই। ভারতে যখন ব্রহ্মবাদ প্রচারিত হয়, পৃথিবীর বর্ত্তমান অধীশ্বরগণের পূর্ব্বপুরুষেরা তখন অরণ্যচারী ছিল। ভারতের ব্রহ্মবাদই যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, তাহাও বলিতে পারি না; কেন না, ঈশারী শকের চোদ্দশত বৎসর পূর্ব্বে মিসরের অধিপতি আখেনাটেন একেশ্বরবাদ ঘোষণা করিয়াছিলেন। উচ্চতম আধ্যাত্মিক তত্ত্ব যদি এত প্রাচীন, তবে বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলি এত অর্ব্বাচীন কেন? ধর্ম্মবর্জ্জিত বৈষয়িক উন্নতি মানবকে মহা

বিনাশের পথে লইয়া যাইবে, এই জন্যই কি "ধর্ম্মাবহ" পরমেশ্বর সভ্যতার প্রথম প্রভাতেই তাহার আধ্যাত্মিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন?

সভ্যতার অন্তর্বিবাদ

কিন্তু একটা দুর্ব্বোধ্য সমস্যার মীমাংসা আমাদিগের দুর্ব্বল বুদ্ধি কিছুতেই খুঁজিয়া পাইতেছে না। সভ্যতার উন্মেষ হইতেই মানুষের তাত্ত্বিক ও ব্যাবহারিক জীবনে অসমাঞ্জস্য উত্তরোত্তর স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে কেন? ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণ ঈশ্বরের অবতার, ঈশ্বরের পুত্র, কিংবা ঈশ্বরকর্ত্তৃক প্রেরিত বলিয়া পূজা ও ভক্তি প্রাপ্ত হইতেছেন; তাঁহাদিগের উপদেশাবলি যুগ যুগ ধরিয়া অভ্রান্ত শাস্ত্ররূপে রক্ষিত, পঠিত ও আলোচিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু বিষয়-বাণিজ্যে, রাষ্ট্রনীতিতে, স্বার্থের সংঘাতে সে সমুদায়ের স্থান কোথায়?

ন হি বেরেন বেরানি সম্মন্ত্‌ ইধ কুদাচন।
অবেরেন চ সম্মন্তি, এস ধর্ম্মো ধনন্তনো॥

ধম্মপদ। ১। ৫।

সংসারের বৈর কখনও বৈর দ্বারা প্রশমিত হয় না, অবৈর অর্থাৎ প্রেমের দ্বারাই প্রশমিত হয়। ইহাই সনাতন ধর্ম্ম।"

পঁচিশ শতাব্দীতেও কি এই সনাতন ধর্ম্ম মানবসমাজে জয়যুক্ত হইয়াছে। ঈশার শৈলোপরি উপদেশ দ্বারা সাম্রাজ্য জিত হয় না, সাম্রাজ্য রক্ষা পায় না। তাই অহিংস, বৈষ্ণবগুণোপেত খৃষ্টধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়াও শ্বেতাঙ্গ জাতিগুলি শক্তসাধনায় তনুমনধন অর্পণ করিয়া "বীরভোগ্যা বসুন্ধরা", এই প্রবচনকে সার্থকতা দান করিয়াছে। জর্মন ভাষায় যাহাকে বলে Real politik—অর্থাৎ "বাস্তব রাষ্ট্রনীতি"; তাহা পরাধীন ভারতবাসীর ক্ষীণজ্যোতিঃ নয়নসমক্ষে দুর্ভেদ্য অন্ধকার,

তাহাতে সত্যপ্রেমপুণ্যের বিপরীত না আছে এমন কিছুই নাই। বর্ত্তমান অবস্থার দৃষ্টান্ত দিতে গেলে বিপদ আছে, এবং সে প্রচেষ্টায় প্রবেশ করিলে দ্বিতীয় একখানি মহাভারত গড়িয়া উঠিবে। অতএব আমাদিগের প্রাচীন মহাভারত হইতেই একটু আলোক সংগ্রহ করি, যেহেতু আমাদিগের অহমিকা আছে, যে আমরা বড়ই ধর্ম্মপ্রাণ জাতি। প্রথমেই ধরুন, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। উহার পূর্ব্বে, উহার মধ্যে ও উহার অবসানে পুনঃ পুনঃ ঘোষিত হইয়াছে, 'যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ'— 'যেখানে ধর্ম্ম সেখানেই জয়।' কুরুকুল হতবল হইলে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বলিলেন,

যতোধর্ম্মস্ততঃ কৃষ্ণো যতঃ কৃষ্ণস্ততো জয়ঃ। শল্য।৬২।৩২॥

"যেখানে ধর্ম্ম, সেখানেই কৃষ্ণ, যেখানে কৃষ্ণ সেখানেই জয়।" কিন্তু ইহার পূর্ব্বক্ষণেই ভীম অন্যায়রূপে দুর্যোধনের উরু ভঙ্গ করিলে, তজ্জন্য ক্রুদ্ধ হলায়ুধকে শান্ত করিবার উদ্দেশ্যে ভগ্নোরু দুর্যোধনের সমক্ষেই কৃষ্ণ অধর্ম্ম যুদ্ধের সমর্থন করিয়াছেন। যদিও কুরুপাণ্ডবগণ যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে যুদ্ধের কতকগুলি ধর্ম্মানুগত নিয়ম নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন, কার্য্যকালে কিন্তু কোন পক্ষই সেগুলি মানিয়া চলেন নাই। দুর্যোধন ছিলেন, "পাপী, পাপকর্ম্ম, পাপাত্মা, পাপসম্ভব", কেন না, স্নেহাতুর অন্ধের পুত্র; সুতরাং তাঁহার প্ররোচনায় ছয় রথীতে মিলিয়া কিশোরবয়স্ক অভিমন্যুকে বধ করিলেন, এবং তাঁহার মৃত্যুর পরে তদনুগামী অশ্বত্থামা প্রসুপ্ত শত্রু-শিবিরে উৎপতিত হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র প্রভৃতিকে নিপাত করিলেন, তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। বিস্ময়ের বিষয় এই, যে, কবি কেমন স্পষ্ট করিয়া দেখাইলেন, যাঁহারা 'ধর্ম্মের জয়' বলিতে বলিতে যুদ্ধক্ষেত্রে ধাবমান হইলেন, তাঁহারাও স্বচ্ছন্দে অঙ্গীকৃত সমরনিয়ম পদদলিত করিয়া ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও দুর্য্যোধনকে বধ করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান কালে সুসভ্য জগতে অহরহ এই প্রকারই হইতেছে। কত naval pact, Hague Convention, Disarmament agreement, Declarations of the League of Nations, Peace Conference হইতেছে; কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হইলেই সন্ধির সর্ত্ত ধর্ম্মযুদ্ধের অঙ্গীকার, নিরীহ নরনারী বালক-বালিকার জীবন রক্ষা করিবার শপথ—সমস্তই তোপের মুখে উড়িয়া যাইতেছে।

এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস বিনা "ধর্ম্মযুদ্ধ", কথাটার কোন অর্থই হয় না। ধর্ম্মের যুদ্ধ জগতে বহু বহু হইয়াছে, অভিশপ্ত আমাদের এই দেশে অহরহই হইতেছে, কিন্তু ধর্ম্মানুগত যুদ্ধ জগতে একটীও হয় নাই, কেন না যুদ্ধ জিনিষটাই ধর্ম্মবিরোধী।

একটা কথা আছে, 'A subject nation has no politics"—"পরাধীন জাতির রাজনীতি নাই।" ভারতের এখন রাজনীতি নাই বটে, কিন্তু সেই সুদূর বীরযুগে শুধু রাজনীতি নয়, বর্ত্তমান কালের সুসভ্য ঐশ্বর্য্যমদমত্ত রাষ্ট্রসমূহের ন্যায় "real politics," "বাস্তব" অর্থাৎ কূট রাজনীতিও বিলক্ষণ ছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে ফ্লরেন্সবাসী মাকিয়াভেলী 'রাষ্ট্রপতি' (The Prince) নামক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া কুটিল রাষ্ট্রনীতির প্রচারক বলিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বহু শত বৎসর পূর্ব্বে এ-দেশে কৌটিল্যের আবির্ভাব হইয়াছিল। তাঁহারও অগ্রবর্ত্তী রূপে মহাভারতে আপনারা এক ভারতীয় মাকিয়া-ভেলার সাক্ষাৎ পাইবেন। আদিপর্ব্বের ১৪০তম অধ্যায়ে শ্রেষ্ঠ রাজ-শাস্ত্রার্থবিৎ কণিক ধৃতরাষ্ট্রকে যে পরামর্শ দিয়াছিলেন, তাহা যেন মাকিয়াভেলীর সংস্কৃত সংস্করণ।

অচ্ছিদ্রশ্ছিদ্রদর্শী স্যাৎ পরেষাং বিবরানুগঃ। ৬॥
গূহেৎ কূর্ম্ম ইবাঙ্গানি রক্ষেদ্ বিবরমাত্মনঃ। ৮॥

"রাজ, নিজে ছিদ্রশূন্য হইয়া পরের ছিদ্র অন্বেষণপূর্ব্বক তদনুসারে কার্য্য করিবেন। কূর্ম্মের ন্যায় তিনি নিজের অঙ্গগুলি, অর্থাৎ সহায়, সাধন, উপায় প্রভৃতি গোপন রাখিবেন। সময় বিশেষে রাজা অন্ধ ও বধিরের ন্যায় আচরণ করিবেন; শত্রুদিগের দোষ দেখিয়াও দেখিবেন না, শুনিয়াও শুনিবেন না। শত্রু শরণাগত হইয়াছে ভাবিয়া তাহার প্রতি কৃপা প্রকাশ করিবেন না। দান দ্বারা আয়ত্ত করিয়া তাহাকে বিনাশ করিবেন। অগ্নিস্থাপন, যজ্ঞের অনুষ্ঠান, এবং কাষায়বসন, জটা ও মৃগচর্ম্ম ধারণ করিয়াও প্রথমতঃ পরপক্ষের বিশ্বাস উৎপাদন করিবে, পরিশেষে সহায় পাইলেই বৃকের ন্যায় তাহাকে আক্রমণ করিবে। কথিত আছে অর্থসঞ্চয় বিষয়ে শঠতা একটি নির্দ্দোষ উপায়। যত দিন সময় উপস্থিত না হয়, তত দিন শত্রুকে স্কন্ধে করিয়া বহন করিবে; অবশেষে যখন সময় উপস্থিত হইবে, তখন প্রস্তরে নিঃক্ষিপ্ত কলসের ন্যায় তাহাকে নষ্ট করিবে। পুত্র, সখা, ভ্রাতা, পিতা বা গুরুও শত্রুতা করিলে মঙ্গলকামী ব্যক্তি তাহাদিগকে হত্যা করিতে পারেন। শপথ, ধন, বিষ কিংবা মায়াজাল, যে উপায়ে হউক, শত্রুকে বিনাশ করিবে।"

মাকিয়াভেলীর প্রাগুক্ত পুস্তকের এক অষ্টাদশ অধ্যায়েই এতদনুরূপ অনেক কথা পাওয়া যাইবে।

শান্তিপর্ব্বে 'রাজধর্ম্ম' ব্যাখ্যা করিবার কালে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন, "ক্ষত্রিয় আপৎকালে ধনীদিগের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক ধন গ্রহণ করিবেন। তাহাতে দোষ নাই। কেন না,

নান্যানপীড়য়ত্বেহ কোশঃ শক্যঃ কুতো বলম্।
তদর্থং পীড়য়িত্বাচ দোষং প্রাপ্তুং ন সোঽর্হতি ॥১৩০।৩৬।

"অন্য ব্যক্তিকে পীড়ন না করিলে কোশ লাভের সম্ভাবনা নাই, কোশ

বিনা বল কোথা হইতে লাভ করিবে? অতএব আপৎকালে ক্লেশ ও বলের জন্য অন্যকে পীড়ন করিলে রাজার কিছুমাত্র দোষ হয় না।"

কিরূপে ভয় দেখাইয়া প্রজাগণের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিতে হয়, ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে সে পথও বলিয়া দিয়াছেন। (৮৭ম, ৮৮ম ও ১৩০ম অধ্যায়)। কোন্ কোন্ অবস্থায় মিথ্যা কথা বলা কর্ত্তব্য, এই বিশ্বকোষে সে বিষয়েও উপদেশ আছে—আদি ও শান্তিপর্ব্বে।

ইহার উপরে ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত দিয়া পুঁথি বাড়াইতে চাহি না। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, প্রাচীন কাল হইতেই সভ্যতার বৈষয়িক অঙ্গ স্ফীত ও আধ্যাত্মিক অঙ্গ ক্ষীণ হইয়া চলিয়াছে। ফলতঃ অধুনা সভ্যতা যে মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, তাহাতে ধর্ম্মের সহিত উহার ঐকান্তিক বিচ্ছেদ অদূরবর্ত্তী বলিয়াই বোধ হইতেছে।

ইয়ুরোপীয় সভ্যতার গর্ব্ব

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে বেঞ্জামিন কিড (Kidd) Social Evolution (সমাজের অভিব্যক্তি) নামক পুস্তক লিখিয়া ভুবনবিখ্যাত হইয়াছিলেন; অচিরে উহা সাতটা ইয়ুরোপীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। সুতরাং ইহাকে পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্বন্ধে এক প্রামাণিক প্রবক্তা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। ১৯০২ সনে প্রকাশিত "The Principles of European Civilization (ইয়ুরোপীয় সভ্যতার মূলতত্ত্ব) শীর্ষক গ্রন্থের উপসংহারে কিড্ বলিতেছেন—

"The universal empire towards which our civilisation moves—that universal empire the principle of which have obtained their first firm foothold in human history in that stupendous, complex and long-drawn-out conflict of which the history of the English-

speaking peoples has been the principal theatre in modern history." (p. 473)

ইহার ভাবার্থ—"ইয়ুরোপীয় সভ্যতা নিখিল বিশ্বের জয়যাত্রায় অগ্রসর হইতেছে। ঐ বিশ্বজনীন সাম্রাজ্যের মূলতত্ত্বগুলি অবিচল প্রতিষ্ঠাভূমি প্রাপ্ত হইয়াছে মানবজাতির ইতিহাসে সর্ব্বাগ্রে সেই বিশাল, জটিল এবং দূরব্যাপী সংগ্রামে, বর্ত্তমান যুগে যাহার প্রধান রঙ্গালয় ইংরেজীভাষাভাষী জাতিসমূহের ইতিহাস।"

জাতীয়গর্ব্বের ইহা অপেক্ষা উদ্ধত ও তেজোদৃপ্ত বাক্য অধিক পাঠ করি নাই। এ জন্য পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল্য পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

সভ্যতার পরশপাথর

কোনও বস্তুর মূল্য নিরূপণ করিতে হইলে প্রথমে একটা মানদণ্ড কিংবা কষ্টিপাথর চাই। ভারতবর্ষ প্রাচীন কাল হইতে বৈষয়িক সম্পৎ অপেক্ষা আত্মাকে অধিকতর মূল্যবান্ বলিয়া জ্ঞান করিয়া আসিতেছে। কয় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে উপনিষদের ঋষি শাশ্বতী বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন, "ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ"। "মনুষ্য বিত্তের দ্বারা পরিতৃপ্ত হইতে পারে না।"

"যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্।"

যদ্দ্বারা আমি অমর হইব না, সেই ভোগের উপকরণ লইয়া আমি কি করিব?"

সুতরাং পাশ্চাত্য সভ্যতা সার্ব্বভৌম সাম্রাজ্য জয় করিয়াছে, এই একটী কারণেই আমরা ইহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিয়া লইতে পারি না। কিন্তু ঋষিবাক্যের দ্বারা উহার বিচার করিলে কে তাহা গ্রাহ্য করিবে? অতএব পশ্চিম দেশ হইতে সভ্যতার মানদণ্ড আহরণ করিতেছি।

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আর্ণল্ড জে, টয়নবী (Toynbee)-প্রণীত A Study of History (ইতিহাসের অনুশীলন) নামক পুস্তকের তিন খণ্ড পাঁচ বৎসর হইল প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে The Criterion of Growth (সভ্যতার বিকাশের মানদণ্ড) নামক অধ্যায়ে একে একে চারিটা বিষয়ের বিচার করিয়া তিনি যে মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন, তাহার মর্ম্ম প্রদান করিতেছি।

(১) মানবীয় আবেষ্টনের উপরে ক্রমবর্দ্ধমান প্রভুত্ব (Increasing command over the human environment) ইহা দিবালোকের ন্যায় জাজ্বল্যমান সত্য, যে পাশ্চাত্য সভ্যতা পৃথিবীর সর্ব্বত্র, বহু জাতির উপরে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। জীবন্ত সভ্যতার লক্ষণই এই, যে উহা দেশে দেশে জনমণ্ডলীর মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়। কিন্তু শুধু বিস্তারের দ্বারাই সভ্যতার শ্রেষ্ঠতা নির্দ্ধারিত হয় না। ইহুদী ও গ্রীক সভ্যতা ভারত ও চীনের সভ্যতা অপেক্ষা অনেক অধিক দেশে ও জাতিতে ব্যাপ্ত হইয়াছিল; কিন্তু প্রথমোক্ত দুইটী যে শেষোক্ত দুই সভ্যতা অপেক্ষা সর্ব্বদিকে যথার্থ অধিকতর বিকাশ লাভ করিয়াছিল, তাহা কে বলিবে? বরং এক্ষণে পশ্চিমের সুধীবৃন্দের মধ্যে অনেকের মনেই বিশ্বজয়ী পাশ্চাত্য সভ্যতার বিষয়ে আতঙ্কজনক দুর্লক্ষণ দেখিয়া গুরুতর আশঙ্কার উদয় হইয়াছে।

তৎপরে ইহাও প্রণিধান করিবার যোগ্য যে, সভ্যতা কেন্দ্র হইতে পরিধির দিকে যত ব্যাপ্ত হয়, সামাজিক উন্নতিও ততই উত্তরোত্তর মন্দীভূত হইতে থাকে। ইহুদী ও গ্রীকজাতির ইতিহাসে দেখিতে পাই, ঐ দুই জাতির সভ্যতা যত প্রসারলাভ করিয়াছে, আধ্যাত্মিক উন্নতিও ততই ব্যাহত হইয়াছে।

পরিশেষে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পাশ্চাত্য সভ্যতার অভূতপূর্ব্ব

বিস্তৃতির মূলে আছে শেতাঙ্গ জাতিসমূহের নিকট সমরপ্রিয়তা (militarism)। ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে, এই ব্যাধি যুগে যুগে অনেক সভ্যতার বিলোপ সাধন করিয়াছে।

(২) প্রাকৃতিক আবেষ্টনের উপরে ক্রমবর্দ্ধমান প্রভূত্ব (Increasing command over the physical environment.) বহির্জগতের সহিত সংগ্রাম হইতেই সভ্যতার উদ্ভব হইয়াছে। বহির্জগতের উপরেপ্র ভূত্ব বিস্তার করিতে হইলে উদ্ভাবিনী বুদ্ধির সাহায্যে নিত্য নব যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণ করা আবশ্যক। এই আবিষ্কার ও নির্ম্মাণ-কৌশল বর্ত্তমান যুগে পশ্চিম জগতে বিস্ময়কর দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে জীবনব্যাপারের যাবতীয় উপকরণ সৃষ্টি করিবার দক্ষতা যত বাড়িতেছে, সভ্যতা অর্থাৎ সভ্যসমাজও যে সেই পরিমাণে উন্নতি সোপানে আরোহন করিতেছে, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। বরং আমরা দেখিতে পাইতেছি, বৈজ্ঞানিক প্রণালীর যত বিকাশ হইতেছে, ধনী ও দরিদ্রে, কারবারের মালিক ও শ্রমজীবীর মধ্যে বিবাদ বিসংবাদ, হিংসাবিদ্বেষ ততই বাড়িয়া চলিয়াছে। ধনকুবের মহাজনেরা পণ্যদ্রব্যের উৎপাদনে দেখেন শুধু মানুষের সহিত জড়প্রকৃতির সম্বন্ধ কি; কিন্তু মানুষের সহিত মানুষের সম্বন্ধ কি, সে চিন্তা তাঁহাদিগের মনে একেবারেই স্থান পায় না। ফলতঃ শ্রমজীবীরা প্রাণহীন যন্ত্রের ন্যায় ঝড়ের বেগে অবস্থার চক্রে ঘূর্ণায়মান হইতেছে। তারপর দেখা যাইতেছে, যে-সকল সভ্যতার বিকাশ পথিমধ্যে স্থগিত হইয়া গিয়াছে, সেগুলিও কোন না কোনও দিকে সবিশেষ নৈপুণ্য লাভ করিয়াছিল। পরিশেষে পাশ্চাত্য সভ্যতা যে জ্ঞানবিজ্ঞানের অন্তহীন অগ্রগতির প্রণোদনে উন্মত্ত হইয়া মরণের অভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহা আমরা দেখিতেই পাইতেছি।

(৩) টয়নবী তৃতীয় বিচার-সূত্রটীর নাম দিয়াছেন, Etherealization. বাঙ্গালা প্রতিশব্দ 'সুক্ষতাসম্পাদন'; কিন্তু ইহাতে কিছুই বুঝা গেল না; এ জন্য একটু ব্যাখ্যা আবশ্যক সভ্য মনুষ্য ক্রমাগত স্থুল হইতে সুক্ষ্মের দিকে অগ্রসর হইতেছে। যেমন রন্ধনের কার্য্যে কাঠের ইন্ধন, কয়লা (coal), গ্যাস, তাড়িত; জলপথে নৌকার দাঁড়, পাল, কিংবা নদীর স্রোত; তৎপরে বাষ্পশক্তি, তারপর বৈদ্যুতিক শক্তি। সেইরূপ জীবের অভিব্যক্তিও জটিলতা হইতে সরলতার পথে চলিয়াছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার দৈনন্দিন ব্যাপারে ইহার উদাহরণ যত্র তত্র বিদ্যমান। এটীও সভ্যতার পরশপাথর নয়, কিন্তু আমরা সে বিষয়ে ইঙ্গিত পাইতেছি। স্থুল হইতে সুক্ষ্মের দিকে যাত্রা করিলে মানুষ জড়ের মধ্যে অজড়ের সন্ধান পাইবেই।

(৪) কর্ম্মক্ষেত্রের পরিবর্ত্তন (The Transference of the Field of Action) অথবা লক্ষ্যের পরিবর্ত্তন—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, মানুষ প্রকৃতির আহ্বানে যে সাড়া দিয়াছে, সেই সাড়া হইতেই সভ্যতার উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু এই সাড়া শুধু দৈহিক নয়; উহার সহিত মানসিক ও নৈতিক সাড়াও যুক্ত রহিয়াছে। বৃষ্টিবাদল শীতবাত হইতে মানুষ আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে গৃহনির্ম্মাণ করিয়াছে; কিন্তু সেটা কেবল দৈহিক শ্রমের কাজ নয়; বিশেষতঃ মানবদল সমাজবদ্ধ না হইলে সভ্যতার জন্মই হইত না।

মানুষ যে বিকাশের পথে অগ্রসর হইতেছে তাহার একটী প্রমাণ এই যে সে নৈতিক আহ্বানে সাড়া দিতে দিতে ক্রমশঃ নিম্নভূমি হইতে উচ্চভূমিতে, উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে আরোহণ করে। "এই নৈতিক সংগ্রামের আহ্বানে সাড়া দিয়া মানুষ যে বিজয় লাভ করে, তাহা বাহিরের শত্রু কিংবা প্রতিকূল অবস্থার পরাজয়ে প্রকট হয় না; তাহা

মূর্ত্ত হইয়া উঠে নিজের অন্তরে আত্মপ্রকাশে অথবা আত্মকর্তৃত্বে।" (manifest themselves, instead, in an inward self-articulation or self-determination." Vol. III. p. 192) ইহাই সভ্যতার প্রকৃত পরশপাথর। টয়নবীর বাক্যটীতে আমরা ভারতের চিরন্তনী বাণীর প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইতেছি। এই পরশপাথরের পরখ করিতে পাশ্চাত্য সভ্যতার আভ্যন্তরীণ কদর্য্যতা বাহির হইয়া পড়ে।

পাশ্চাত্য সভ্যতার গুণাগুণ

মনস্তত্ত্ববিৎ ফ্রয়ড্ (Freud) বলেন. মানুষের দুঃখের নিদান তিনটী—রোগ জরা মৃত্যুর অধীন দেহ; বাহ্যজগৎ এবং অপর মানব। আধুনিক বিজ্ঞান এই ত্রিবিধ দুঃখের প্রতীকারের জন্য অসংখ্য উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে। প্রথম দুইটা দুঃখনিবারণের যত উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে, তদ্দ্বারা জগদ্বাসী সকলেই উপকৃত হইতেছে। কিন্তু মানব-সমাজ পরস্পরের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে দিন দিন যেরূপ মরণবাণ আবিষ্কার করিতেছে, তাহাতে সভ্যতা আত্মহত্যা করিবার পথ প্রশস্ত করিয়া তুলিতেছে। ফ্রয়ড্ তদীয় "সভ্যতা এবং তজ্জনিত অসন্তোষ" (Civilization and its Discontents) নামক পুস্তকের উপসংহারে লিখিয়াছেন, "Men have brought their powers of subduing the forces of nature of such a pitch that by using them they could now very easily exterminate one another to the last man." (last page). "মনুষ্যেরা প্রকৃতির শক্তিপুঞ্জকে জয় করিবার ক্ষমতা এতদূর বর্দ্ধিত করিয়াছে যে, এক্ষণে ঐ সকল শক্তি ব্যবহার করিয়া তাহারা অনায়াসে পরস্পরকে নিঃশেষে বিনাশ করিতে পারে।"

এই বিপদ যে একেবারে কাল্পনিক, তাহা বলা যায় না। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সপ্রমাণ করিতেছে, দুইটী সমান প্রতিকূল শক্তি পরস্পরের অভিমুখে ধাবিত হইলে সেই সংঘর্ষের ফলে উভয়েই লীন হইয়া থাকে। মহাভারতের আদিপর্ব্বে সুন্দ ও উপসুন্দের উপাখ্যান, এবং গ্রীক নাট্যকার ইস্কিলাস্-রচিত "থীবসের বিরুদ্ধে সপ্তবীরের অভিযান" (The Seven against Thebes) নামক নাটকে এটেয়ক্লীস ও পলুনাইকীসের (Eteocles and Polyneikes) কাহিনী, দুইটীতেই ঐ দুই ভ্রাতৃযুগল পরস্পরকে সংহার করিয়াছে। সাত বৎসর পূর্ব্বে, বৃটিশ আসোসিয়েসনের ১০১তম অধিবেশনে সভাপতি স্যর অ্যালফ্রেড ইয়ুইঙ্গ (Ewing) পাশ্চাত্য সভ্যতার আসন্ন বিপদ লক্ষ্য করিয়া স্বীয় অভিভাষণে বলিয়াছিলেন—"বৈজ্ঞানিকেরা পৃথিবীময় যে সকল সম্পৎ বিতরণ করিয়াছেন, ধর্ম্মনীতির দ্বারা বিচার করিলে যে সকলের জন্য মানুষ প্রস্তুত ছিল না ; নীতির বিকাশ যেরূপ মন্থরগতিতে চলিয়াছে, তাহাতে ঐ সকল সম্পদে যে গুরুতর দায়িত্ব আছে তজ্জন্য মানুষ আজও যোগ্যতা লাভ করে নাই। কিরূপে আপনার উপরে কর্তৃত্ব করিতে হয়, তাহা শিক্ষা করিবার পূর্ব্বেই তাহার হস্তে প্রাকৃত জগতের কর্তৃত্ব অর্পিত হইয়াছে।" ("The command of nature has been put into his hands before he knows how to command himself.") (A Study of History, Vol. III. p. 211

উপসংহার

আমরা দেখিলাম, সভ্যতার প্রকৃতি-বিষয়ে প্রতীচ্য সুধীগণের চিন্তা প্রাচ্য ঋষিদিগের বাণীর সহিত ঐক্যের দিকেই অগ্রসর হইতেছে। সভ্যতা ও ধর্ম্মের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। অথবা ধর্ম্মই সভ্যতার প্রাণশক্তি; সভ্যতা ধর্ম্মের বহিঃপ্রকাশ। হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইলে জীবদেহ যেমন মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তেমনি ধর্ম্মের অনুপ্রাণন হইতে বিচ্যুত হইলে সভ্যতাও চরম দুর্গতিতে পড়িয়া নির্ব্বাণ লাভ করে। ধর্ম্মহীন সভ্যতা মানবসমাজের পক্ষে বিষম অভিশাপ; অ-সভ্য অর্থাৎ জ্ঞানবঞ্চিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্ম্মও অমৃতপিয়াসী মানুষের অন্ধ কারাগার। এজন্য সভ্যতার বহিরঙ্গ, বিষয়বাণিজ্যশিল্পকলা এবং অন্তরঙ্গ, ধর্ম্ম, এই উভয়ের মধ্যে সম্যক্ সহযোগিতা বিদ্যমান থাকিবে। মানুষ যাহাতে পরিপূর্ণ আত্মপ্রকাশের মধ্য দিয়া সর্ব্বতোভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠ অর্থাৎ স্বাধীন হইতে পারে, তদুপযোগী উপায় বিধান করাই যদি সভ্যতার মূল উদ্দেশ্য হয়, তবে ধর্ম্মকে নির্ব্বাসনে পাঠাইলে তাহা কিছুতেই সংসিদ্ধ হইবে না। যতক্ষণ না মানুষ ধর্ম্মানুশাসনের অনুবর্ত্তী হইবে, ততক্ষণ সে বিষয়মদিরার উন্মাদন হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না। ধর্ম্ম কি, সে প্রশ্ন লইয়া কলহ করিবার প্রয়োজন নাই। যাহা চিরকাল সমুদায় সভ্যসমাজে ধর্ম্মের অপরিহার্য্য লক্ষণ বলিয়া গৃহীত হইয়া আসিতেছে, সেই লক্ষণাক্রান্ত সর্ব্বজনসেব্য ধর্ম্মই বর্ত্তমান উন্মার্গগামী সভ্যতাকে 'মহদ্‌ভয়' হইতে ত্রাস করিতে সক্ষম, অন্য কিছুই নয়।

শান্তিপর্ব্বের ২৬৮তম অধ্যায়ে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরের নিকটে ধর্ম্মের লক্ষণ ব্যাখ্যা করিতেছেন—

সদাচারঃ স্মৃতিবেদাস্ত্রিবিধ ধর্ম্মলক্ষণম্।
চতুর্থমর্থমিত্যাহুঃ কবয়ো ধর্ম্মলক্ষণম্ ॥ ৩ ॥

"সদাচার, স্মৃতি, বেদ ও অর্থ—এই চারিটাকে জ্ঞানীগণ ধর্ম্মের লক্ষণ বলিয়া থাকেন।"

বেদ ও স্মৃতি ভূমণ্ডলের সর্ব্বত্রমান্য শাস্ত্র নয়; অর্থ বা ধর্ম্মের প্রয়োজনও বর্ত্তমান স্থলে অপ্রাসঙ্গিক; এজন্য এই তিনটা লক্ষণ আমরা আলোচনার বাহিরে রাখিলাম। ধর্ম্মপ্রবক্তা সদাচারকেই লক্ষণ চতুষ্টয়ের প্রথমে স্থান দিয়াছেন। এই শব্দটীর তাৎপর্য্য বুঝাইবার জন্য নীলকণ্ঠ ভাষ্যে একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। রামমোহন রায়ও 'ব্রহ্মোপাসনা' নামক পুস্তিকায় 'মনুষ্যের যাবৎ ধর্ম্মের অন্যতম লক্ষণ সৌজন্য ও সাধু ব্যবহারের অর্থ বিশদ করিবার অভিপ্রায়ে ঐ শ্লোকটার সাহায্য লইয়াছেন। তদ্‌যথা—

পরিনির্মথ্য বাগজালমিদমেব সুনিশ্চিতম্।
নোপকারাৎ পরং পুণ্যং নাপকারাদঘং পরম্ ॥

"সমস্ত বাক্যজাল মন্থন করিয়া ইহাই সুনিশ্চিত হইয়াছে, যে, উপকার অপেক্ষা পরম পুণ্য, এবং অপকার অপেক্ষা অধিক পাপ নাই।"

ভীষ্ম কিঞ্চিৎ পরেই সদাচারের অর্থ পরিস্ফুট করিবার জন্য যে-শ্লোকটা উচ্চারণ করিয়াছেন, তাহার সহিত নীলকণ্ঠধৃত শ্লোক একত্র পাঠ করুন—

যদন্যৈর্বিহিতং নেচ্ছেদাত্মনঃ কর্ম্ম পুরুষঃ।
ন তং পরেষু কুর্ব্বীত জানন্নপ্রিয়মাত্মনঃ ॥ ২০ ॥

"পুরুষ অন্যে তাহার প্রতি যে কর্ম্ম করিলে প্রিয় জ্ঞান করে না, নিজের যাহা অপ্রিয়, তাহা জানিয়া অপরের প্রতি কখনও সেরূপ করিবে না।"

প্রাচীন আচার্য্যগণ সমাচার অর্থাৎ সাধুব্যবহারের উপরে এত জোর

দিয়াছেন, যে উদ্যোগ পর্ব্বে এবং পুনশ্চ অনুশাসন পর্ব্বে উহাকেই সংক্ষেপে ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

ন তৎ পরস্য সন্দধ্যাৎ প্রতিকূলং যদাত্মনঃ!
সংগ্রহেণৈষ ধর্ম্মঃ স্যাৎ কামাদন্য প্রবর্ত্ততে ॥ ৩৯।৭২ ॥
অনুশাসন ১১৩৮ ॥

"নিজের যাহা অপ্রিয়, অপরের প্রতি তাহা কদাপি করিবে না। সংক্ষেপে ইহাই ধর্ম্ম ; অন্য ধর্ম্ম কাম হইতে উৎপন্ন হয়।"

আমরা যে-তিনটী শ্লোক পাঠ করিলাম, তাহাতে সদাচারের অভাবাত্মক দিক্. অর্থাৎ যাহা অকর্ত্তব্য তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। উহার ভাবাত্মক দিক্, কিংবা কি কর্ত্তব্য, ঈশার প্রবচনরত্নে (the golden saying এ) সুব্যক্ত হইয়াছে—"Do unto others as ye would they should do unto you." "অপরের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিবে, যাহা তুমি তাহাদিগের নিকটে প্রত্যাশা কর।"

আপনার যাহা অপ্রিয়, অপরের প্রতি সে-প্রকার ব্যবহার করিব না, অপরের নিকটে যেরূপ আচরণ প্রত্যাশা করি, তাহাদিগের প্রতি নিজেও সেইরূপ আচরণ করিব -কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্যের এই মূলসূত্র যদি জগদ্বাসীর জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রিত করিত, তবে ধরা স্বর্গ হইয়া যাইত। কিন্তু সভ্যতার মধ্যাহ্নকালে, মানবের অন্তর্নিহিত তমসাচ্ছন্ন যুগের সেই হিংস্র বৃত্তিই (the spirit of aggression) আবার জাগিয়া উঠিয়াছে। উহা কোনও কালে সুষুপ্ত ছিল কি? নম্রতা, কোমলতা, সহিষ্ণুতা, বিনয়, বিশ্বাস এবং প্রেম—এই সকল গুণ শৈশবে যে-ধর্ম্মের লক্ষণ ছিল, সেই ধর্ম্মখ্যাত সভ্যতা নরসিংহমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। এ-জন্য যে মহাপ্রলয় উপস্থিত হইয়াছে, সদ্ধর্ম্ম ও সন্নীতি ভিন্ন তাহা হইতে রক্ষা পাইবার দ্বিতীয় পথ নাই।

ধর্ম্ম হইতে পৃথক্ করিয়া নীতির বিষয় আলোচনা করিলেও আমরা দেখিতে পাইব, যে, সভ্যতার সহিত উহার সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। আন্‌উইন Sex and Culture নামক গ্রন্থে সুমারীয়, বাবিলোনীয়, আথীনীয়, রোমক, এংলো-স্যাকসন, এবং প্রটেষ্টাণ্ট মতের ইংরেজ জাতির ইতিহাস আলোচনাপূর্ব্বক যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা এই—

(১) এই সকল জাতি যে-কালে প্রবল সমবেত কর্ম্মোদ্যম প্রদর্শন করিয়াছে, সে-কালে তাহারা একনিষ্ঠ দাম্পত্যবিধি (absolute monogamy) গ্রহণ করিয়া সংযমপালনে অভ্যস্ত হইয়াছে।

(২) সে কালে সংযতচরিত্র দলের লোকেরাই সমাজের পরিচালক হইত।

(৩) ঐ দলের সংযমের বন্ধন শিথিল হইলেই তাহার কর্ম্মোদ্যম হ্রাস ও পরিশেষে লোপ পাইত।

(৪) দেশ, বর্ণ এবং বংশ নির্ব্বিশেষে ঐ সকল জাতি একই প্রণালীতে সমাজে নির্ম্মল ও বিশ্বস্ত জীবনের বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিয়াছে।

ঐতিহাসিক গবেষণা যাহা সপ্রমাণ করিতেছে, ভারতীয় লোক-শিক্ষকগণ চিরকাল তাহাই বলিয়া আসিতেছেন। ভারতমহাকাব্যের কথাবস্তুর কেন্দ্রস্থলে ভীষ্ম ভোগলোলুপ কুরুবংশে চিদচরিত ব্রহ্মচর্য্যের মহোজ্জ্বল আদর্শরূপে তুষারশুভ্র গিরিরাজের ন্যায় বিরাজ করিতেছেন। বহুদারক্লিষ্ট দশরথের পুত্র রাম, সাবিত্রীসত্যবান্ নলদময়ন্তী প্রভৃতির আখ্যানও ভারতবাসীকে সংযমব্রত শিক্ষা দিতেছে।

সুসভ্য দেশসমূহে জগদ্বরেণ্য উপদেষ্টার অভাব নাই ; অভাব হিত-বচনের প্রতি শ্রদ্ধার ও তদনুসারে চলিবার প্রবৃত্তির। যে দেশের ভাস্বর গৌরব বেদান্তপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মবাদ, সে দেশের আপামর সাধারণ ঐ বিমল

তত্ত্ব একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে। ঈশার অমৃতোপম উপদেশ, "তোমার প্রতিবেশীকে নিজের তুল্য প্রীতি কর। শত্রুকে প্রেম দেও"—কল্পনা-বিহারীর ভাবের খেয়াল বলিয়া উপেক্ষিত হইতেছে। মহম্মদ ঘোষণা করিলেন, "ধর্ম্মে জোরজুলুম নাই। অ-মুসলমান যদি ইসলামের সৌন্দর্য্যের দ্বারা আকৃষ্ট না হয়, তবে বল, 'তোমার সঙ্গে আমাদের ঝগড়া নাই—তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম্ম, আমাদের জন্য আমাদের ধর্ম্ম।' (ইসলামের বাণী, ১৬ পৃঃ)। তাঁহার এই উদার বাণী ফলবতী হইলে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয়গগনে নবেন্দু ফুটিয়া উঠিত।

হৃদ্‌যন্ত্রের স্পন্দনের ন্যায়, সাগরের জলোচ্ছ্বাসের ন্যায়, অহোরাত্রের পরাবর্ত্তনের ন্যায় সভ্যতারও এক ছন্দঃ Rhythm) আছে। এই ছন্দঃ ধর্ম্মের অনুবর্ত্তন করে। ধর্ম্ম জয়যুক্ত হইলে সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি হয়, ধর্ম্মের গ্লানি হইলে সভ্যতার অধোগতি ঘটে। ধর্ম্মের গ্লানি হইলে ভগবান অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, এই বিশ্বজনীন মতই তখন ব্যাকুলচিত্ত নরনারীকে আশ্বাস ও বলদান করে। সসীম ও অপূর্ণ মানব কখনও অনাদ্যন্ত পূর্ণ ব্রহ্মের পূর্ণাবতার হইতে পারে না; মহাপুরুষেরা তাঁহার অংশাবতার, প্রত্যেক মানুষ, অনুপরিমাণে হইলেও তাঁহারই অংশাবতার। প্রেমময় পরমেশ্বর নিজ কৃপাগুণে অনুরাগী মুমুক্ষু জনগণের চিত্তে আত্ম-প্রকাশ করেন। এই বিধান হইতেই মানবজাতির সমষ্টিগত বিবেক বা ধর্ম্মাধর্ম্মবোধ (the collective conscience of humanity) অভিব্যক্ত হইয়াছে। ধর্ম্মের জন্য সংগ্রামে সর্ব্বসাধারণের দায়িত্ব এইখানে। বর্ত্তমানে গণতন্ত্রের যুগে এমন কোনও মহামনস্বী ত্রিভুবনমান্য ধর্ম্মচক্র-প্রবর্ত্তক বিদ্যমান নাই, যাঁহার অনুশাসনে আহব-নিমগ্ন পাশ্চাত্য কুরুপাণ্ডবগণ কর্ণপাত করিবে। এক্ষণে সভ্যতার মহাবিনাশ হইতে রক্ষা পাইবার আশা নির্ভর করিতেছে বিশ্বমানবের সম্মিলিত ধর্ম্মাধর্ম্মবোধের

উপরে। সেই বোধের উদ্দীপন ও বলাধানের জন্য প্রাচীরও কিছু দান করিবার আছে। "Ex oriente lux"—"পূর্ব্বগগন হইতেই কিরণমালা ধরণীতে অবতরণ করে।" ধর্ম্মের ধারা প্রাচী হইতেই প্রতাচীতে প্রবহমান হইয়া শ্বেতাঙ্গ পৃথ্বীশ্বর জাতিসমূহের পিতৃপুরুষদিগকে সভ্যতার পদবীতে উন্নীত করিয়াছিল। জাতিবর্ণধর্ম্মবিভেদ ভুলিয়া নরনারী একত্র, এক ভজনালয়ে, এক পরম পিতার আরাধনা করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে, এই উদার বার্ত্তা প্রচারিত হইয়াছিল সর্ব্বপ্রথম প্রাচীতে, আমাদেরই বঙ্গদেশে আধুনিক ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ রামমোহন রায়ের দ্বারা; বিশ্বমানবের মৈত্রীবন্ধনের সহায়স্বরূপ মহাজাতি সম্মেলনের পরিকল্পনাও প্রথমে উদ্ভাসিত হইয়াছিল, তাঁহারই চিত্তে।

ইহুদীজাতির প্রবক্তা জোয়েল (Joel) ভগবদ্‌বাণী শুনিয়াছিলেন, "Your young men shall see visions" (II.28)—"তোমাদের তরুণেরা ভবিষ্যদ্দর্শন করিবে।" রামমোহন তরুণ বয়সেই ভবিষ্য ধর্ম্মের রূপ দর্শন করিয়াছিলেন; স্বাধীন ভারতের চিত্তহারী ছবিও তাঁহার মানসপটে অঙ্কিত হইয়াছিল। বঙ্গের তরুণ দল, তোমরা জন্মভূমির দূরবর্ত্তী কিংবা আগতপ্রায় স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিতেছ। ঐ চিত্রের পার্শ্বে আর একটী মহত্তর দৃশ্য দেখিতে পাইতেছ কি? চাহিয়া দেখ, ভারতীয় ব্রহ্মবিদ্যা ইহসর্ব্বস্ব, আত্মজ্ঞানবিমুখ সভ্যতার মুখ ফিরাইয়া দিতেছে; জ্ঞানদৃপ্ত, ভোগমত্ত, ঐশ্বর্য্যলোলুপ, দুর্দ্ধর্ষ জাতিগুলিকে উপনিষদের অমৃতোপম বাণী শুনাইয়া শান্ত করিতেছে—"যো বৈ ভূমা তৎ সুখং, নাল্পে সুখমস্তি,—"যিনি ভূমা, অন্তহীন, তিনিই সুখ; পৃথিবীজোড়া রাজ্য, লক্ষ বৎসরের পরমায়ু—তাহাও অন্তবৎ, তাহাতে সুখ নাই।" আবার শুন, একদা ভারতের আকাশে মৈত্রীগীতির যে ললিত লহরী উত্থিত হইয়াছিল, তাহা তরঙ্গে তরঙ্গে ব্যাপ্ত হইতে হইতে দিগ্বলয় স্পর্শ

করিয়ছে; দিগ্বলয় অতিক্রম করিয়া সাগর পার হইয়া দূরে সন্তপ্ত নরনারীর প্রাণ শীতল করিতেছে।

মাতা যথা নিযং পুত্তং
আয়ুসা একং পুত্তং অনুরক্খে,
এবম্‌ পি সর্ব্বভূতেসু
মানসম ভাবয়ে অপরিমাণং।

মেত্তাসুত্ত। ৭॥

"মাতা যেমন আপনার প্রাণ দিয়াও নিজের পুত্রকে, নিজের একমাত্র পুত্রকে রক্ষা করেন, সেইরূপ প্রত্যেকে সর্ব্বভূতের প্রতি অপরিমেয় (মৈত্রীপূর্ণ) মনোভাব রক্ষা করিবে।"

আমরা যেন দিব্য দৃষ্টিতে দেখিতে পাই, সেই ধর্ম্মই সুসভ্য জাতিসমূহের ভবিষ্যদ্ধর্ম্ম, যাহার বীজমন্ত্র,

"এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর মানবজাতির পিতা, মানুষ মানুষের ভ্রাতা।"

অপধ্বান্তমূর্ন্ন্‌হি পূর্দ্ধি চক্ষু র্মুমুগ্ধ্যাস্মান্‌ নিধয়েব বদ্ধান্‌

সামবেদ।

"আমাদের নয়নের অন্ধকার দূর করিয়া দাও, নয়ন আলোকে ভরিয়া দাও। আমরা আকাশগামী বিহঙ্গ, অথচ অজ্ঞানের পাশে আবদ্ধ রহিয়াছি, আমাদিগকে মুক্তি দাও।"

ব্রাহ্মধর্ম্মের রূপ ও স্বরূপ

ব্রাহ্মধর্ম্মের রূপ ও স্বরূপ

—* —

ভূমিকা

পদার্থের বহিঃপ্রকাশ, বা কায়া তাহার রূপ (form)। অন্তঃস্থ সত্তা (essence) তাহার স্বরূপ। বৃক্ষের মূল, কাণ্ড, শাখাপ্রশাখা, পত্রপুষ্প তাহার রূপ। যাহাতে বৃক্ষের বৃক্ষত্ব, তাহাই তাহার স্বরূপ। দেহ মনুষ্যের রূপ ; মনুষ্যত্ব তাহার স্বরূপ।

ধর্ম্মের রূপ পূজাপদ্ধতি, সাধনপ্রণালী, আচার অনুষ্ঠান, সম্প্রদায় বা সংঘ। ধর্ম্মের স্বরূপ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর ভাষায় ব্যক্ত হইতেছে—

"ধর্ম্মের স্বরূপের ভিতর দুইটী কথা আছে ; আধ্যাত্মিক দিকে এক ইন্দ্রিয়াতীত সত্তা বা শক্তিতে বিশ্বাস ও নৈতিক দিকে আত্মশাসন।" (প্রবন্ধাবলি, ৭৪ পৃঃ)

ব্রাহ্মধর্ম্মের রূপ আমাদের উপাসনাপ্রণালী, সামাজিক উপাসনা, উৎসব, সভাবৃন্দ, সভাসমিতি, সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা ইত্যাদি।

ব্রাহ্মধর্ম্মের স্বরূপ রামমোহন রায় ১৮৩০ সনে ব্রাহ্মসমাজের Trust Deedএ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"The worship and adoration of Eternal Unsearchable and Immutable Being who is the Author and Preserver of the Universe but not under or by any other name designation or title used for or applied to any particular Being or Beings……"

"যে শাশ্বত, অগম্য অপরিবর্ত্তনীয় পুরুষ বিশ্বের স্রষ্টা ও পাতা, তাঁহার পূজা ও আরাধনা,—" এই মন্দিরে অনুষ্ঠিত হইবে।

এই মন্দিরে কোনও মূর্ত্তি বা চিত্র স্থান পাইবে না। আধ্যাত্মিক দিকে এইটুকু উদ্ধৃত হইল। নীতির দিকে উক্ত হইয়াছে—

"এই মন্দিরে জীবহত্যা, পানাহার উদ্দাম আমোদপ্রমোদ, এবং কাহারও উপাস্যের নিন্দা, উপহাস বা তৎপ্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ নিষিদ্ধ; ইহার উপাসনা, প্রার্থনা, সঙ্গীত এ প্রকার হইবে, যদ্দ্বারা বিশ্বের স্রষ্টা ও পাতার ধ্যান; প্রেম, দয়া, ঔদার্য্য, উপচিকীর্ষা, ভক্তি; এবং সকল ধর্ম্ম, সম্প্রদায় ও সমাজের মিলন সহায়তা লাভ করিবে।"

['such as have a tendency to the promotion of the contemplation of the Author and Preserver of the Universe, to the promotion of charity, morality, piety, benevolence, virtue, and the strengthening of the bonds of Union between men of all religions, persuasions and creeds.']

ধর্ম্ম—জাতীয় ও সার্ব্বভৌমিক

ধর্ম্ম বিভাগের নানা প্রকার আছে। এক প্রকারে ধর্ম্ম জাতীয় ও সার্ব্বভৌমিক, এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। "জাতীয়" শব্দটী চারি অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(১) জাতিবিশেষের ধর্ম্ম (Ethnic Religion)—যথা, হিন্দুধর্ম্ম, ইহুদী ধর্ম্ম, (God of Abraham, Isaac, Jacob,) গ্রীক ধর্ম্ম ইত্যাদি। জাতি বিশেষের ধর্ম্ম, যথা, বর্ণাশ্রমমূলক হিন্দুধর্ম্ম বিশ্বজনীনতার দাবী করিতে পারে না।

(২) জাতীয় ইতিহাস দ্বারা অনুরঞ্জিত

ইহুদী জাতির ইতিহাসে জেহোভার অত্যাশ্চর্য্য ক্রিয়া-কাহিনীতে ধর্ম্মশাস্ত্র পরিপূর্ণ। ইহুদী-ধর্ম্মে Passover, Pentecost প্রভৃতি উৎসব, ইস্লামে মহরম পর্ব্ব ইহার দৃষ্টান্ত।

(৩) জাতীয় চরিত্র দ্বারা প্রভাবান্বিত ও রূপান্তরিত

খৃষ্টধর্ম্ম—সীরিয়া ও মিশরের জাতিগুলি খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব জীবন অলস ধ্যানময় ধর্ম্ম চর্চ্চায় সমর্পণ করিল; রোম পার্থিব সাম্রাজ্য হারাইয়া পুনশ্চ ধর্ম্ম-জগতের একচ্ছত্র অধিনায়কত্ব লাভ করিতে প্রয়াসী হইল; এবং সরস-চিত্ত ও বাক্যবিশারদ গ্রীকদিগের রসপ্রবণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দার্শনিক ধর্ম্মতত্ত্বের বিচারে অপব্যবহৃত হইতে লাগিল। —(Gibbon.)

(৪) রাষ্ট্রানুমোদিত, রাষ্ট্রপালিত, রাষ্ট্রশাসিত—Established Religion—যথা, The Church of England, মোস্লেম রাজ্যে ইস্লাম্।

ব্রাহ্মধতকে এই চারি অর্থের আলোকে বিচার করি।

প্রথমতঃ, ব্রাহ্মধর্ম্ম জাতিবিশেষের ধর্ম্ম নয়; ইহা বিশ্ববাসী সকলের জন্য। সুতরাং এই ধর্ম্ম Ethnic Religion অথবা হিন্দুধর্ম্ম নহে। ট্রাষ্ট ডীড্ তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ।

দ্বিতীয়তঃ; ব্রাহ্মধর্ম্মকে দ্বিতীয় অর্থে বিচার করিবার সময় এখনও আসে নাই। ইতিহাস শব্দটী সচরাচর যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, সে অর্থে বলা চলে না যে ব্রাহ্মধর্ম্ম ইহুদী ধর্ম্ম ও ইসলামের ন্যায় ভারতবর্ষের ইতিহাস দ্বারা অনুরঞ্জিত হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ প্রত্যেক দেশের ধর্ম্মই জাতীয় চরিত্রের প্রভাবে উদ্ভূত ও পরিপুষ্ট হয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের আদ্যন্ত মধ্যে ভারতীয় চরিত্রের প্রভাব দেদীপ্যমান। এ কথাও বলা যাইতে পারে, যে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ, যথা বঙ্গদেশ, পাঞ্জাব,

মহারাষ্ট্র, মান্দ্রাজ প্রভৃতির মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের রূপ ও সাধন বিষয়ে কিঞ্চিৎ পার্থক্য সূক্ষ্মদৃষ্টিতে ধরা পড়ে।

চতুর্থতঃ, ব্রাহ্মধর্ম্ম রাষ্ট্রীয় বা Established Religion নয়, ইহা বলাই বাহুল্য।

জাতিবিশেষের ধর্ম্মও জাতীয়তার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া সার্ব্বভৌমিকতার দিকে অগ্রসর হইতে পারে। বৈদিক ধর্ম্ম ও ইহুদী ধর্ম্ম দৃষ্টান্ত। বেদের পরিণতি বেদান্ত; বেদান্ত সার্ব্বভৌমিক ব্রাহ্মধর্ম্মের উৎস। একমাত্র উৎস বলিতেছি না; কেন না, রামমোহন প্রথমে কোরাণ হইতেই একেশ্বরবাদের তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন।

ইহুদী ধর্ম্মের পরিণতি ঈশাহী ধর্ম্ম; উহা জাতীয়তার নিগড় ছিন্ন করিয়া সার্ব্বভৌমিক বলিয়া প্রচারিত হইতেছে।

বৌদ্ধ, খৃষ্টীয় ও ইসলাম—এই তিন ধর্ম্মকে তদনুবর্ত্তীরা সার্ব্বভৌমিক বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকেন।

(১) শাক্য গৌতম যে-তত্ত্ব প্রচার করেন, তাহার নাম ধর্ম্ম; তিনি উহাকে "মধ্যপথ" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। উহার মূল তত্ত্ব তিনটী —(১) প্রতীত্যসমুৎপাদ অর্থাৎ অনাদি, অনন্ত কার্য্যকারণ সম্বন্ধ। (২) চতুরার্য্য সত্য। (৩) আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ।

দুঃখ, দুঃখের উদয় বা উৎপত্তি, দুঃখের নিরোধ এবং দুঃখনিরোধগামী পথ—এই চারিটী আর্য্য অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ সত্য।

দুঃখ নিরোধের পথ অষ্টাঙ্গিক মার্গ, তদ্‌যথা—সম্যক্‌ দৃষ্টি, সম্যক্‌ সংকল্প, সম্যক্‌ বাক্য, সম্যক্‌ কর্ম্মান্ত, সম্যক্‌ আজীব, সম্যক্‌ ব্যায়াম, সম্যক্‌ স্মৃতি এবং সম্যক্‌ সমাধি।

শাক্য গৌতম স্ব-প্রচারিত সাধনপদ্ধতিতে আরাধনা ও প্রার্থনার স্থান রাখেন নাই; উহা নিরবচ্ছিন্ন পুরুষকারের উপরে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু

তিনি অতীন্দ্রিয় সত্তায় বিশ্বাস করিতেন না, এই প্রকার সিদ্ধান্তের প্রতিপোষক উক্তি অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। বরং মহাবর্গ, দীর্ঘনিকার প্রভৃতির পরবর্ত্তী উদান ও ইতিবুত্তকের দুইটী বাক্য উদ্ধৃত করিয়া কোন কোনও পণ্ডিত এই মতে উপনীত হইয়াছেন যে, বুদ্ধ ব্রহ্মবাদী ছিলেন। সে যাহা হউক, তিনি জগদ্বাসীর জন্য যে সাধন-পদ্ধতি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা জাতীয়ত্বের সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ নহে। তাহার অমৃতোপম বাণী সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসর ধরিয়া অর্দ্ধ ধরণীবাসী নরনারীর চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া আসিতেছে। বৌদ্ধ ধর্ম্ম শৈশবেও জাতিবিশেষের ধর্ম্ম ছিল না, চির দিন উহা সার্ব্বভৌমিক স্বীকৃত হইতেছে।

খৃষ্ট ধর্ম্মের প্রথম যুগ

(২) ঈশা ইহুদী জাতির মধ্যে অভ্যুদিত হইয়াছিলেন। মথি প্রভৃতি লিখিত সুসমাচারে তাঁহার মুখে পরস্পরবিরোধী বাণী আরোপিত হইয়াছে। সেগুলি পাঠ করিলে একবার মনে হয়, তিনি ইহুদী জাতির জন্যই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। পরক্ষণেই আবার দেখিতে পাই বলিতেছেন, জাতীয় ধর্ম্মের স্থলে সমগ্র মানবজাতির পরিত্রাণের জন্য নববার্ত্তার প্রচারই তাঁহার জীবনব্রত। তাঁহার তিরোধানের পরেই খৃষ্টীয় ধর্ম্মমণ্ডলীতে যে সমস্যা ও মতবৈষম্য উপস্থিত হইয়াছিল, বিসংবাদী উক্তিগুলি তাহারই প্রতিধ্বনি। প্রথম যুগের খৃষ্ট ধর্ম্ম ও প্রথম যুগের ব্রাহ্মধর্ম্মের সমস্যাজনিত ঐক্য আছে বলিয়া একটু বিশদ বিবরণ দিতেছি।

ঈশা ইহুদী জাতির মধ্যেই ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করেন, এবং সেখানেই তাঁহার প্রচারের অবসান হয়। যে-সকল ইহুদী তাঁহাকে ইহুদী জাতির অভিষিক্ত রাজা বলিয়া মানিল, তাহারা নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইল; যাহারা মানিল না, তাহারা তাঁহাকে হত্যা করিল। ফলতঃ, তাঁহার তিরোভাবের

পরে তৎপ্রচারিত ধর্ম্ম অল্পসংখ্যক ইহুদীর মধ্যে বলিতে গেলে অজ্ঞাত-বাসে বাঁচিয়া রহিল। নবধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পরেও ঈশার অনুবর্ত্তিগণ প্রাচীন সমাজের বিধি (Law) নিষ্ঠার সহিত পালন করিয়া চলিতে লাগিলেন।

কয়েক বৎসর পরে সেণ্ট পল অলৌকিক রূপে ঈশা-প্রচারিত ধর্ম্মের আশ্রয়ে নবজীবন লাভ করিয়া ইহুদী সমাজের বাহিরে, গ্রীক, রোমক প্রভৃতি জাতির নিকটে নব সুসমাচারের বার্ত্তা প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। অচিরে পশ্চিম এশিয়ার নানা নগরে খৃষ্টীয় মণ্ডলী গঠিত হইল; তখন প্রশ্ন উঠিল, অ-ইহুদী খৃষ্টানেরা মুসা-প্রবর্ত্তিত বিধি পালন করিতে বাধ্য কি না। সীরিয়া প্রদেশের রাজধানী আণ্টিয়োখে মণ্ডলীর সভ্য-শ্রেণীতে মুষ্টিমেয় ইহুদির সহিত সংখ্যাবহুল গ্রীক ছিল। প্রাচীনপন্থী ইহুদীরা জেদ করিতে লাগিল, অ-ইহুদী ব্যক্তিদিগকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার পরে যথাবিধি ত্বক্‌চ্ছেদ করিয়া ইহুদী সমাজভুক্ত হইতে হইবে, এবং তাহারা পুরাতন সংহিতার নিয়ম সমূহ মানিয়া চলিবে। পল এই ধর্ম্মান্ধতার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন; তিনি অ-ইহুদী খৃষ্টশিষ্যদিগের জন্য পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। তাঁহার প্রচেষ্টায় তুমুল বাগবিতণ্ডার পরে ঈশার প্রেরিতগণের মধ্যে অগ্রগণ্য পিটার, জন, জেমস্ প্রভৃতির মধ্যস্থতায় স্থির হইল, যে (১) অ-ইহুদী খৃষ্টানেরা প্রাচীন বিধির অধীন হইবে না; (২) ইহুদী খৃষ্টানদিগের পক্ষে প্রাচীন বিধি অবশ্য-প্রতিপাল্য। এই মীমাংসার একটি সুফল স্মরণীয়। এতদিন ঈশার ধর্ম্ম ইহুদী ধর্ম্ম হইতে অভিন্ন, এবং ঈশাহী মণ্ডলী ইহুদী সমাজের শাখা বা ক্ষুদ্রতর সম্প্রদায় বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছিল; এখন হইতে উহা একটী স্বতন্ত্র ধর্ম্ম রূপে স্বীকৃত হইল। ইহুদী জাতির খৃষ্টানেরাও প্রাচীন বিধি হইতে মুক্ত, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদের বহু বহু বৎসর লাগিয়াছিল। সেণ্ট পলের জলন্ত বিশ্বাস, মরণহীন ঈশাভক্তি, দিব্য-দৃষ্টিপ্রণোদিত অতর্পণীয় প্রচারোৎসাহের ফলেই খৃষ্টধর্ম্ম বিশ্বজনীন ধর্ম্মরূপে অভিব্যক্ত হইবার পথে যাত্রা করিবার সুযোগ পাইয়াছিল।

ইসলাম সম্বন্ধে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে এই ধর্ম্মও দেশকালনির্ব্বিশেষে সমগ্র মানববৃন্দের জন্য ঘোষিত হইয়াছিল। তবে ইহার ললাটে আদিভূমি আরবের প্রভাব-চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। আর্য্য মঙ্গোলীয় প্রভৃতি অ-সেমেটিক জাতীয় প্রত্যেক ব্যক্তিকে চিরাগত ত্বক্‌চ্ছেদ বিধি পালন করিতে হয়। এই ধর্ম্মে আরাধনাদি আরবী ভাষায় সম্পাদিত হইয়া থাকে; এবং মস্লেম জগতের সর্ব্বত্র, আর্য্যবংশোদ্ভূত জাতিসমূহের মধ্যেও, অধিকাংশ নরনারীর নাম আরবী ভাষা হইতে গ্রহণ করিবার রীতি চলিয়া আসিতেছে। ইহার অনুরূপ প্রথা ভারত-বর্ষের খৃষ্টীয় সমাজে প্রচলিত আছে; যথা, জন্ সরকার, মোজেস্ বিশ্বাস।

প্রথম যুগের খৃষ্ট ধর্ম্ম সুদীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রামের পরে প্রাচীন বিধির নাগপাশ হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ব্রাহ্ম-সমাজের শৈশব কালেও এই প্রকার সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল, আজিও সে সংগ্রামের অবসান হয় নাই।

ব্রাহ্মসমাজ—প্রথম যুগ

রামমোহন রায় ১৮২৮ সনের ৬ই ভাদ্র ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন: ১৮৩০ সনের ১১ই মাঘ কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের মন্দির প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। পরবর্ত্তী নভেম্বর মাসে তিনি বিলাত যাত্রা করেন, এবং ১৮৩৩ সনের ২৭শে সেপ্টেম্বর বিষ্টলে লোকান্তরিত হন। তাঁহার মৃত্যুর এগার বৎসর পরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন। তখন উহার অবস্থা কিরূপ ছিল, তাঁহার কথায় বর্ণিত হইতেছে।

"আমি এক বুধবারে সেই সমাজ দেখিতে যাই। আমি গিয়া দেখি যে, সূর্য্য অস্ত হইবার পূর্ব্বে সমাজের পার্শ্বগৃহে একজন দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণ উপনিষৎ পাঠ করিতেছেন, সেখানে কেবলমাত্র রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন এবং আর দুই তিন জন ব্রাহ্মণ উপবেশন করিয়া তাহা শ্রবণ করিতেছেন। শূদ্রদিগের সেখানে যাইবার অধিকার নাই। সূর্য্য অস্ত হইলে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ও ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন সমাজের ঘরে প্রকাশ্য বেদীতে বসিলেন। এখানে ব্রাহ্মণ শূদ্র সকল জাতিরই সমান অধিকার ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন উপনিষৎ ব্যাখ্যা করিলেন এবং বিদ্যাবাগীশ মহাশয় বেদান্তদর্শনের মীমাংসা বুঝাইতে লাগিলেন। বেদীর সম্মুখে কৃষ্ণ ও বিষ্ণু দুই ভাই মিলিয়া সমস্বরে ব্রহ্মসঙ্গীত গান করিলেন।" (আত্মজীবনী, ২৫-২৬ পৃঃ)।

"আবার একদিন যাইয়া দেখি যে, সেই ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের সহযোগী ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন অযোধ্যাপতি রামচন্দ্রের অবতার হওয়ার বিষয় প্রতিপন্ন করিতেছেন। ইহা আমার অতিশয় অসঙ্গত ও ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরুদ্ধ বোধ হইল। আমি ইহার প্রতিবিধান করিবার জন্য প্রকাশ্যে বেদপাঠের ব্যবস্থা করিয়া দিলাম এবং বেদী হইতে অবতারবাদের বর্ণনা নিবারণ করিলাম।" (৩৪ পৃঃ)

রাজনারায়ণ বসু স্বীয় আত্মচরিতে লিখিয়াছেন;—

"প্রাথমিক ব্রাহ্মেরা লৌকিকাচার পালন করা ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন।"

তাহার দৃষ্টান্ত,—তাঁহার পিতা নন্দকিশোর বসু "বেদান্তপ্রতিপাদ্য নিরাকারবাদে বিশ্বাস করিতেন"; আবার,

"কোষাকুষি লইয়া রোজ পূজা আহ্নিক করিতেন, আর একটী প্রেকের উপর তুলসীর মালা ঝুলানো থাকিত। রামমোহন রায়ের অনুবর্ত্তী ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির বাটীতে যাইলে তাহা পরিয়া যাইতেন। (৯, ১০ পৃঃ)

ইহারা ইহুদীজাতীয় খৃষ্টশিষ্যদিগের ন্যায় লৌকিকাচার উল্লঙ্ঘন করা দূষণীয় বিবেচনা করিতেন।

রামমোহন রায় বেদান্ত অর্থাৎ উপনিষৎকে ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। পুরাতন বাইবেলের সহিত খৃষ্ট ধর্ম্মের যে সম্বন্ধ, বেদান্তের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের সম্বন্ধও কতকটা সেইরূপ। কিন্তু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিতেছেন,

"প্রথমে বেদ ধরিলাম, সেখানে ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপন করিতে পারিলাম না, তাহার পরে প্রামাণ্য একাদশ উপনিষৎ ধরিলাম, কি দুর্ভাগ্য! সেখানেও ভিত্তি স্থাপন করিতে পারিতেছি না।" (১০২ পৃঃ)

"দেখিলাম যে, আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়ই তাহার পত্তনভূমি।" (১০২ পৃঃ)

এই প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়াই তিনি উপনিষদের সারনিষ্কর্ষমূলক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। তাহার মনোগত অভিপ্রায় এই ছিল যে, ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজ হিন্দু প্রণালীতে সার্ব্বভৌমিক একেশ্বরবাদ সাধনের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি হইয়া উঠিবে।

শুধু সাধনপ্রণালীতে নয়, সামাজিক আচার ব্যবহারেও দেবেন্দ্রনাথ প্রাচীন ধারার সহিত যোগসূত্র ছিন্ন করিবার বিরোধী ছিলেন। তিনিই উপবীত ত্যাগের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন, এবং নিজ বাটীর প্রতিমা পূজা বন্ধ করিয়া দেন। কিন্তু তাঁহার ব্রাহ্মসমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবার পরেও

আঠার বৎসর কাল কেবল ব্রাহ্মণ বংশের ব্রাহ্মেরাই আচার্য্যের কার্য্য করিতেন। ১৮৬২ সনের ১লা বৈশাখ কেশবচন্দ্র সেন, প্রথম অব্রাহ্মণ, মহর্ষি কর্তৃক আচার্য্য পদে বৃত হন। তিনি স্বীয় পরিবারের উপনয়ন এবং সবর্ণ বিবাহ প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছিলেন। তাঁহার এক পৌত্রীর বিবাহে বরের হাতে উপবীত রাখা হইয়াছিল, ইহা আমি বরের পিতার মুখেই শুনিয়াছি। আদি সমাজের বিবাহ-পদ্ধতি রাজবিধিতে হিন্দু বিবাহ রূপে সিদ্ধ। ১৮৭১ সনে যখন কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ সংস্কারপ্রয়াসী ব্রাহ্মগণ স্বতন্ত্র বিবাহ আইনের আন্দোলন উপস্থিত করেন, আদিসমাজের নেতৃবর্গ তখন এই প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অন্যতম যুক্তি এই ছিল,--প্রস্তাবিত আইন বিধিবদ্ধ হইলে তাহার ফলে ব্রাহ্মগণ হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে, এবং উভয় সমাজের মধ্যে সুস্পষ্ট ব্যবধান ঘটিবে। তাঁহাদের মতে ব্রাহ্মেরা হিন্দু, এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মেরই একটী রূপ অথবা শাখা। এই সময়ে দেবেন্দ্রনাথের সহযোগী ও বন্ধু রাজনারায়ণ বসু "হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা" বিয়য়ে বক্তৃতা করেন। তৎপ্রসঙ্গে তিনি আত্মচরিতে লিখিয়াছেন; "আমি আপনাকে হিন্দু ও ব্রাহ্মধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্মের সমুন্নত আকারমাত্র মনে করি।" দুই পুরুষ অতিক্রান্ত হইবার পরে আমরা যদি এই মত যুক্তি-সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করি, তবে আমাদিগকে বাধ্য হইয়াই স্বীকার করিতে হইবে, যে, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠার মূলে একটা অহেতুক বিদ্রোহ বিদ্যমান ছিল।

দ্বিতীয় যুগ

আদি ব্রাহ্মসমাজের কথা ছাড়িয়া দিয়া এখন নিজেদের কথা বলি। আমার বক্তব্যে ভারতবর্ষীয় ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ দুই-ই দৃষ্টিপথে

থাকিবে। আটত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে বাঁকিপুরে ভক্তিভাজন উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় ও কান্তিচন্দ্র মিত্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "আপনাদের ও আমাদের মধ্যে মতামত পার্থক্য কি?" উপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, "মতগত পার্থক্য কিছুই নাই; যাহা আছে, ব্যক্তিগত।" কান্তি বাবু এ কথায় সায় দিলেন।

ব্রাহ্মগণ হিন্দু কি না?

ব্রাহ্মগণ হিন্দু কি না, এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের সমুন্নত আকার মাত্র কি না, এই দুইটি প্রশ্ন যদি শুধু বিতর্ক সভায় আলোচ্য বিষয় হইত, তবে ভাবনা ছিল না। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের বাঁচিয়া থাকিবার হেতু (raison d'etre) এই দুইয়ের সুমীমাংসার উপরে নির্ভর করিতেছে। ব্রাহ্মধর্ম্মের স্বরূপ কি? ইহা সর্ব্বজনীন, না একটী সাম্প্রদায়িক উপধর্ম্ম? ব্রাহ্মধর্ম্মের অভিব্যক্তিতে শুধু ভারতীয় বেদ বেদান্তের প্রভাব বিদ্যমান? উহাতে কোরাণের অনুপ্রাণন নাই, বাইবেলের মহামূল্য অবদান নাই? একমেবাদ্বিতীয়ম্ পরব্রহ্মের উপাসনাকে তপোবন হইতে আনিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে উপাসকমণ্ডলীর মধ্য দিয়া তাহাকে মূর্ত্ত করিয়া তুলিতে হইবে, এই প্রয়োজন দ্বারা প্রণোদিত হইয়াই রামমোহন ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি সমবেত, সামাজিক উপাসনার পরিকল্পনা কোথায় পাইলেন? খৃষ্টীয় ভজনালয় হইতে নয় কি? সত্য বটে, তৎপ্রতিষ্ঠিত উপাসকমণ্ডলী অনিবার্য কারণেই হিন্দু একেশ্বরবাদী লইয়া গঠিত হইয়াছিল। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ চিরদিন হিন্দু-সমাজের অন্তর্ভুক্ত কিংবা হিন্দুসমাজের শাখাপ্রশাখায় পরিগণিত হইয়া থাকিবে, তাঁহার সুদূরব্যাপী দৃষ্টিপরিধির মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের কি এই অনুজ্জ্বল ভবিষ্যৎই উদ্ভাসিত হইয়াছিল? বিশ্ববিশ্রুত অধ্যাপক

ব্রজেন্দ্রনাথ শীল বলেন, যে, ব্রাহ্মসমাজে হিন্দু, মুসলমান, ইহুদী, খৃষ্টীয়ান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মচারী উপাসকেরা এক নিরাকার ঈশ্বরের মিলিত উপাসনার সাহায্যে স্বীয় স্বীয় ধর্ম্মের তত্ত্ব ও সাধন প্রগাঢ়রূপে উপলব্ধি করিয়া সার্ব্বভৌমিক মিলন-কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হইবে, ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনে এইটাই রামমোহন রায়ের প্রধান অভিপ্রায় ছিল। আমাদিগের ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য, আমরা সার্ব্বভৌমিকতার দিকে অগ্রসর হইতেছি, না জাতীয়তার আবর্ত্তে পড়িয়া পশ্চাতে হটিয়া যাইতেছি। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্ততঃ দুই জন বিশিষ্ট মুসলমান সভ্য ছিলেন; আর দুই জনকে সামাজিক উপাসনায় নিয়মিত রূপে যোগ দিতে দেখিয়াছি। কেহ কেহ এখনও যোগ দিয়া থাকেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রচারশক্তি প্রধানতঃ সহরগুলিতেই পর্যবসিত হইতেছে, অতি অল্পসংখ্যক গ্রামেই ব্রাহ্মধর্ম্মের বার্ত্তা পঁহুছিয়াছে। অনুন্নত শ্রেণীর হিন্দুদিগের মধ্যে পাঁচ ছয়টী গ্রামে প্রচারের কার্য্য চলিতেছে; খাসিয়া ও গারো পাহাড়েও প্রচার কেন্দ্র আছে। কিন্তু এই বঙ্গদেশে সংখ্যা-ভূয়িষ্ঠ মুসলমান সমাজকে ব্রাহ্মধর্ম্মের বাণী স্পর্শই করে নাই, বহুল প্রচার বা mass contact তো দূর-দুরান্তরের কথা। আমি জিজ্ঞাসা করিতে চাই, ব্রাহ্মগণ যদি "আমরা হিন্দু, আমরা হিন্দু"—এই প্রকার ঘোষণা করিয়া বেড়ান, তবেই কি রামমোহন রায়ের মুখ্য অভিপ্রায় সুসিদ্ধ হইবে, এবং ভারতে এক উদার সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের সুশীতল শান্তি-বারিতে সাম্প্রদায়িক খাণ্ডবদাহ নির্ব্বাপিত হইয়া একটী মহাজাতি গড়িয়া উঠিবে? Quo vadis—ব্রাহ্ম, তুমি কোন্ পথে যাইতেছ?

যে-সকল ব্রাহ্ম আপনাদিগকে হিন্দু বলিবার পক্ষপাতী, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেককে আমি সাতিশয় শ্রদ্ধা করি; কেন না, তত্ত্বের বিচারে তাঁহাদিগের এই দিকে ঝোক থাকিলেও তাঁহারা ব্যবহারিক জীবনে ব্রাহ্ম

ধর্ম্মের আদর্শকে ম্লান হইতে দেন নাই; তাঁহারা দ্বিধারহিত হইয়া পুত্র কন্যার অসবর্ণ বিবাহ দিয়াছেন। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি, আদি সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার পরেও উন্নতিশীল ও সংস্কারপ্রিয় ব্রাহ্মেরা অনেকেই অসবর্ণ বিবাহের বিরোধী ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের অগ্রণীদিগের মধ্যে বহু স্থলেই ব্রাহ্মণের সহিত ব্রাহ্মণের, কায়স্থের সহিত কায়স্থের, বৈদ্যের সহিত বৈদ্যের আদানপ্রদান বহাল রাখিবার রীতি অচলায়তনে পরিণত হইয়াছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে আমি সর্ব্বজনশ্রদ্ধেয় কায়স্থকুলাগত এক সুবিদিত ব্যক্তির কন্যার সহিত, একটী শিক্ষিত, সচ্চরিত্র, কর্ম্মনিষ্ঠ, দর্শনীয় ব্রাহ্মণ যুবকের বিবাহ সম্বন্ধ উপস্থিত করিয়াছিলাম। তিনি যুবকটীকে জানিতেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ বলিয়াই আপত্তি করিলেন, এবং কয়েক মাস পরে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর এক কায়স্থ ছাত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিলেন। ইঁহাদিগের বংশধরগণের মধ্যে এখনও কুলক্রমাগত আচার অচল রাখিবার আবেশ অব্যাহত আছে।

সেকালে এই সকল সবর্ণ বিবাহ ১৮৭২ সনের ৩ আইনমতে রেজিষ্ট্রী হইত, এবং বরকন্যা "আমি হিন্দু নই" বলিয়া ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করিতেন। ৩ আইনের একটা গুরুতর ত্রুটি এই অভাবাত্মক ঘোষণা; উহা যদি শুধু ব্রাহ্মবিবাহকে রাজদ্বারে বৈধ করিবার অভিপ্রায়ে প্রণীত হইত, এবং ঘোষণাপত্রে "আমি ব্রাহ্ম", শুধু এইটুকু থাকিত, তবে সকল গোল চুকিয়া যাইত। বিগত পঁচিশ ত্রিশ বৎসর ধরিয়া তরুণ ব্রাহ্মদিগের মধ্যে "আমি হিন্দু নই"—এই প্রকার ঘোষণার বিরুদ্ধে অসন্তোষ সঞ্চিত হইয়া আসিতেছে; কেহ কেহ রেজিষ্ট্রী না করিয়া ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে বিবাহ করিয়াছেন। সম্প্রতি ব্রাহ্মসমাজের পুত্র-কন্যারা গৌরের আইনের "আমি হিন্দু" এই ঘোষণার সুবিধা লইয়া দাম্পত্যপাশে আবদ্ধ হইতেছেন। এই আইন ব্রাহ্ম ও অব্রাহ্মের মধ্যে

পরিণয়-সম্পাদনের পথ সুগম করিয়া দিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের মরণের পথও প্রশস্ত হইতেছে, ইহাতে আমার লেশমাত্রও সংশয় নাই।

হিন্দুধর্ম্ম ও ব্রাহ্মধর্ম্ম এক নহে

সত্যসত্যই কি হিন্দুধর্ম্ম ও ব্রাহ্মধর্ম্ম এক ও অভিন্ন? ব্রাহ্মধর্ম্মের স্বরূপ ব্রহ্মোপাসনা। হিন্দুধর্ম্মের স্বরূপ কি? উহাতে বর্ণাশ্রমবিভাগ এবং বর্ণাশ্রমত্যাগ, সাকারবাদ এবং নিরাকারবাদ, একেশ্বরবাদ এবং বহুদেববাদ, বেদের অপৌরুষেয়তা স্বীকার এবং বেদনিন্দা, আস্তিকতা এবং নাস্তিকতা—উহাতে কি না আছে? হিন্দুধর্ম্মের সংজ্ঞা কি? আচার্য্য শীলকে একদা এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। যত দূর স্মরণ আছে, তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, "যাহাদিগের মন্দিরে প্রবেশ করিবার অধিকার আছে, তাহারাই হিন্দু।" হরিজন-আন্দোলন দেখাইয়া দিতেছে, কোটি কোটি হিন্দু অদ্যাপি উক্ত অধিকারে বঞ্চিত রহিয়াছে। পুরীতে সমুদ্রতীরে চৈতন্য-সম্প্রদায়ের যে আশ্রম আছে, তাহা দেখিতে যাইয়া দ্বারদেশ হইতে বিমুখ হইয়া আসিতে হইল, কারণ তথায় লিখিত আছে, মুসলমান, খৃষ্টীয়ান প্রভৃতির ন্যায় ব্রাহ্মদিগেরও মন্দিরে প্রবেশ নিষেধ। বস্তুতঃ আমি আজ পর্য্যন্ত হিন্দুধর্ম্মের একটা সর্ব্ববাদিসম্মত সংজ্ঞা পাই নাই।

হিন্দুধর্ম্ম ও ব্রাহ্মধর্ম্ম এক ও অভিন্ন না হইলে ব্রাহ্ম কিরূপে আপনাকে হিন্দু বলিতে পারেন? যদি বলেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের সমুন্নত আকার—যদিচ আমি ইহা স্বীকার করি না—অথবা একটি আর একটীর পরিণতি, তবে প্রত্যুত্তরে আপত্তি করিব যে, শিশু ও পরিণতবয়স্ক পুরুষ এক ও অভিন্ন নহে; ফুলের পরিণতি ফল; কিন্তু ফুল ও ফল অভিন্ন নহে; আম্রের মুকুলকে কেহ আম্র বলে

না। মানুষ বানর হইতে অভিব্যক্ত হইয়াছে, কিন্তু মানুষকে বানর বলিলে গালি দেওয়া হয়; ক্ষীর দুগ্ধের সারভাগ; কিন্তু চিকিৎসক রোগীকে দুধ খাইবার ব্যবস্থা দিলে কেহ তাহাকে ক্ষীর খাইতে দেয় না। ফলতঃ অভিব্যক্তির কোন সোপানই পূর্ব্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তী সোপানের সহিত এক ও অভিন্ন নহে, সর্ব্বশেষ সোপানের সহিত তো নয়ই। ঋগ্বেদের "একং সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি। অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানম্ আহুঃ"—ইনি এক হইলেও বিপ্রগণ ইহাকে অগ্নি, যম, মাতরিশ্বা প্রভৃতি নামে অভিহিত করেন—এই মন্ত্রে একেশ্বরবাদের আভাস আছে; কিন্তু ঋগ্বেদের বহুদেববাদ ও উপনিষদের ব্রহ্মবাদ কি এক? অঙ্কুর ও পরিণত মহীরুহের মধ্যে ব্যবধান যে অপরিসীম!

হিন্দুর সংজ্ঞা

হিন্দু কে? সম্প্রতি এই প্রশ্নের তিনটী উত্তর পাওয়া যাইতেছে। প্রথম, যে হিন্দুধর্ম্ম আচরণ করে, অথবা যাহার ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম, সে হিন্দু। দ্বিতীয়, যে হিন্দুকুলে জাত, সে হিন্দু। তৃতীয়, ভারতবর্ষে যাহার জন্ম হইয়াছে, সে হিন্দু। শুনিয়াছি, মার্কিন কানাডা প্রভৃতি দেশে মুসলমানও হিন্দুনামে খ্যাত।

ব্রাহ্ম বিবাহের আইন

যে সকল প্রবীণ ব্রাহ্মেরা আপনাদিগকে হিন্দু বলিতে ভালবাসেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই দ্বিতীয়, অর্থাৎ হিন্দুকুলে উদ্ভূত, এই অর্থে শব্দটী ব্যবহার করেন। অবিসংবাদী সত্যের বিরুদ্ধে আপত্তি চলে না। কিন্তু যাঁহারা ৩ আইনের I do not profess the Hindu religion, এই বাক্যে আপত্তি করেন, তাঁহাদের আপত্তির হেতু কি? পূর্ণ বাক্যটী

এই—I do not profess the Christian, Jewish, Hindu, Muhammadan Parsi, Buddhist, Sikh or Jaina religion. বিবাহার্থীকে বলিতে হইতেছে, 'আমি হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী নই, অথবা আমার ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম নয়'। ইহাতে আপত্তি করিলে ব্রাহ্মধর্ম্মের মর্য্যাদা কোথায় থাকে ?

"I do not profess the Hindu religion" ইহার অর্থ, "আমি প্রকাশ্যরূপে হিন্দুধর্ম্ম স্বীকার করি না" কিংবা "আমি হিন্দুধর্ম্ম পালন করি না।" যে-ব্রাহ্ম ইহা বলিতে প্রস্তুত নহেন, তিনি নিশ্চয়ই ভাবেন, ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হইয়া তিনি হিন্দুধর্ম্মই আচরণ করিতেছেন। কোন্ হিন্দুধর্ম্ম ? বর্ণাশ্রমমূলক হিন্দুধর্ম্ম,—না বর্ণাশ্রমবিদ্রোহী হিন্দুধর্ম্ম ? পৌত্তলিক হিন্দুধর্ম্ম, না অপৌত্তলিক হিন্দুধর্ম্ম ? সাধারণ লোকে বেদ পড়ে নাই ; ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকায় তাহাদিগের চিত্তের অন্ধকার দূরীভূত হয় নাই ; তাহারা তাঁহার কথায় কি বুঝিবে ? যে শব্দের একটা সুস্পষ্ট, সুনির্দ্দিষ্ট, সংশয়াতীত অর্থ নাই, তাহা ব্যবহার করিয়া শ্রোতাকে ধাঁধাঁয় ফেলা কর্ত্তব্য নহে। সোক্রাটাস বলিতেন, "চিন্তায়, ভাষায় ও কর্ম্মে শুদ্ধ না হইলে আত্মা অপূর্ণ ও বিকলাঙ্গ থাকিয়া যাইবে। যাহার চিন্তার শৃঙ্খলা নাই, কথাবার্ত্তায় স্থিরতা নাই, কার্য্যাকার্য্যের জ্ঞান নাই, সে কখনও পূর্ণজীবনের অধিকারী হইতে পারে না।" বাক্যটী প্রত্যেক ব্রাহ্মের অনুধাবনযোগ্য।

ব্রাহ্মসমাজের বিপদ

তিন আইনের প্রতি অসন্তোষ ব্রাহ্মসমাজে ব্যাপক হয় নাই। কিন্তু গৌরের আইনের আশ্রয়ে ব্রাহ্মপরিবারে দিন দিন উদ্বাহক্রিয়ার সংখ্যা বাড়িয়া চলিলে কালে উহা ব্রাহ্মসমাজের উদ্বন্ধনে পরিণত হইবে। কি মারাত্মক ব্যাধি উহাকে শনৈঃ শনৈঃ আক্রমণ করিতেছে, প্রত্যেক

ব্রাহ্মের অবহিত হইয়া তাহা চিন্তা করা উচিত। এই আইনের কৃপায় হিন্দুসমাজে অসবর্ণ বিবাহ অবাধ প্রসার লাভ করিতেছে। ব্রাহ্ম যুবকযুবতীরাও ঐ আইনের আনুকূল্যে "I profess the Hindu religion", এই ঘোষণা করিয়া বিবাহ করিতেছেন। তাহাদিগেরই বা অপরাধ কি ? আমরা পুত্রকন্যাদিগের অন্তরে ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলতত্ত্ব মুদ্রিত করিয়া দিতে পারি নাই ; অনেক পরিবারের ধর্ম্মশিক্ষার কোন ব্যবস্থাই নাই। কত স্থলে কন্যার বিবাহ দিতে যাইয়া বর হিন্দু, মুসলমান, না খৃষ্টীয়ান, পিতামাতা তাহা বিচার করেন না। যদি অর্দ্ধ শতাব্দী এই প্রকার ধারা বহিতে থাকে, তবে ব্রাহ্মসমাজ দ্বিতীয় শতক উত্তীর্ণ হইতে না হইতে ইহাকে কেহ চিনিতেই পারিবে না।

প্রাচীন সংস্কারের মোহ

বহু বৎসর হইল হিন্দু-পুনরুত্থান আন্দোলনের অন্যতম নেতা পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি এক ব্রাহ্ম আচার্য্যকে বলিয়াছিলেন, "হিন্দুধর্ম্ম জাতি-ভেদের সাহায্যে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মকে নির্ম্মূল করিয়াছে ; ব্রাহ্মধর্ম্মকেও জাতিভেদের সাহায্যে গ্রাস করিবে।" উক্তিটী ঐতিহাসিক সত্য কি না, বিচার করিবার প্রয়োজন নাই ; কিন্তু ইহাতে একটা বিপদের ইঙ্গিত আছে। ব্রাহ্মগণ এক শত দশ বৎসরেও জাতিত্বের মমতা জয় করিতে পারেন নাই। এক এক জনের সবর্ণ-প্রীতি এত দূর গড়ায়, যে তাহাতে হাস্য সংবরণ করা কঠিন হইয়া উঠে। রামগোপাল ব্রাহ্মণ-বংশীয় ব্রাহ্মের পুত্র ; তিনি সবর্ণ-ব্রাহ্মের কন্যার পাণিপীড়ন করিবার অভিলাষ করেন। কন্যার পিতা ব্রাহ্মণ কুলে জাত হইলেই হইল। মাতা হীন বংশের দুহিতা হইলেও কিছু আসিয়া যায় না। স্বাজাত্য-মোহ আর কাহাকে বলে ?

ভাক্ত উদারতা

প্রাচীন সংস্কারের মোহ চূর্ণ না হইলে ব্রাহ্মসমাজের নিস্তার নাই। নানা কারণে হিন্দুসমাজে জাতিভেদের বন্ধন শিথিল হইতেছে। সেই যে "কেশব সেন, উইল সেন ও ইষ্টিসেনের" যুগে ভাঙ্গন ধরিয়াছিল, তাহা উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে। রাজনৈতিক প্রয়োজনের তাড়নায় এক্ষণে হিন্দু মুসলমানের প্রকাশ্যে পানাহারও একটা সুপরিজ্ঞাত উৎসবের মধ্যে গণ্য হইতেছে। অন্নগত জাতিভেদ এখন নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না; বিবাহগত জাতিভেদও বিলোপের অভিমুখে চলিয়াছে। গৌরসংহিতা বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্ব হইতে হিন্দুমতে অসবর্ণ বিবাহ শুরু হইয়াছিল; ঐ সংহিতার অনুবলে এক্ষণে উহা হু হু করিয়া বাড়িয়া অদূর ভবিষ্যতে যে প্রবল বন্যার আকার ধারণ করিবে, তাহার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। ব্রাহ্মগণ যদি "আমরা হিন্দু" এই রকম অঙ্গীকার করিয়া পরিবার রচনা করিতে আরম্ভ করেন, তবে ব্রাহ্মসমাজের স্বাতন্ত্র্য কি-সে রক্ষা পাইবে? যাঁহারা বলেন, ব্রাহ্মসমাজের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের প্রয়োজন নাই, তাঁহাদের সহিত তর্ক করা বৃথা। ব্রাহ্মসমাজের কাজ ফুরায় নাই। এক শতাব্দীতে যে-টুকু হইয়াছে, যাহা বাকি আছে, তাহার তুলনায় সেটুকু কিছুই নয়। আমরা যেন ভুলিয়া না যাই খৃষ্টধর্ম্ম এক সহস্র বৎসরেও সমগ্র ইয়ুরোপ জয় করিতে পারে নাই।

আমি গোঁড়ামির সমর্থন করিতেছি না। গোঁড়ামি, ধর্ম্মান্ধতা (bigotry), অপরের মতের প্রতি অসহিষ্ণুতা (intolerance) চিরকালই নিন্দনীয়। কিন্তু ঔদার্য্য ও ঔদাস্য এক কথা নহে। যে-ব্যক্তি স্বীয় ধর্ম্মের স্বরূপ অবগত হইয়া তাহাতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, উদারতা প্রকৃত প্রস্তাবে তাহার পক্ষেই শোভা পায়; কেন না, তাহার উদারতা অজ্ঞানতা বা উপেক্ষার ফল নহে। যাহার কোন ধর্ম্মেই আন্তরিক প্রীতি ও অবিচলিত নিষ্ঠা নাই, তাহার ঔদার্য্য সত্যমিথ্যার বিভেদ হইতে প্রসূত নহে, কাজেই তাহা অর্থহীন। এই প্রসঙ্গে আরও একটু বলিবার আছে। প্রত্যেক আন্দোলনে গোঁড়া লোকেরাই তাহাকে সফল করিয়া তোলে। সেণ্ট পল খৃষ্টীয়ানদিগকে ইহুদী বিধির কারাগার হইতে উদ্ধার করিবার পরে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন, যে তাহারা যেন দেবপূজার সহিত প্রসাদ গ্রহণ প্রভৃতি কোনও সম্পর্ক না রাখে। রোমক সম্রাটের মূর্ত্তির নিকটে শির অবনত করিবে না, এই সঙ্কল্প রক্ষা করিতে যাইয়া শত শত খৃষ্টান প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছে। বিশেষ বিশেষ অবস্থায় চরমপন্থীরাই এক একটা প্রচেষ্টাকে বাঁচাইয়া রাখে, জয়যুক্ত করে। উভচর জীবের দ্বারা ধর্ম্ম বা সমাজ যথার্থ উপকৃত হয় না। নিজের ধর্ম্মের প্রতি গোঁড়া, অপরের প্রতি উদার— ইহাই গোঁড়ামি ও উদারতার প্রকৃত সামঞ্জস্য।

সামাজিক উপাসনার প্রয়োজনীয়তা

ভারতে একেশ্বরবাদ রামমোহনের নূতন আবিষ্কার নয়, কিন্তু এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের সমবেত উপাসনার জন্য ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের কার্য্যটি অভিনব। উপনিষদে উপাসকমণ্ডলীর নিদর্শন পাওয়া যায় না; বরং সামাজিক আরাধনা যে প্রচলিত ছিল না, তাহাই সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে। বৃহদারণ্যকের যে সুপ্রসিদ্ধ প্রার্থনাটী পরিবর্ত্তিত আকারে ব্রাহ্মসমাজে গৃহীত হইয়াছে, তাহা উপাসকের ব্যক্তিগত প্রার্থনা— অসতো সদ্গময়, "অসত্য হইতে আমাকে সত্যেতে লইয়া যাও,"— ইহা মণ্ডলীর প্রার্থনা নহে। আর্য্যভারতের পূজাপদ্ধতি প্রায় সকলই স্বতন্ত্র, ব্যক্তিসর্ব্বস্ব individualistic। ঈশা শিষ্যদিগকে সমবেত পূজার (collective worship-এর) প্রার্থনা শিক্ষা দিয়াছিলেন— "আমাদের স্বর্গস্থ পিতা...আমাদিগকে প্রলোভন হইতে রক্ষা

কর।" ইসলামের যে-প্রার্থনাটী কোরাণের শিরোদেশে স্থাপিত হইয়াছে, যাহা মুসলমানেরা প্রতিদিন সজনে নির্জ্জনে জপ করিয়া থাকে, তাহাতে আছে, "আল্লা, আমরা তোমারই সেবক, এবং তোমারই সাহায্য ভিক্ষা করি। আমাদিগকে সুপথে পরিচালিত কর।" সমবেত উপাসনার স্বরূপ আজিও আমাদের মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবেশ করে নাই। ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত উপাসনার প্রভেদ হিন্দু মুসলমানের ইতিহাসে প্রকট হইয়া রহিয়াছে। এক একটা পর্ব্বোপলক্ষে এই সহরেই ত্রিশ হাজার চল্লিশ হাজার মস্লেম একত্র ঈশ্বরের আরাধনা করে। জুম্মা নমাজ তাহাদিগের ঐক্যবন্ধনের কি পরম সহায়, হিন্দুগণ বারংবার তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছে। পক্ষান্তরে আত্মগত ধর্ম্মসাধন হিন্দুজাতির "কার্য-সাধিকা সংহতি"তে যুগ যুগান্তর ধরিয়া বাধা দিয়া আসিতেছে। আমরা "পূর্ণ স্বরাজ" কামনা করি; আশা করিতেছি, অচিরে ভারতের শাসন সংরক্ষণের যাবতীয় কর্ত্তব্য আমাদিগের হস্তে ন্যস্ত হইবে। কিন্তু কি ব্যবসা বাণিজ্য, কি নগর-পালন, কি রাষ্ট্রসেবা, কি জনহিত সাধন, যে দিকে তাকাই, দেখি, সংহত হইবার, দশজনে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিবার, যৌথ প্রচেষ্টাকে সফল করিয়া তুলিবার শিক্ষা, দীক্ষা ও অভিজ্ঞতা হইতে এখনও আমরা কত দূরে রহিয়াছি আমরা শিমুলতুলার মত ফাটিয়া চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতে জানি, জমাট বাঁধিতে জানি না; কেন্দ্রাপসারিণী শক্তি আমাদিগকে ব্যষ্টির কল্যাণকর্ম্ম হইতে দূরে টানিয়া লইয়া যায়; কেন্দ্রাভিগামিনী শক্তি আমাদিগের উপরে তেমন কাজ করে না। এই জাতীয় দুর্ব্বলতা নিরাকরণের যতগুলি উপায় আছে, সামাজিক উপাসনা তন্মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফলপ্রসূ। রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্ট-ডীডে এই যে বাক্যটী সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন—

"ব্রাহ্মসমাজে শুধু সেইরূপ উপদেশ, ব্যাখ্যান, বক্তৃতা, প্রার্থনা কিংবা সঙ্গীত হইবে, যাহা বিশ্বের স্রষ্টা ও পাতার ধ্যানের অনুকূল; যাহা উদারতা, সুনীতি ভগবদ্ভক্তি, পর হিতৈষণা ও ধর্ম্মভাব উদ্দীপনের সহায়; এবং যাহা বিভিন্ন ধর্ম্মবিশ্বাসী লোকদিগের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন দৃঢ়তর করিবে।"

—এই বাক্যটীর মূল্য কত, তাঁহার স্বদেশীয়েরা আজিও তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারে নাই। তাঁহার অনুবর্ত্তী আমরাই কি পারিয়াছি? যদি পারিতাম, তবে ব্রাহ্মসমাজের প্রাণশক্তি যেখানে নিহিত, সেই সম্মিলিত উপাসনার প্রতি দিন দিন উদাসীনতা বাড়িয়ে চলিয়াছে কেন? তবে ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিক কর্ত্তব্য ও বৈষয়িক কর্ত্তব্য, এই দুইয়ের মধ্যে বিভেদ রেখা ক্রমশঃ স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে কেন?

ঐ বাক্যটীতে ধর্ম্মের অন্তঃসত্ত্ব পরমাত্মার সহিত আত্মার সম্বন্ধ এবং ধর্ম্মের বহিঃপ্রকাশ, মানবের নৈতিক জীবন, আত্মশাসন, কর্ম্মযোগ—এই সমুদায় সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে! ক্ষুদ্র বট বীজে যেমন ভবিষ্য মহাবৃক্ষ অনুস্যূত থাকে, তেমনি এই বাক্যটীতে বর্ত্তমান ভারতের বহুমুখী, শাখা-প্রশাখায় প্রবহমানা কর্ম্মধারার উৎস সূচিত হইয়াছে। প্রত্যেক মনুষ্যের পরিপূর্ণ বিকাশ, এবং শতধা বিচ্ছিন্ন, বিরোধী ধর্ম্মচারী জাতিসমূহের একত্র সংঘবদ্ধ হইবার পন্থা—এই উভয়ের নিগূঢ় বৈজিক শক্তি ব্রাহ্মসমাজের আদের্শে নিহিত আছে।

ব্রাহ্মধর্ম্ম সার্ব্বভৌমিক

এই ধর্ম্ম কি কোনও ethnic religion, কোনও জাতিবিশেষের ধর্ম্ম, কোনও বিভেদমূলক ধর্ম্মের নামে আখ্যাত হইবার যোগ্য? আমরা যেন ভুলিয়া না যাই, অভ্রান্ত গুরুবাদ ও অভ্রান্ত শাস্ত্রবাদ হইতে মুক্ত একেশ্বরের

উপাসনার ভিত্তিতে সমাজ সংগঠনের প্রচেষ্টা ও পরীক্ষা একান্তই আধুনিক, সবে শতাব্দীকাল হইল এই উদ্যম আরম্ভ হইয়াছে। পৃথিবীর তিনটী প্রধান ধর্ম্ম মানবকেন্দ্রিক। মহাপুরুষ পূজা এ দেশের অস্থি মজ্জায় রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। এই বিংশ শতাব্দীতেও শিক্ষিত শ্রেণীর কত কত জ্ঞানী গুণী বিশিষ্ট ব্যক্তি মহাপুরুষবাদ প্রচার করিতেছেন। বিধাতা ব্রাহ্মসমাজের প্রতি কি গুরুভারই অর্পণ করিয়াছেন! এখন কি ব্রাহ্মদিগের নিদ্রিত থাকিবার সময়? তাঁহারা যেন স্মরণ রাখেন, সদ্ধর্ম্মও অন্তর্হিত হয়। মধ্যযুগে ভারতের সাধু মহাজনেরা যে এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরোপাসনার তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহার সাধকমণ্ডলী কোথায় গেল? তাহা প্রাচীন সমাজকে নূতন করিয়া গঠন করিতে পারিয়াছিল কি? এই বঙ্গদেশেই শ্রীহট্ট অঞ্চলে, রামমোহন রায়ের প্রায় সমকালে, সাধু রামকৃষ্ণ দাস পূর্ণ ব্রহ্মের আরাধনা সাধন ও প্রচার করিয়াছিলেন। বিল্বমঙ্গলের মঠ অদ্যাপি তাহার পুণ্য স্মৃতি বহন করিতেছে। সেখানে প্রতিদিন সায়ংকালে তাঁহার শিষ্যেরা কীর্ত্তনের ভূমিকাতেই "আর কি দেখ রে, সত্য শুদ্ধ শান্ত মনে সচৈতন্যে পূর্ণ ব্রহ্মে ডাক"—রামকৃষ্ণ-রচিত এই সঙ্গীতটি গান করেন। অথচ প্রত্যহ গুরুর সমাধির সম্মুখে, পূজা, ভোগ, আরতি চলিতেছে, এবং মঠের বৈষ্ণবেরা রথে রামকৃষ্ণের খড়ম রাখিয়া রথযাত্রার পর্ব্ব উদ্‌যাপন করিতেছেন।

ধর্ম্মের অন্তর্ধান ও তাহার কারণ

আচার্য নাগসেন বলেন, সধর্ম তিন প্রকারে অন্তর্হিত হয়।

প্রথম, অধিগম অর্থাৎ সম্যক্ জ্ঞানের অন্তর্ধান।

দ্বিতীয়, প্রতিপত্তি অর্থাৎ ধর্ম্মানুযায়ী আচরণের অন্তর্ধান।

তৃতীয়, লিঙ্গ, চিহ্ন বা রূপের অন্তর্ধান।

প্রথমতঃ, কোনও ধর্ম্মের অনুবর্ত্তীদিগের মধ্যে যদি সেই ধর্ম্মের স্বরূপ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান (intellectual grasp) না থাকে, তবে তাহা কালে অন্তর্হিত হইবে। প্রত্যেক ধর্ম্মের কয়েকটী মূল মত, fundamental ideas, অথবা basic principles থাকে। একজন খৃষ্টীয়ান বা মুসলমানকে জিজ্ঞাসা কর, তাহার ধর্ম্মের মূল মত কি, সে তৎক্ষণাৎ তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিবে। প্রত্যেক ব্রাহ্মের যদি নিজের ধর্ম্ম সম্বন্ধে সেইরূপ স্পষ্ট জ্ঞান থাকে, তবেই ভাল, নতুবা বিপদ ক্রমেই ঘনাইয়া আসিবে। Dogma বা মতের উপর অত্যধিক জোর দিয়া ধর্ম্মধ্বজীরা জগতে বিস্তর রক্তারক্তির ব্যাপার সংঘটন করিয়াছে; কিন্তু dogmaর-ও প্রয়োজন আছে।

দ্বিতীয়তঃ, প্রতিপত্তি বা ধর্ম্মানুযায়ী আচরণ অন্তর্হিত হইলে যে ধর্ম্ম অন্তর্হিত হইবে, তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে। যাহাদের ধর্ম্ম ওষ্ঠাগ্রে লাগিয়া আছে, হৃদয়কে স্পর্শ করে না, উদ্দাম বাসনাকে সংযত করে না, জীবন যাত্রায় কাজে আইসে না, সে ধর্ম্ম কোথায়, কোন্ রূপের মধ্য দিয়া আপনাকে প্রকাশ করিবে? আমি নিজেই আমার ধর্ম্মকে শ্রদ্ধা করি না, অপরে কেন আমাকে দেখিয়া তাহাকে শ্রদ্ধা করিবে ও তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইবে? ব্রাহ্মসমাজের মুখ কোন্ দিকে ফিরিতেছে, ব্রাহ্মদিগের চিত্তে কোন্ চিন্তা প্রভাব বিস্তার করিতেছে, তাহারা কাহাকে বেশী খাতির করে, কোন্ বস্তুকে অধিক মর্য্যাদা দেয়, লোকে এই সমুদায় লক্ষ্য করিবেই। প্রতিপত্তি বিহনে কোন ধর্ম্মই বাঁচিয়া থাকিতে পারে না, ইহা দিবালোকের ন্যায় সত্য।

তৃতীয়তঃ, লিঙ্গ বা রূপের অভাবে, characteristics বা differentiaর অভাবে ধর্ম্ম অন্তর্হিত হয়। আমি differntia শব্দটীর প্রতি

আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। যাহা এক জাতীয় বস্তুকে অপর জাতীয় বস্তু হইতে পৃথক্ করে, তাহাই সেই বস্তুটীর differentia, লিঙ্গ বা রূপ। লিঙ্গ দুই শ্রেণীর, বাহ্য এবং আভ্যন্তরীণ বা বা আধ্যাত্মিক। ব্রাহ্মদিগের জটা গেরুয়া, ডোর কৌপিন, লুঙ্গী, চোগা চাপকান, হ্যাট কোট প্রভৃতি বাহ্য বেশ বা চিহ্ন নাই। থাকা উচিত আভ্যন্তরীণ চিহ্ন। এক সময় ছিল, যখন লোকে ব্রাহ্মকে দেখিলেই চিনিয়া ফেলিত। ব্রাহ্মের কথাবার্ত্তা চালচলন, কাজ কর্ম্ম মেলামেশা — সবটাতেই বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যাইত। তাঁহার জ্বলন্ত বিশ্বাস, ধর্ম্মনিষ্ঠা, সত্যানুরাগ, পবিত্রতার প্রতি অবিচলিত প্রীতি তাঁহাকে জনসমাজে চিহ্নিত করিয়া রাখিত। এখন এই আভ্যন্তরীণ চিহ্নটী দৃষ্টিপথে পড়ে কি না, ইহাও আমাদিগের চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। অন্য ধর্ম্মের সহিত তুলনায় ব্রাহ্মধর্ম্মের differentia কি, এ বিষয়ে সম্যক্ বোধ অত্যাবশ্যক। ব্রাহ্ম চরিত্রের লক্ষণগুলি ব্রাহ্মধর্ম্মের আধ্যাত্মিক রূপ,— ব্যক্তিগত ও সামাজিক উপাসনা, নিত্য ও নৈমিত্তিক উৎসব, জনসেবাদি ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্যে আত্মনিয়োগ—এই সমুদায় হইতে নিঃসৃত হইয়া থাকে। যদি কালক্রমে এমন ঘটে যে, সামাজিক উপাসনায় ভাটা পড়িতে পড়িতে মন্দির শূন্য হইল, উহাতে চামচিকার উপনিবেশ বসিল, দ্বারে মাকড়সার জাল পড়িল, দেয়াল ধসিয়া পড়িতে লাগিল, ঘট স্থাপন করিয়া দুর্গোৎসব করার মত নমোনমঃ করিয়া এক বেলায় মাঘোৎসব সম্পন্ন হইল,—আমি দৃষ্টির বহির্ভূত ভবিষ্যতের কাল্পনিক চিত্র দিতেছি—তবে না বলিয়া উপায় কি, যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম অন্তর্হিত হইল। সত্য ধর্ম্ম শাশ্বত, তাহার স্বরূপ কখনও বিনষ্ট হয় না; কিন্তু তাহার বাহ্যিক আচরণ এবং চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহা চক্ষুর অগোচর, সুতরাং অন্তর্হিত হইয়াছে।

উপসংহার

আমি নিরাশার কথা বলিতেছি না; ব্রাহ্মসমাজের আকাশে যে কৃষ্ণ মেঘ দেখা দিয়াছে, সে দিকে ব্রাহ্মগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই আমার লক্ষ্য। ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্তে বিধাতার লীলা পত্রে ছত্রে ছত্রে উজ্জ্বল বর্ণে লিখিত আছে। তিনি মৃতপ্রায় ব্রাহ্মসমাজকে পুনরুজ্জীবিত করিবার অভিপ্রায়ে দেবেন্দ্রনাথকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, যিনি ব্রাহ্মসমাজকে স্বাজাত্যের প্রাচীর হইতে মুক্ত করিয়া বিশ্বজনীন ধর্ম্মরূপে স্বদেশে বিদেশে প্রতিষ্ঠিত ও সম্প্রসারিত করিবার জন্য, খৃষ্ট ধর্ম্মের অভিব্যক্তিতে সেণ্ট পলের ন্যায়, কেশবচন্দ্রকে কর্ম্মক্ষেত্রে আহ্বান করিয়াছিলেন, যিনি এক নায়কত্ববিমুখ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পরিচর্য্যায় দেহ মন অর্পণ করিবার জন্য শিবনাথ, নগেন্দ্রনাথ, নবদ্বীপচন্দ্র, প্রকাশদেব প্রভৃতি কত ত্যাগী, অক্লান্তকর্ম্মা পুরুষকে আপনার বিশ্বস্ত-ভৃত্য পদে বরণ করিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন, তিনি ব্রাহ্মসমাজকে কখনই পরিত্যাগ করিবেন না। মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষ প্রবর্ত্তকঃ—পরম পুরুষই মহান্ প্রভু, ইনি অন্তঃকরণের প্রবর্ত্তক, মানবাত্মার পরিচালক, ধর্ম্মসংস্থাপক। যিনি যুগধর্ম্মরূপে ব্রাহ্মধর্ম্মকে স্থাপন করিয়াছেন, তিনিই ইহাকে রক্ষা করিবেন। আমরা যদি অযোগ্য প্রতিপন্ন হই, যোগ্যতর পরিচারক আমাদের স্থান অধিকার করিবে; বাঙ্গালী জাতি, ভারতবাসী যদি ব্রাহ্মধর্ম্মের গৌরব না বুঝিতে পারে, মনুষ্যত্বের পূর্ণতর অধিকারী, মহত্তর জাতির মধ্যে ইহা সমাদৃত হইবে; হয়তো যুগযুগান্ত পরে বিভিন্ন নামে, বিভিন্ন দেশে জ্ঞান-প্রেম পুণ্যের বিমল জ্যোতিঃ বিস্তার করিতে করিতে ভূপ্রদক্ষিণ করিয়া আবার এই ভারতবর্ষকেই নবজীবন দান করিবে।

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যাস্যাপিহিতং মুখম্
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যাধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে ॥ ঈশা। ১৫ ॥

"হে জগৎপোষক ব্রহ্ম, তোমার বিশ্বরূপ জ্যোতির্ময় পাত্র দ্বারা সত্যের মুখ আচ্ছাদিত রহিয়াছে। আমরা সত্যধর্ম্মের অনুষ্ঠানাকাঙ্ক্ষী; আমাদিগের দৃষ্টির জন্য তাহার আবরণ উন্মোচন কর।"

"WHOM THE SELF CHOOSES."

"Whom The Self Chooses."

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो
न मेधया न बहुना श्रुतेन ।
यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः ॥ कठ १।२।२२

"This Self cannot be gained by teaching the Vedas, nor by understanding, nor by much learning. He whom the Self chooses, by him the Self can be gained."

Bertrand Russel is a distinguished man of science; he is also well-known as a man of letters. In one of his latest works entitled *What I Believe*, he says: "God and immoratality......find no support in science." "I do not pretend to be able to prove that there is no God. I equally cannot prove that Satan is a fiction." God may exist; so may the Gods of Olympus or of ancient Egypt or of Babylon. But no one of these hypotheses is more probable than any other: they lie outside the region of even probable knowledge." The grounds on which the soul and the soul's immortality is ruled out of court, may be thus summed up in his own words: "Man's body, like other matter, is composed of electrons and protons, which, so far as we know, obey the same laws as those not forming part of animals or plants. The energy used in thinking seems to have a chemical origin. Mental phenomena seem to be bound up with material structure. We cannot suppose that an individual's thinktng survives bodily death." (pp. 11—14).)

These utterances of the English Charvaka of the twentieth century—a downright negation of the cherished faith of the most advanced peoples of the world—may be taken as an up-to-date illustration of the verse which I have chosen as the text of my discourse this evening. It is a warning against the pride of knowledge which not unoften blinds the brightest intellect to truths revealed to "babes and sucklings." Let us, however, seek the right interpretation of the lines. But it noted in the first place that our text does not discount knowledge or set a premium on ignorance. Judged in the light of other passages in the Upanishads, it clearly means that God is not attainable by learning or the intellect alone; some other things are indispensable for the sincere inquirer. What those other things are we shall see presently. This is not to say that knowledge has no place in spiritual culture. The *rishis* of old repeatedly emphasise the need of right knowledge for the attainment of Brahman. Says the *Mundakopanishad*:

सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा
सम्यग्-ज्ञानेन ब्रह्मचर्य्येण नित्यम् ॥३।१।५

And again,

ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वस्ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः ॥३।१।८

"This Self is always attainable by truth, by discipline, by right knowledge, and by *brahmacharyya*. When one's heart is purified through pure knowledge, he perceives that indivisible One by meditation." Assuredly the sages of ancient India did not hold that obscurantism was the way to spiritnal illumination. Nor, did they believe

that more book-knowledge was of much use to the seeker after God. In a celebrated passage of the same Upanishad (1. 1. 5.), which may be regarded as the *locus classicus* on the subject, the sacred books including the Vedas are classed as "lower sciences. while that by which the undecaying One can be known is the higher." Here there is a line of demarcation drawn between the two categories of knowledge; but while Angiras enumerates the branches of the lower category, he is silent about the distinctive characteristics of the higher. This does not, however, vitiate the division of knowledge itself; from one point of view, it holds good; many a lover of books feels at one time or another that "much study is a weariness of the flesh." "What will that erudition avail me which does not lead me to Thee ?"—so sang Maharshi Devendranath Tagore.

But it is possible for us to transcend this division. To the man of faith, approaching his studies in a spirit of reverence, every subject of inquiry is contributory to the realisation of the presence of God. The late Upadhyaya Gourgovinda Roy once remarked to me that he found Herbert Spencer's *First Prniciples*—the ablest exposition of Agnosticism—pre-eminently strengthening to his faith. There is in fact a stage in our spiritual owth in which our pursuit of knowledge may be sublimated by an undying desire to use all our "powers of mind and soul, all our external resources, as so many modes of tasting and of adoring God." Science and Philosophy, Literature and History—all bring the believing soul to the footstool of the Lord. Think for one moment of how our conception of the world we live in has been revolutionised by the

discoveries of Science. Geology, Biology and Astronomy —to name only a few—are daily making this marvellous creation of God stlll more marvellous to us. Was the earth created 4004 years before Christ? Well, "the astounding fact has now become quite clear" that there are caves in England and France which "were inhabited by men of no mean capacity from 50,000 to 250,000 years ago." and yet man is the youngest creature creeping on the globe, and did not come into existence until many millions of years, probably a hundred millions, after the great saurians had become extinct. Beyond the unimaginable con of the great reptiles buried in the rocks, there lies a limitless haze of time when life had not appeared on earth, And what is the span of existence of this tiny speck of matter compared with the history of the suns? Match this immensity of time with the immensity of space as disclosed by Astronomy. There are stars at distances so vast that they are invisible by the aid of the most powerful telescope. Their existence has been made known to us by photography; the light of many of these "photographic" stars, travelling at the rate of 186,000 miles a second, takes 32,000 years to reach the earth! Can the human mind comprehend the awful figure of miles covered by the shooting ray of light during this enormous length of time? Verily "words with the mind turn away, not finding Him" No less wondrous are the revelations of Biology. How diversified are the means of propagation of life! How lavish the scale on which many of the species of the lower animals breed! A distinguished naturalist speaking of oysters, says, "Taking them all round, five

million young oysters, start life in order that one may finally come to maturity." Again, "nineteen generations in sixteen weeks have been counted in some kinds of the plant-lice." Linnaeus after careful observation came to the conclusion that in one year a single aphis would produce a quintillion of descendants. And then there are living organisms formed only of one cell. "And yet each of these free-living units has a complete organisation—mouth, pharynx, renal organ, locomotor organs, and so on—similar in activity and general shape to the system of large capacious organs built up by the agglomeration of millions of cell-units to form the body of a higher animal." The trend of Science is not necessarily towards atheism. Darwin and Lord Kelvin experienced no conflict between Science and Religion. Huxley did not deny the existence of a Great First Cause. Among eminent scientists there are men in whom, though they do not worship in the same temple with us, the spirit of reverence has not been withered by the keenest power of analysis. Sir E. Ray Lankester, from whom we have largely quoted above, observes: "When we say that life and even its most tremendous outcome—the mind of man—are to be studied and their gradual development traced as part of the orderly unfolding of natural processes, we are no whit less reverent, in no degree less impressed by the wonder, immensity, and mystery of the universe, than those who, with happy and obstinate adherence to primitive conceptions, think that they can explain things by calling up vital essences and wandering spirits." (*Scienee from an Easy Chair*, p. 145).

It is the capacity of being "impressed by the wonder,

immensity and mystery of the universe", which makes our studies fruitful of spiritual wealth, and wipes out the distinction between higher and lower (**Para Yo Apara**) secular and sacred, in the domain of knowledge. Nor is this entirely overlooked in the Upanishads themselves. To prove the existence of one Supreme Being, the seers freely draw upon Physiology, Botany, Astronomy and Physics - extremely crude and rudimentary as they were in those days —and, to establish the validity of their propositions they have recourse to a closeness of reasoning which has made it possible for their successors to evolve a philosophy—it would be more correct to say a number of philosophies—out of their teachings. In the *Kena* it is distinctly said that the Vedas are the foundation of the knowledge of God. They did not despise reason, though the inadequacy of the intellect in the search after Brahman is pointed out with reiterated emphasis.

What, then, are the prerequisites of attainment of Brahman? The mastery of the senses, the control of the mind, the performance of duties, right knowledge, and the steps to it are, first, **Sraban** or reading the sacred texts bearing on the existence and attributes of God, or in the alternative, receiving instructions from a master who knows God: secondly, **Manan** or weighing and considering again and again what is read or heard: and thirdly, **Nididhyasan** or meditation of the self. The *sine qua non* of spiritual culture is self-discipline or regulation of the external and internal organs. The verse that comes immediately after the one with which we commenced this discourse, says: "One who has not

turned away from wicked conduct, who is not tranquil and self-contained, and whose mind is not at rest, can never obtain the Self even by knowledge." The teachers of the Upanishads do not tire of declaring in the strongest possible terms that without self-mastery the most brilliant intellectual powers count for nothing in one's quest of God.

But the root of it all is faith. The *Katha* says:

नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा ।
अस्तीति ब्रुवतोऽन्यत्र कथं तदुपलभ्यते ॥२।३।१२

"The Self cannot be reached by speech, by mind, or by the eye. How can it be apprehended except by him who says, 'It is.'" Faith has been defined by St. Paul as "the assurance of things hoped for, the proving of things not seen." (Heb. XI. 1.) The Indian seer says exactly in the same spirit, that though the eye, the mind and speech fail him, the seeker after God must start with an assurance of his existence Nothing will avail him without this assurance. Here we are confronted with a most difficult question: What is the source of the inward conviction of the existence of God which is posited as the indispensable condition of the spiritual schooling of the human soul? Is it an instinct, an intuitive inference, or the product of study and observation? We do not know: it may be one or the other; it may be a resultant of all the three. If the teachers of the Upanishads held that faith was an innate faculty, independent of the cultivation of the mental powers. they would not have used philosophical arguments to convinee their disciples of the existence of the One

without a Second. And yet it is hardly rational to say that we can induce faith in ourselves by our own efforts. Faith is no doubt fostered and strengthened by intellectual and moral training: but its origins lie far down in the depths of our being which God has not permitted us to fathom.

The question may be stated in another form: "What makes a man turn to God in the first instance? Robertson of Brighton says in answer to it. "Unquestionably, the Spirit that is seeking him; but which is also seeking us, which requires a reciprocal effort on our part. I firmly believe that the Universal Spirit, 'not far from any one of us,' is seeking all; and in the union-point, where the will of the Finite is changed by, and voluntarily adopts as its own, the will of the Infinite, lies the answer to the deep question you have put." (*Life*, I. 222).

The seer of the East and the saint of the West meet here on common ground. One text also declares that God can be possessed by him alone whom He chooses for self-manifestation. And yet nowhere in our scriptures do we find the preceptors scouting intense and unwavering individual effort, and encouraging sheer passivity. There is a reconciliation between divine grace and the self-exertion of the devotee, to which all thirsting souls have borne testimony from age to age; and it is the posssibility of this reconciliation which saves us from inertia, arising out of the blind belief that God will do every thing for us, and despair, caused by a rude awakening to our worthlessness. Does our text preach the Calvinistic doctrine of predestination and election, according to which "God in his eternal sovereign purpose has

predestined some to eternal life, while the rest of mankind are predestined to condemnation and eternal death"? No such thing. It only brings home to our mind the great truth that without the mercy of God our intensest endeavours after a holy life are but vanity of vanities. And yet we are not bond-slaves of fate. As a thoughtful writer has said, "While God fulfils His all-embracing purpose, that fulfilment leaves room for the exercise of individual freedom." "God is sovereign and man is free," this is the only sound reading of our place in the universe; though the metaphysical problem of how to reconcile the sovereignty of God with freedom of the human will has proved a stumbling-block to many a devout spirit.

The lesson which we should like to derive from the verse which stands at the head of this discourse is, that in our upward strivings God's mercy alone availeth; that in our warfare with the world and the flesh, it is not for us to command victory, for at times our utmost energies are borne down by persistence of sin; that a lively sense of our nothingness is the condition of our regeneretion. But still we have to struggle on. and draw spiritual nourishment from ail possible sources. The positive Sciences, Literature, History, Philosophy—there is no branch of knowledge which we may neglect as unworthy of our attention. We should lay under contribution whatever man has toiled for and achieved, for the purpose of stiffening our nerves and sustaining our aspirations. We have seen how the revelations of Science can reinforce our faith by impressing our minds with the wisdom, omnipotence and majesty of God. Literature, including poetry which

"makes immortal all that is best and most beautiful in the world," and "redeems from decay the visitations of the divinity in man", is, in the language of John Morley, "a proper instrument for a systematic training of the imagination and sympathies, and of a genial and varied moral sensibility." History enables us to trace the finger of God in the endless vicissitudes of human affairs, the destinies of nations, the rise and fall of civilisations, the interplay of the religious, political and economical forces of the world. An intelligent study of Philosophy is the groundwork of faith. More than anything else, it clarifies the mind, and allures it with a glimpse into the ineffable being of the True, the Good and the Beautiful. To a follower of Rammohun Roy, nothing that concerns humanity should be considered as alien. Above all, it is our duty "to conquer life anew every day" ; to strive to win freedom through self-surrender ; and to seek that harmony between the human and the divine in us whereby our "strength is made perfect in weakness," and which alone can bring peace to our weary spirits Let this be the burden of our hymns every waking moment of our life :

"Our wills are ours, we know not how ;
Our wills are ours, to make them thine."

Discourse delivered at the afternoon-service on the 11th Magh (25th January) 1928. Reprinted from the *Indian Messenger* of the 6th February 1928.

From Untruth Lead Me Unto Truth

असतो मा सद्गमय

(FROM UNTRUTH LEAD ME UNTO TRUTH)

बृहदारण्यक । १।३।२८

"All knowledge", says Coleridge, "begins and ends with wonder, but the first wonder is the child of ignorance, while the second is the parent of adoration." The child wonders in his ignorance at the most ordinary natural phenomena. An esteemable gentleman, now no more, told me that when he was a little boy, he wondered at the branches of trees moving violently while a high wind was blowing ; and after hard thinking, he came to the conclusion that like as a soft breeze was called forth by the waving of the fan, the wind was caused by the shaking of the branches of the trees. Primitive man was in a state of childhood ; so in his ignorance he wondered at the multiple manifestations of the natural world, and saw an indwelling spirit in every object before him—trees and creepers and flowers, living streams of water, the stars in heaven, the sun and the moon, nay, even his tools and stocks and stones, he endowed with life, and there, in his animism, he found his explanation of the riddles of the universe. When he witnessed an eclipse of the sun or the moon, his wonder was transformed into consternation, and he fancied a monster swallowed these bright

luminaries of the sky. There are peoples of the primitive type still existing on earth, and the advancement of knowledge still leaves us helpless before a thousand revelations of the incomprehensible forces of nature, in the presence of which we tremble like children and lose ourselves in wonder in the impenetrable darkness of our ignorance.

But man cannot find peace and joy in ignorance. There is an irresistible urge in him to know things as they are. The quest began with the first stirrings of intelligence in him. Even savages cannot help philosophising about God, man and the universe ; he looks out on the visible world outside, and the invisible world within, and he wonders and wonders, and knows no rest until he mythologizes, and arrives at a plausible scheme of things.

Kant has said that the business of philosophy is to answer three questions. 'What can I know?' 'What ought I to do?' and 'For what may I hope?' Huxley, in his Life of Hume, points out that these three resolve themselves into the first. (p. 48). The dawn of philosophy is lost in the twilight of history. There are reasons to believe that more than anything else, the movements of the heavenly bodies first attracted man's attention ; but compared with the age of the earth, it was an event of yesterday, as the following table given by Sir James Jeans will show :

Age of earth	about	2000,000,000	years
Age of life on earth	„	300,000,000	„
Age of man on earth	„	300,000	„
Age of astronomical science	„	3,000	„
Age of telescopic astronomy	„	300	„

The telescope, with spectroscope and photography, has revolutionised the study of the heavens. "There are, then", says Jeans, "thousands of millions of millions of stars within the range covered by the 100-inch telescope, and this number must be further multiplied to allow for the parts of the universe which are still unexplored. At a moderate computation, the total number of stars in the universe must be like the specks of dust in London." (The Universe around us, p. 90.) "The farthest distance that our telescopes have yet penetrated into space, 140 million light-years, is only a very small fraction of the whole way round the universe." (The stars in their courses, p. 149.)

"When your imagination was borne to these distant stars", asks the French astronomer Flammarion, "suns of the infinite, these innumerable stellar systems disseminated through a boundless immensity, did you ask what existed there, what purpose was served by those dazzling spheres, what effect resulted from these forces, radiations, energies? Did you reflect that the elements which upon our little earth determined a vital activity so prodigious and so varied must needs have spread the waves of an incomparably vaster and more diversified existence throughout the immensities of the Universe?

"The humble little planet that we inhabit presents itself to us as a brimming cup, overflowing at every outlet. Life is everywhere. From the bottom of the seas, from the valleys and the mountains, from the vegetation that carpets the soil, from the soil of the fields and woods, from the air we breathe, arises an immense prodigious, and perpetual murmur." "The multitude of worlds is

surely peopled by every imaginable and unimaginable form." (Astronomy for Amateurs, pp. 337-8, 346.) This last view is not accepted by Sir J. Jeans, who holds that "l fe must be limited to a tiny fraction of the Universe." (U. A. R. p. 344). Be that as it may, we have had enough and to spare to fill us with wonder, and to exclaim with the psalmist, "The heavens declare the glory of God ; and the firmament sheweth his handywork." (Ps. 19. 1.) As the telescope reveals to us the immensity of space and time, the microscope, at the other end of the scale, brings into view from the fathomless depths of nature beauties no less wonderful than the giant systems that overpower the imagination by their majesty and vastness. And not only Astronomy, but the other branches of science too, Geology, Physics, Chemistry, Botany, Physiology, tell the same tale, and bear testimony to the wonder-working wisdom of the Creator.

The contemplation of the material world naturally led man to speculation about its origin. The problem was of enthralling interest to the master minds of the nations of the past, and one of its grandest expressions is found in the word of a sage of the Rigveda :

नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमापरो यत् ।
किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीद्गहनं गभीरं ।
न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि न रात्र्या अह्न आसीत् प्रकेतः ।
आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्न परः किञ्चनास ॥
तम आसीत्तमसा गूढ़मग्रेऽप्रकेतं सलिलं सर्वमा इदं ।
तुच्छ्येनाभ्वपिहितं यदासीत्तपसस्तन्महिना जायतैकं ॥ १०।२१९।१—३ ॥

Then there was neither Aught nor Naught, nor
air nor sky beyond.
What covered all ? Where rested all ? In
watery gulf profound ?
Nor death was there, nor deathlessness, nor
change of night and day.
That one breathed calmly self-sustained ;
naught else beyond it lay ;
Gloom hid in gloom existed first—one sea
eluding view,

Following this line of speculation the sages of India arrived at the idea of one supreme creator of the world :

आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत् । नान्यत् किञ्चन मिषत् । स ईक्षत लोकान् नु सृजा इति । स इमाँल्लोकानसृजत । ऐतरेयोपनिषत् १।१।२॥

"Verily all this was in the beginning, the Self only. There was nothing that winked. He thought, 'Shall I create worlds ?'

"He created these worlds.

And like modern science the sages of the Upanishads contemplated nature at both ends of the scale, and realised the presence of the Self in things mighty and minute, and called him (**Anorano Yanmahato Mahiyan** (**Katha, 1/2/20**)—"Smaller than the smallest and greater than the greatest." This idea is expanded in **a** fine passage in the Chhandogya :

एष म आत्मान्तर्हृदयेऽणीयान् व्रीहेर्वा यवाद्वा सर्षपाद्वा श्यामाकाद्वा श्यामाकतण्डुलाद्वा ; एष म आत्मान्तर्हृदये ज्यायान् पृथिव्या ज्यायानन्तरिक्षाज्ज्याया- न्दिवो, ज्यायानेभ्यो लोकेभ्यः ॥ ३।१४।२ ॥

"He is my self within the heart, smaller than a corn of rice, smaller than a corn of barley, smaller than a mustard seed, smaller than a canary seed or the kernel of a canary seed. He also is my self within the heart, greater than the earth, greater than the sky, greater than heaven, greater than all these worlds." (Max Muller's translation.)

Then the seeker gave expression to his abiding faith, (**Satyang Khshmeva Brahma**)—"Truth is the Self" (**Briha** /5/4/**1**). And so was uttered forth the prayer— (**Asato Mā Sadgamaya**)—"From untruth lead me unto truth."

Search after truth is a duty imposed upon man by his Maker. No human being can be happy with what he knows to be unreal. Our spiritual progress depends in a large degree on a correct knowledge of the object of our worship, and the nature and destiny of the soul. But is it possible for us to reach finality in any of the imperishable concerns of life ? Let us hear what Lessing has to say on this question : "Not the truth, not the truth which a man possesses, but the sincere endeavour which he has used to come at the truth, makes the worth of the man. For not through the possession of truth, but through the search for it, are those powers expanded in which alone his ever-growing perfection consists. Possession makes restful, indolent, proud—

"If God were to hold in His right hand all truth, and in his left the single, ever-living impulse to seek for truth, though coupled with the condition of eternal error, and should say to me, 'choose.' I would humbly fall before his left hand, and say, 'Father, give ! Pure truth is, after all,

for Thee alone." (Life, p. 201.)

There is perhaps a shade o exaggeration in the latter part of the extract, but in the main this is the spirit of our first congregational prayer, (**Asato Ma Sadgamaya**)

Our second prayer is :— (**Tamasho Ma Jyotirgamaya**) —"From darkness lead me unto light." Knowledge is light, ignorance is darkness. We dwell in darkness when we take things to be what they are not. How often do we pursue the transient as eternal, the mutable as without change, the perishable as deathless ! And here we realise the truth of the principle that rational action depends upon right knowledge. Our shastras, therefore, lay emphasis on discrimination between the permanent and the impermanent (**Nityanityaviveka**) 'God is light', says John (1 John 1. 5.) ; the prayer of the **Brihadāranyak** also points to the Self as light ; so that the craving for the light of knowledge, and the craving for the light of the presence of God, merge into each other. Lewis, while describing the last moments of Goethe, says, "His speech was becoming less and less distinct. The last words audible were : *More light !* The final darkness grew space, and he whose eternal longing had been for more Light, gave a parting cry for it, as he was passing under the shadow of death." (Life p. 576.)

The shadow of death ! The yearning of the human soul for deliverance from the shadow of death has found expression in the last of the three prayers : **Mrityormaamritang gamaya**—"From death lead me unto deathlessness." The way to escape death is the knowledge of the

Self. **Tamevaviditytyatimrityumeti** (Sveta/3/8).

The text of the Upanishad in which the three famous prayers are found, also contains a commentary which identifies **Asat** (untruth) and **Tamas** (darkness) with **Mrityu** (death), so that the three mean the same thing. The rishi says, "From untruth lead me unto truth', this utterance means 'from death lead me unto deathlessness', for untruth (**Asat**) is death, and truth (**Sat**) is immortality. 'From darkness lead me unto light', this is the same as saying 'from death lead me unto deathlessness,' for darkness (**Tamas**) is death, and light (**Jyotih**) is immortality."

There is psychological justification for this identification. For truth is the very, life-breath of the soul. "The meaning of life is in eternal search." Untruth is negation of reality ; the soul is suffocated to death in an atmosphere of unreality, just as it cannot thrive in the dark cave of ignorance. Untruth as well as ignorance of truth alike spells death to it. And yet when we utter these supplications in our congregational worship, we are not conscious of praying for deliverance from death alone, we pray for truth and the light of knowledge, and immortality.

We have had now answers to the three queries posited by Kant. It is possible for us to have knowledge, however imperfect, of the attributes of God ; our code of ethics flows from this knowledge, and our hope for immortality is based on it. "All roads lead to Rome"—All knowledge leads to one supreme truth—the all-pervading presence of the Being 'whose centre is everywhere, and circumference nowhere'. The positive sciences are the unremitting efforts

of humanity to read out the thoughts of God ; Metaphysics but their ever-baffled and ever-renewed endeavours to lift the veil hiding the mysteries of the universe, enter the holy of holies, and gaze on the blinding glory of the Creator ; History is a faint tracing of the working of divine Providence, fashioning and guiding the destiny of the human race ; Literature, in prose and verse, embodying as it does the best and noblest thought of mankind, represents Godward movement that custom cannot stale and time cannot weary. Through all these channels, God is revealing Himself with ever-increasing clearness as the True the Good and the beautiful.

Discourse delivered at the English service on the 11th Magh (25th January 1934.)